সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী

আল্লামা সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী (র)

নয়া খুন

মুহাম্মদ জুলফিকার আলী নদভী
অনূদিত
[আল্লামা সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী (র)-এর বিশিষ্ট খলিফা]

মুহাম্মদ ব্রাদার্স
৩৮, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

নয়া খুন

মূল : সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (র)

অনুবাদক : মুহাম্মদ জুলফিকার আলী নদভী

প্রথম প্রকাশ

ফেব্রুয়ারী, ২০১০ ইং

জিলহজ্ব, ১৪৩০

প্রকাশনায়

মুহাম্মদ ব্রাদার্স

৩৮, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ফোন : ৭১২ ৫৪ ৮১; মোবা: ০১১ ৯০ ৫২ ৯৪ ১১

প্রচ্ছদ : বশির মেসবাহ্, সালসাবীল

মুদ্রণে ও বাঁধাই

মেসার্স তাওয়াক্কাল প্রেস

৬৬/১, নয়া পল্টন, ঢাকা-১০০০

ISBN: 984-622-030-2

মূল্য : ১৩০.০০ টাকা মাত্র।

NAYA KHUN : New Blood, Lecturer by Sayed Abul Hasan Ali Nadvi, translated by Muhammad Zulfikar Ali Nadvi, published by Muhammad Abdur Rouf, Muhammad Brothers, 38, Banglabazar, Dhaka-1100,Phone; 02-7125481.Printed by M/S Tawakkul Press, 66/1, Naya Paltan, Dhaka-1000 Tk. 130.00 Only.

আল্লাহ্র যে সব বান্দাহ্ মুসলিম
হবার কারনে দুনিয়ার বিভিন্ন প্রান্তে জুলুমের
শিকার, তাঁদের সবর এখতিয়ারের তওফিক কামনায়

আমাদের কথা

আমাদের সকল চেষ্টা-প্রচেষ্টা, আমাদের সকল যোগ্যতা, সমস্ত উপায়-উপকরণ ও মূল্যবান সময় রাজনৈতিক আন্দোলনের লক্ষ্যেই পরিচালিত হয়। আন্দোলন ও নির্বাচনের সময় আমরা একথা মনে করি, আমরা জাতিগতভাবে মুসলমান এবং আমাদের যারা নেতৃত্ব দিচ্ছে এবং যাঁদের হাতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা, নিঃসন্দেহে যারা শিক্ষিত, তারা পূর্ণ মুসলমান, ইসলামের মহত্তম মর্যাদা, তার আকীদা-বিশ্বাস ও তার নেতৃত্বের প্রতি পূর্ণ আস্থাশীল এবং ইসলামের মর্যাদা বৃদ্ধি ও তার দণ্ডবিধি প্রয়োগ করতে তাঁরা দৃঢ় প্রত্যয়শীল, অথচ বাস্তবতা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। সামগ্রিকভাবে আজ তাদের মাঝে ঈমানী দুর্বলতা ও আমলের ত্রুটি রয়ে গেছে। কিন্তু এ ব্যাপারে আমরা কোন খোঁজ-খবর রাখি না এবং জনসাধারণের মাঝে কোন চেতনা নেই। অন্য দিকে শিক্ষিত সমাজের অধিকাংশই এমন যাদের মাঝ থেকে পাশ্চাত্য সভ্যতা-সংস্কৃতি, জীবনধারা ও রাজনীতির প্রভাবে ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস হারিয়ে গেছে, বরং তাদের অনেকেই এমন যারা প্রকাশ্যেই ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং পাশ্চাত্য জীবন দর্শন, তাদের চিন্তাধারা, আকীদা-বিশ্বাস প্রাণ দিয়ে ভালবাসে, তার সাহায্য-সহযোগিতা ও প্রচার-প্রসারের ক্ষেত্রে উন্মাদ, উৎসর্গকারী! তারা চাই পাশ্চাত্যের জীবন দর্শনের ভিত্তিতে ও তার আলোতে জীবন যাপন করবে এবং জনগণের সাথে মেলামেশা করবে। অতঃপর তাদের কেউ এ ক্ষেত্রে দ্রুত গতির পক্ষপাতিত্ব, আবার কেউ অভিজ্ঞ ধীরস্থির। আবার কেউ শক্তি ও ক্ষমতা দিয়ে সমাজের ওপর এ ব্যবস্থাকে চাপিয়ে দিতে চায়। আবার কেউ চিত্তাকর্ষক মনমাতানো পদ্ধতিতে একে মানুষের সামনে উপস্থাপন করতে চায়। বস্তুত তাদের সকলের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন।

অন্যদিকে আমাদের ধর্মীয় ব্যক্তিবর্গ, একদল যারা পাশ্চাত্য সভ্যতার সামনে আত্মসমর্পণ করেছে। আরেক দল আছে, তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে, তাদেরকে কাফের মনে করে, তাদের সাথে দূরত্ব বজায় রাখে এবং এ ধর্মহীন মনোভাব ও সভ্যতা-সংস্কৃতির কারণ খতিয়ে দেখতেও চায় না। তাদের সংশোধন করা ও ইসলামের সাথে এ সংঘাতময় অবস্থার পরিবর্তন করার চেষ্টা করে না। তাদের সাথে মেলামেশার মাধ্যমে ইসলাম ও দীনী ব্যক্তিবর্গের প্রতি ভীতি ও আশঙ্কাবোধ দূর করে তাদের কাছে যা কিছু ঈমান ও আমল আছে তাকে চাঙ্গা করা এবং শক্তিশালী আবেদনশীল ইসলামী সাহিত্য প্রণয়ন করে, তাদের মানসিক খোরাক দেওয়া, দীনী চেতনা জাগরিত করা, তাদের ধন-সম্পদ, শক্তি-সামর্থ্য, ক্ষমতা-পদমর্যাদা ও জীবনোপকরণের প্রতি বিমুখতা প্রদর্শন করে তাদের ইসলামের মূল্যবোধ ও ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তোলা, দরদ ও ব্যথা নিয়ে তাকে প্রজ্ঞাপূর্ণ নসীহত করার প্রয়োজন মনে করে না।

আর অন্য দল তাদের সহযোগিতা করে, তাদের ধন-সম্পত্তিতে শরীক হয়. তাদের দুনিয়া থেকে উপকৃত হয়, এ নৈকট্য ও সহযোগিতার ওপর ভিত্তি করে তাদেরকে দীনী কোন কল্যাণ দেওয়ার ফিকির নেই। ফলে এদের মধ্যে না আছে কোন দাওয়াত, না আছে কোন আকীদা, না আছে ধর্মীয় অনুভূতি, না আছে ইসলামের কোন ফিকির না কোন দীনী পয়গাম।

আজ মুসলিম বিশ্বের প্রয়োজন এমন এক জামাত যারা হবে সকল প্রকার লোভ-লালসার উর্ধ্বে, নিঃস্বার্থ ধর্ম প্রচারক। তারা এমন ধারণার উর্ধ্বে হবেন যে. তাদের উদ্দেশ্য হব নিজের জন্য বা আত্মীয়-স্বজনের জন্য বা নিজ দলের জন্য সম্পদ হাসিল করা বা রাষ্ট্রক্ষমতা কুক্ষিগত করা নয়, বরং তারা মানসিক ও চিন্তাগত ঐ সকল জটিলতা সংশয়-সন্দেহ দূর করে দেবে যা পাশ্চাত্য দর্শন. সভ্যতা-সংস্কৃতি বা ধর্মীয় ব্যক্তিদের ভুল বা ভুল বোঝাবুঝির কারণে সৃষ্টি হয়েছিল অথবা ইসলাম ও ইসলামী পরিবেশ থেকে দূরে থাকার কারণে জন্ম নিয়েছিল। আর এ সংশয় ও জটিলতা নিরসনের মাধ্যম হলো শক্তিশালী কল্যাণকর ইসলামী সাহিত্য রচনা, ব্যক্তিগত সুসম্পর্ক, পরিচ্ছন্ন ও মননশীল আখলাক-চরিত্র, ব্যক্তিত্বের প্রভাব, দুনিয়াবিমুখিতা ও নির্লোভ মানসিকতা এবং পয়গম্বর ও তাঁদের উত্তরসুরিদের চরিত্র মাধুর্য।

আল্লামা সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী (র) এমন একজন আলেমে দ্বীন ছিলেন, যিনি মানবতার জন্য, ধর্মের জন্য দেশের পর দেশ ঘুরে ফিরেছেন। তিনি তাঁর কলম দ্বারা, বক্তৃতা দ্বারা মানুষের বিবেকের বন্ধ দুয়ারে আঘাত হেনেছেন। বলেছেন, তোমরা আর ঘুমিয়ে থেকো না। যদি তোমরা না জাগ তাহলে তোমাদের করুণ পরিণতির জন্য অপেক্ষা কর।

সত্যি কথা বলতে কি, আমরা কিছুটা হলেও উপলব্ধি করতে পারছি এবং আগামীতে আরও উপলব্ধি করতে সক্ষম হব ইনশাআল্লাহ্!

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে আল্লামা নদভী (র)-এর ব্যথাতুর হৃদয়ে মানবতার প্রতি ভালবাসা ও ধর্মের প্রতি উদাত্ত আহ্বান আমরা লক্ষ্য করব। বর্তমান গ্রন্থটি মূলত আল্লামা নদভী (র)-এর বক্তৃতা সংকলনের বাংলা অনুবাদ। পাঠক হয়তো গ্রন্থের নাম দেখে বিস্ময় প্রকাশ করতে পারেন। কিন্তু আমরা গ্রন্থের মূল বিষয়বস্তুকে নাম হিসাবে বেছে নিয়েছি। গ্রন্থটি বাংলা অনুবাদ করেছেন আল্লামা নদভী (র)-এর সান্নিধ্যপ্রাপ্ত ও স্নেহধন্য ছাত্র মাওলানা জুলফিকার আলী নদভী এবং সম্পাদনা করে দিয়েছেন জনাব আজিজুল ইসলাম সাহেব। সেই সাথে শত ব্যস্ততার মাঝেও একটিবার নজর বুলিয়ে দিয়েছেন আল্লামা নদভী (র)-এর বিশিষ্ট খলীফা হযরত মাওলানা আবূ সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী সাহেব।

আমরা সকলের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞ, আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন আমাদের সকলের শ্রমকে কবুল ও সার্থক করুন।

আমীন!

তারিখঃ ১৯-০১-০৬ইং, ঢাকা। – প্রকাশক

অনুবাদকের আরয

الحمدلله رب العالمين والصلاة وسلام على سيد الانبياء

والمرسلين ـ وعلى اله واصحابه اجمعين ـ

সর্বপ্রথম দিল ও দিমাগ মহান আল্লাহ্‌র দরবারে সিজদা অবনত করে তাঁর হামদ ও প্রশংসা জ্ঞাপন করছি। আর ভক্তি, শ্রদ্ধা, এশ্‌ক ও মুহাব্বতভরা হৃদয় নির্জন দরূদ ও সালাম পেশ করছি আল্লাহ্‌র হাবিব, আখেরী নবী হযরত মুহাম্মদ (সা), তাঁর আহলে বাইত ও সকল সাহাবীগণের প্রতি।

আজ এ আরজ লেখার সময় বিংশ শতাব্দীর চিন্তানায়ক, এ গ্রন্থের প্রণেতা লক্ষ মানুষের শ্রদ্ধাভাজন, আমার পীর ও মুর্শিদ হযরত মাওলানা সৈয়দ আবুল হাসান আলী নদভী (র)-এর প্রতিচ্ছবি হৃদয় আত্মায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। কারণ এক সময় তিনি আমার কানে কানে বলেছিলেন "জুলফিকার 'আমি তোমাকে মুহাব্বত করি। তাঁর সেদিনের ভালবাসার জবাবে আমার বলার বা দেওয়ার কিছুই ছিল না। তবে সেদিন এ দু'টি চরণ লিখেছিলাম।

"কি দেব তোমায়, দেওয়ার কিছু নেই, রিক্ত হস্তে দাঁড়িয়ে, তবু দিতে চাই ফুল-পাপড়িবিহীন লতা পাতা দিয়ে গড়ামোর মালাটি পরিয়ে।

এভাবেই চলে যেতে থাকে নদওয়াতুল উলামার দিনগুলো। এরূই মাঝে হযরত (র) বলেন, তোমাদেরকে এজন্য আরবী শেখান হচ্ছে না যে, তোমরা আরব দেশে যেয়ে মাল কামাই করবে, বরং তোমাদেরকে এজন্য আরবী শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে যে, তোমরা আরবদেরকে জাগাবে। কারণ আরব জাগলে সারা বিশ্ব জাগবে।

সুতরাং আরবদেরকে জাগাবার উদ্দেশে আজ আরব আমীরাতের পথের যাত্রী।

প্রসঙ্গ কথা দীর্ঘায়িত না করে মূল বক্তব্যে ফিরে আসি। নয়া খুন মূলত হযরতের মূল কোন গ্রন্থ নয়। হযরতের (র) সংস্কারমূলক বক্তব্য ও প্রবন্ধমালা। এর অনুবাদের কাজ শুরু করেছিলাম হযরতের জীবদ্দশায় তাঁর খানকাতে বসে, সম্ভবত ঘটনাটি ছিল ১৯৯৬-এর রমযান মাস। এরপর বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রবন্ধের অনুবাদ করি। পরিশেষে আমার ছোট ভাই স্নেহধন্য জাকিরের বার বার অনুরোধে ইউরোপ, আমেরিকা ও ইসরাইল বক্তব্যটির অনুবাদ কাজ শেষ করি গত শাবানে।

আশা করি, অনুবাদ গ্রন্থটি পড়লে হৃদয়ে অস্থিরতার স্পন্দন শুরু হবে, চিন্তার জগত প্রসারিত হবে এবং শান্তির নিদ উড়ে যাবে। ফলে মুসলিম উম্মাহ তথা বিশ্বমানবতার জন্য ব্যথা ও ব্যাকুলতা অনুভব করবে এবং হযরতের মতই বিনিদ্র রাত্রি জাগরণ করতে সহজ হবে।

নতুন ও কাঁচা হতের অনুবাদ। সুতরাং অনুবাদে সাহিত্যের নিপুণতা না থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু অনুবাদের মূল উদ্দেশ্য হলো হযরতের চিন্তা ও পয়গাম ব্যাখ্যা ও দরদ বাংলা ভাষী মুসলিম উম্মার কাছে পৌছে দেওয়া। তাই এ উদ্দেশ্য পূর্ণ হলেই অনুবাদ সার্থক।

পরিশেষে মুহাম্মদ ব্রার্দাস এর স্বত্বাধিকারী জনাব প্রফেসার মুহাম্মদ আব্দুর রউফ সাহেব ও তাঁর সহযোগী আমার ছোট ভাই জাকিরকে কৃতজ্ঞতা জানাই। কারণ তাঁদের আগ্রহ, অনুরোধ ও পীড়াপীড়িতে আজ এ অনুবাদ গ্রন্থ আলোর মুখ দেখতে সক্ষম হয়েছে। দোয়া করি, আল্লাহ্ তায়ালা তাদের শ্রমকে সার্থক করুন এবং তাঁদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে উত্তম বিনিময় দান করুন।

বিনীত

তারিখঃ ১৩.২.০৫ ইং, ঢাকা

আবু তুরাব জুলফিকার আলী নদভী
কাকরাইল মসজিদ, ঢাকা-১০০০

সূচিপত্র

নয়া খুন

কোন দেহ সুস্থ, সুঠাম ও সবল থাকতেই পারে না যদি তার মাঝে নতুন ও সতেজ খুনের সৃষ্টি না হয়। আর কোন বৃক্ষও সতেজ থাকতে পারে না যদি তার মাঝে নতুন নতুন পাতা আর তরতাজা ডালপালা না গজায়। ঠিক তেমনি উম্মতে মুসলিমাও একটি দেহ সমতুল্য যার মাঝেও সব সময় নতুন ও সতেজ খুনের সঞ্চারণ হওয়া অতীব প্রয়োজন। এ বৃক্ষের জন্যও প্রতিটি ঋতুতে তরতাজা ডালপালা ও সবুজ শ্যামল পাতার প্রয়োজন।

মুসলিম জাতির সদা সতেজ বৃক্ষটি সর্বদা নতুন ও কচি কোমল পাতা আর তরতাজা ডালপালার জন্ম দিয়ে আসছে। সেই সাথে মলিন পুরাতন ও জীর্ণশীর্ণ লেবাস-পোশাক পরিহার করে সদা সদ্য শুচি-শুভ্র পোশাকে আবৃত হয়েছে। মননশীল চিন্তাশক্তি, সামাজিক ও দলবদ্ধ শক্তি, নিষ্ঠা ও চঞ্চলতা, খান্দানী দক্ষতা ও বিচক্ষণতা, নানাবিধ গুণাগুণ, পৈত্রিক ভদ্রতা ও শরাফত, সৃষ্টিগত হিম্মত ও বীরত্বের মত মহামূল্যবান যোগ্যতাসমূহ যা শতাব্দীকাল ধরে নিজ নিজ স্থানে জন্মে ছিল এবং সাধারণ ও অতি নগণ্য বিষয়ে বা অকল্যাণকর কাজে নষ্ট ও বরবাদ হত, এসব অমূল্য যোগ্যতা ইসলামের কারণে মুসলিম জাতির জাতীয় ধনভাণ্ডারে জমা হয়ে ইসলামের সম্পদে পরিণত হয়েছিল। নানান বাগানের নানান ফুল, হরেক বাগিচার বৈচিত্র্যময় ফুলকলি এ উম্মতের কণ্ঠহার হিসাবে শোভা পেত। কেউ ইরানী, কেউ খুরাসানী, কেউ ইস্পাহানী, কেউ হিন্দুস্তানী, আবার কেউ মিসরী, কেউ ইয়ামানী, প্রত্যেকেরই এক বিশেষ রং, মানানসই শোভন, প্রত্যেকেই নিজের দেশীয় ও জাতিগত এবং বংশীয় ও পৈত্রিক সম্পদ নিজের সাথে এনে ইসলামের খিদমতে উৎসর্গ করেছে। এমন দুর্লভ সম্পদ অন্যান্য জাতির কাছে থাকা ছিল অত্যন্ত কল্পনাতীত বিষয়। যা-ও ছিল তা অত্যন্ত বিরল আর এভাবেই মানবতার ফুল-বাগিচার রঙ-বেরঙের ফুল-ফল ইসলামের খেদমতে ডালা ভরে এসেছে। ফলে ইসলাম এখন শুধু আরব জাতি বা আদ্‌নান্ বংশের গোষ্ঠীগত গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্যেরই মালিকানাধীন নয়, বরং জাতি-গোষ্ঠী নির্বিশেষে সারা জগতের চিন্তাশক্তি, স্বভাবগত শরাফত ও গোষ্ঠীগত বৈশিষ্ট্যের মালিক হয়ে গেছে। সুতরাং কোন জাতি, চাই চিন্তাশক্তি, প্রজ্ঞার ক্ষেত্রে যতই উন্নতি ও অগ্রগামী হোক না কেন, এ উম্মতের সাথে চিন্তা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দৈহিক গঠনের ক্ষেত্রে এক পাল্লায় মাপা সম্ভব নয়। কারণ এ জাতির মাঝে সকল জাতির ওজন ও তার দেহে দুনিয়ার সকল

জাতির চঞ্চলতা ও উদ্দাম কর্মশক্তি এসে গেছে। ফলে এখন এ জাতি মানবতার মূল শক্তি ও মানব শক্তির সর্বাপেক্ষা বড় উৎসে পরিণত হয়েছে।

জাতীয়তাবাদের পূজারী ও নিজের জাতিকে আল্লাহ্‌র মনোনীত জাতি হিসাবে বিশ্বাসকারীদের সম্পূর্ণ বিপরীত রাসূল (সা) এ বাস্তবতার ঘোষণা দেন যে, আল্লাহ্‌র অনুগ্রহসমূহ দেহের কাঠামো, বুদ্ধি ও প্রজ্ঞা ও মাননশীল চিন্তাশক্তি ও আবিষ্কারের যোগ্যতা, শরাফত ও সহনশীলতা, বীরত্ব ও হিম্মতের ন্যায় স্বভাবগত যোগ্যতা ও অনুগ্রহসমূহ কোন বিশেষ জাতি-গোষ্ঠীর জন্য নির্ধারিত নয়, বরং স্বভাবগত এ মূলধন সমগ্র মানব জাতির মাঝে বিস্তৃত আছে। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও স্মৃতিশক্তি, আত্মমর্যাদাবোধ ও শরাফত, বীরত্ব ও সাহসিকতার মত গুণাগুণ আল্লাহ্ তাআলা মখলুকের মাঝে অত্যন্ত উদারভাবে দান করেছেন। এ সব মানবিক গুণের ওপর কোন জাতি-গোষ্ঠীর একচ্ছত্র ইজারাদারি নেই। যেমন সোনা, রূপার মত মূল্যবান খনিজ সম্পদ দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে পাওয়া যায় এবং মানুষের পক্ষে যেমন সম্ভব নয় এগুলো নিজেদের পছন্দনীয় দেশ ও পবিত্র জন্মভূমির জন্য নির্ধারণ করে দেবে। ঠিক তেমনি মানবতার মানবিক গুণাবলীর খনিজ সম্পদসমূহ ও তার মহৎ গুণাবলী ও মহান বৈশিষ্ট্যসমূহের গুপ্তধনভাণ্ডার অনেক দেশে পাওয়া যায়। প্রিয় রাসূল (সা)-এর এ বাস্তবতার মহান ঘোষণা হলো ঃ

الناس معادن كمعادن الذهب والفضة ـ

মানুষ মহান বৈশিষ্ট্যসমূহ, মহৎ গুণাবলী ও সৃজনশীল যোগ্যতার খনি, যেমন স্বর্ণ-রূপার খনি হয়ে থাকে যা এতই পুরাতন যে, তা শত সহস্র বছর ধরে চলে আসছে, তেমনি ঐসব বৈশিষ্ট্যও স্বাভাবিক ও স্বভাবগত। এখানে মানুষের ইচ্ছার কোন ভূমিকা নেই, তেমনি তা কানায় কানায় পূর্ণ ও মহামূল্যবান ভৌগোলিক ও মানবিক সীমারেখার উর্ধ্বে। এ তেমনি গোপন ও সুপ্ত যা মেহনত, খেদমত, পরিচর্যা ও পরিপাটি করা ছাড়া মাটির মাঝে মিলে থাকে। এ তেমনি আসল, কোনরূপ ভেজালের নাম-গন্ধ নেই, নিজের মূল্য নিজের সাথেই থাকে। এখানে না আকীদার ভ্রান্তি কোন ত্রুটি বলে বিবেচিত হয়, না কোন জাত-পাতের ব্যবধান। স্বর্ণ স্বর্ণই, যদিও তা কাফির বা মুমিনের হাতেই থাকুক না কেন! হীরার মূল্য একই, যদিও তা কোন নোংরা ও অভদ্র অথবা ভদ্র পরিচ্ছন্ন ব্যক্তির কাছেই থাকুক না কেন! মুক্তা কোন বৃদ্ধার ভাঙা ঝুপড়িতে থাকলেও তা আলোকিত করবে এবং রাজপ্রাসাদে থাকলেও তার উজ্জ্বল আলোকচ্ছটা বিকীরিত হবে। তাই তিনি ইরশাদ করেন ঃ

خيارهم فى الجاهلية خيارهم فى الاسلام ـ

যে ব্যক্তি জাহিলী যুগে জ্ঞান-বুদ্ধি, প্রজ্ঞার ক্ষেত্রে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী ছিল, সে ইসলাম গ্রহণের পরও এসব বিষয়ে বিশেষ মর্যাদার স্থান দখল করবে। যে

জাহিলী যুগে আত্মমর্যাদাবোধ, হিম্মৎ ও বীরত্বপূর্ণ কাজে দক্ষ ও অগ্রগামী ছিল ইসলাম গ্রহণ করার পরও সে এ বিষয়ে অগ্রণী থাকবে এবং জিহাদের ময়দানেও সে অন্য সকলের থেকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। অবশ্য জরুরী বিষয় হলো, জাহিলী যুগের গুণাবলীর মাঝে ভারসাম্য বজায় রেখে ইসলাম এগুলোকে পরিচর্যা ও পরিপাটি করে মানানসই করে তোলে। স্বর্ণ সর্বাবস্থায় স্বর্ণই, তবে প্রয়োজন হলো বাজারে নেবার আগে মাটি থেকে পরিষ্কার ও ঝকঝকে করে অলংকারের উপযোগী করে তোলা।

خيارهم فى الجاهلية خيارهم فى الاسلام اذا افقهوا فى الدين -

"তাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি জাহিলী যুগে সর্বাপেক্ষা উত্তম ছিল সে ইসলাম গ্রহণ করার পরও মহৎ ও মহান হবে যদি সে দীনের মেযাজ বুঝতে সক্ষম হয়।" (কারণ এর পরিণামই হলো ভারসাম্যতা, পরিচর্যা, প্রতিটি জিনিসের সঠিক মূল্যায়ন।)

ইসলামের প্রাথমিক ইতিহাস এ নবুওতী প্রজ্ঞার সাক্ষ্য বহন করে। হযরত আবূ বকর (রা) ইসলামের পূর্বেও যেমন সততা, কোমলতা, দূরদর্শিতা ও ভারসাম্য রক্ষার ক্ষেত্রে বিশিষ্ট ও অতুলনীয় ছিলেন, ইসলাম তাঁর এসব যোগ্যতাকে আরো ফুটিয়ে তাঁকে সিদ্দীক বানিয়েছিল। তাঁর মাঝে চোখের অশ্রুর আর্দ্রতা ও দিলে প্রেমের উষ্ণতা প্রথম থেকেই বিদ্যমান ছিল। প্রিয় রাসূল (সা)-এর প্রেম ও ভালবাসা তাঁকে প্রেমের দিগন্তে পৌঁছে দিয়েছিল? যোগ্যতা ছিল। কিন্তু তিনি সে ত্যাগের কথা জানতেনও না। মোম তাঁকে জ্বলা ও ত্যাগ শিখিয়েছে।

হযরত ওমর (রা) বীর বাহাদুর ছিলেন। স্বভাবগতভাবে তিনি সাহসী ও কঠোর মনোবলের অধিকারী ছিলেন। মক্কার সকলেই এ বিষয়ে জ্ঞাত ছিল। কিন্তু এ বীরত্ব ও সাহসিকতার তেমন বড় ময়দান ছিল না। এ সময় ইসলামের জন্য এমন একজন বীর ও সাহসী পুরুষের প্রয়োজন ছিল যিনি কাফিরদের মাঝে আল্লাহ্র একত্ববাদ ও মহানবী (সা)-র নবুওতের কথা ঘোষণা দান করবেন। এদিকে হযরত ওমর (রা)-এর স্বভাবগত বীরত্ব প্রকাশের একটি উপযুক্ত ময়দানের প্রয়োজন ছিল। ফলে প্রিয়নবী (সা)-এর মকবুল দোআ ও আল্লাহ্র তৌফিক— এ দু'য়ের মাঝে এক নিবিড় সম্পর্ক গড়েছিলেন। সুতরাং হযরত ওমর (রা) যখন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন তখন তিনি তাঁর বীরত্ব ও সাহসিকতা নিজের সাথেই এনেছিলেন। ইসলাম তাঁর এ যোগ্যতাকে সঠিক মূল্যায়ন করল এবং রাসূল (সা) তাঁর সঠিক স্থান নির্ধারিত করেছিলেন। হযরত ওমর (রা) তাঁর যোগ্যতাকে সঠিকভাবে কাজে লাগিয়ে রোমান ও পারস্য সাম্রাজ্যকে ইসলামের পদতলে মাথা নত করতে বাধ্য করলেন। তিনি জাহিলী যুগেও বীর হিসেবে খ্যাত ছিলেন। ফলে তিনি ইসলামেও বীর হিসেবে খ্যাতি লাভ করলেন। আর এমনটিই হওয়ার দরকার। কারণ

জাহেলিয়াতের উত্তম ব্যক্তি ইসলামেও উত্তম ব্যক্তি হিসাবে বিবেচিত হবে। خيارهم فى الجاهلية خيارهم فى الاسلام - আর এ কারণেই যখন যাকাত অস্বীকারকারীদের ফেৎনা দেখা দিল, তিনি যুদ্ধের ব্যাপারে তাদের সাথে নমনীয় মনোভাব পোষণ করলেন, তখন হযরত আবূ বকর (রা) তাঁকে সম্বোধন করে বললেন ঃ خيارهم فى الجاهلية خيارهم فى الاسلام জাহিলী যুগে তো ছিলে শক্তিধর, ইসলাম গ্রহণ করে কেমনে তুমি বুযদিল ও কাপুরুষ হয়ে গেলে? কিন্তু এ ছিল সাময়িক ঘটনামাত্র। এটা স্বভাবগত ছিল না, বরং তরবিয়ত ও সতর্কতার দিক ছিল। অতঃপর অতি শীঘ্রই তিনি তাঁর আসল স্বভাবের ফিরে আসলেন। তারপর আর তাঁর মাঝে দুর্বলতা বা নমনীয় মনোভাব পরিলক্ষিত হয়নি।

হযরত খালিদ (রা) স্বভাবগতভাবে সিপাহসালার ছিলেন এবং যুদ্ধ বিষয়ে তাঁর ছিল গভীর দক্ষতা ও দূরদর্শিতা। তাঁর মধ্যে নেতৃত্ব দেওয়ার যোগ্যতা, উপস্থিত বুদ্ধি, সচেতনতা ও সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার যোগ্যতা সব সময় কাজ করত। ওহুদ যুদ্ধে তাঁর বিচক্ষণতা ও সঠিক সিদ্ধান্তের কারণে যুদ্ধের ধারা ও গতিই পাল্টে গিয়েছিল। তিনি যখন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেন তাঁর সকল স্বভাবগত গুণাগুণ ‍ঃ বৈশিষ্ট্য, সমরনীতি ও ময়দানের অভিজ্ঞতাসহই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেন। ইসলাম তাঁর যোগ্যতাসমূহকে স্বাগত জানাল এবং রাসূল (সা) তাঁকে আল্লাহর তরবারি নামকরণ করে তাঁর মর্যাদা আরো বাড়িয়ে দিলেন। সেই সাথে কুরায়শদের আঞ্চলিক সিপাহসালারকে দুনিয়ার সর্ববৃহৎ বিজয়ী সৈন্যদলের সেনাপতি এবং ইয়ারমুক বিজয়ী সেনানায়কের আসনে সমাসীন করলেন।

আবূ জেহেলের পুত্র ইকরামা (রা)-এর কথা ভাবুন! আরবী জিদ্দী মনোভাব ও ধর্মীয় গোঁড়ামি তাঁর নামকরা পিতার মীরাছ হিসাবে তাঁর শিরা-উপশিরার রক্তের সাথে মিশে ছিল। প্রথমে তো এ শক্তি ও সামর্থ্য রাসূল (সা)-এর বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হতো। কিন্তু যখন জীবনের মোড় ঘুরে গেল, তখন এ সকল প্রতিভার মোড়ও ঘুরে গেল। ইয়ারমুকের যুদ্ধক্ষেত্রে যখন বড় বড় বীর মুজাহিদের পা নড়বড় করতে লাগল আর দুশমনদের আক্রমণ তীব্রতর রূপ ধারণ করল, তখন তিনি ধিক্কার দিয়ে আহ্বান করলেন, বুদ্ধির দুশমনেরা! আমি তো এমন এক ব্যক্তি যতক্ষণ হক বুঝে আসেনি তখনও তো রাসূল (সা)-এর বিরুদ্ধে কখনো পশ্চাৎপদ হই নি। আর আজ যখন হক বুঝে এসেছে, ইসলামে দীক্ষিত হয়েছি তখন তোমাদের মুকাবিলায় পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে ঘরে ফিরব? এ বলে তিনি অগ্রসর হলেন এবং বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করতে করতে শাহাদত বরণ করলেন। জাহিলিয়তের সিংহপুরুষ ও পাহাড়ের ন্যায় অটল অবিচল ব্যক্তি সেদিনও নতুন দুশমনের মুকাবিলায় পাহাড়ের মত অটল ও অবিচল ছিলেন।

হযরত সালমান ফারসী ও আবদুল্লাহ্ ইবন সালাম (রা) শিক্ষিত জাতির সদস্য ছিলেন। তাঁরা কিতাব ও শিক্ষা বিষয়ক অনেক পরিভাষা সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন। যখন তাঁরা ইসলামে দীক্ষিত হলেন তখন তাঁদের শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়েই ইসলামে দীক্ষিত হলেন। ফলে ইসলামের বহু জ্ঞানগর্ভ ও তাত্ত্বিক অংশ অন্যদের তুলনায় তাঁদের বুঝতে অনেক সহজ হলো। এ হলো হাজার হাজার ও স্বভাবগত যোগ্যতার কয়েকটি যাঁদের স্বভাবগত যোগ্যতাকে ইসলাম কাজে লাগিয়েছে।

হযরত মুহাম্মদ (সা) রিসালত লাভের সময় রোমান সাম্রাজ্য, পারসিক সাম্রাজ্য, মিসর ও ভারতবর্ষ বংশীয় ও বিচক্ষণতার দিক দিয়ে একক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিল। কুফর ও শিরকের অর্থ এ নয় যে, উর্বর এ মানব সর্বপ্রকার যোগ্যতা থেকে মাহ্রূম, সর্বপ্রকার কল্যাণ থেকে রিক্তহস্ত ছিল। বাস্তবতা কিন্তু এমন নয়। কারণ ইরানের লোকেরা সংস্কৃত ও পরিপাটিময় জীবন যাপনের ক্ষেত্রে এক বিশেষ মর্যাদার আসনে সমাসীন ছিল। সাথে সাথে সূক্ষ্ম কারুকার্যময় ও নিপুণ শিল্প দক্ষতা তাদের জীবন যাত্রার ক্ষেত্রকে আরো অধিক আভিজাত্যময় করে দিয়েছিল। শিক্ষার ক্ষেত্রে পারস্যের বিজ্ঞ পণ্ডিত ও লেখকবৃন্দ, বাদশাহ নওশেরওয়ানের পৃষ্ঠপোষকতা ও তৎকালীন অনুবাদকৃত বিষয়বস্তু তাদের মাঝে জ্ঞানের পিপাসা বাড়িয়ে দিয়েছিল। সাসানীয়দের সুদীর্ঘ রাজত্ব কাল তাদেরকে দেশ গঠন পদ্ধতি, ভূমি জরীপ ব্যবস্থা ও অর্থনীতি, প্রশাসন ও রাষ্ট্রনীতি ব্যবস্থা শিক্ষা দিয়েছিল। রোমান ও গ্রীকদের শিক্ষা-সংস্কৃতির উত্তরসুরি বায়যান্টাইনগণ গবেষণামূলক ধ্যান-ধারণা ও নৈতিকতার ক্ষেত্রে বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিল। মিসরীয়গণ চাষাবাদ ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এক বিশাল অভিজ্ঞতার অধিকারী ছিল। সাথে সাথে তাদের মধ্যে ধর্মীয় অনুভূতি ও ধর্মের জন্য কুরবান হওয়ার প্রবণতা এত অধিক হারে ছিল যে, তারা এক দীর্ঘ কাল পর্যন্ত রোমকদের ধর্মীয় যুলুম অত্যাচারের মুকাবিলা করেছিল। ভারতীয়গণ গণিতশাস্ত্র, অর্থ-সম্পদ ব্যবস্থা ও ওফাদারীর ক্ষেত্রে এক বিশেষ মর্যাদার অধিকারী ছিল।

মুসলিম জাতি যখন এ সকল দেশ জয় করে, তখন এসব দেশের সর্বস্তরের মানব সম্পদকে অত্যন্ত প্রশস্ত চিত্তে কাজে লাগিয়েছিল। তাদের সর্বপ্রকারের যোগ্যতাকে ইসলামের পথে ব্যয় করেছিল। ইরান ও রোমের নও মুসলিমগণ বা নও মুসলিমদের বংশধরগণ জ্ঞানের উন্নতি, অগ্রগতি ও ফিকহ্শাস্ত্র সংকলনের ক্ষেত্রে তাঁদের বুদ্ধি ও বিচক্ষণতা দ্বারা মহান ভূমিকা পালন করে। তারা দেশে অফিসিয়াল ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন ও অর্থনৈতিক রূপরেখা প্রণয়নে সাহায্য করে। অভিজ্ঞ ব্যবস্থাপক দান করে ইসলামী রাষ্ট্রসমূহের ব্যাপক উন্নতি সাধন করে। মিসরীয়গণ অনাবাদী জমিতে চাষাবাদ করে এবং ব্যবসা ও কারিগরিবিদ্যার ব্যাপক প্রসার ঘটায়।

ভারতীয়গণ বসরা ও বাগদাদকে আমানতদার ও অভিজ্ঞ হিসাবরক্ষক, খাজাঞ্চী ও বিশ্বস্ত কর্মচারী সরবরাহ করে। হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগের কথা বিশিষ্ট লেখক জাহিয এভাবে বর্ণনা করেন ঃ ইরাকের বড় বড় শহরের বড় বড় ব্যবসায়ী ও ধনাঢ্য ব্যক্তির অধিকাংশ মুন্সি ও কর্মচারী সিন্ধুর হতো। এভাবে এ সকল জাতি-গোষ্ঠীর যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা ইসলামের পতাকাতলে সমবেত হয়ে ইসলাম ও মুসলিম জাতির শান-শওকত বৃদ্ধির কারণ হয়েছিল। সুতরাং যদি আরবেরা এ সকল যোগ্যতা অর্জনের পেছনে পড়ত, এর অপেক্ষায় থাকত এবং ইসলাম যদি তাদেরকে এমন প্রস্তুতকৃত যোগ্য লোক সরবরাহ না করত, তাহলে শুধু আরব মুসলিমদের দ্বারা এত বড় বিপ্লব সাধনের জন্য এক লম্বা সময়ের প্রয়োজন হতো। এর পরেও এতে সন্দেহ থেকে যেত যে, তারা এত দ্রুত এমন অভিজ্ঞতাসম্পন্ন লোক তৈরি করতে সক্ষম হতো কি না!

ইসলাম এক চিরন্তন পয়গামের নাম যা কোন বিশেষ দেশ, জাতি ও বর্ণের জন্য নয়। জাতি-গোষ্ঠী তার কাছে লেবাসের সমতুল্য। যখন একটি লেবাস অকেজো ও ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে যায়, তখন অন্য একটি লেবাস পরিধান করে নেয়। দুনিয়ার কোন দেশ ও জাতি-গোষ্ঠীর উৎসাহ উদ্যম ও কর্মতৎপরতা এক গতিতে প্রবাহিত হয় না। কখনো কারো উত্থান হয়, কখনও তার পতন হয়। কারণ প্রতিটি জাতির একটি স্বাভাবিক সময় থাকে। মানুষের মত দেশ ও জাতির যৌবনকাল ও বার্ধক্যের মাঝে ব্যবধান হয় না। কখনও কখনও কোন কোন দেশ ও জাতির মাঝে অজানা কারণবশত ক্লান্তি ও ভারসাম্যহীনতার লক্ষণসমূহ সময়ের আগেই পরিলক্ষিত হয় এবং দেহের শিরা-উপশিরা শুষ্ক হয়ে নতুন রক্ত সৃষ্টি ও সঞ্চরণ ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। ফলে তার প্রতিটি অঙ্গ প্রাণহীন নিস্তেজ মনে হয়। সময়ের ডাকে সাড়া দেওয়া ও অবস্থার মুকাবিলা করার ক্ষমতা হারিয়ে যায়। হক তথা ন্যায়নিষ্ঠার জন্য ত্যাগের মানসিকতা, সর্বসম্মত ঐক্য, মায়া-মমতা, স্নেহ-ভালোবাসা, দুশমনের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক জিহাদের স্পিরিট, তাদের বিরুদ্ধে স্বাভাবিক ঘৃণা ও শত্রু মূলক মনোভাব পোষণ করার এসব যোগ্যতা যখন কোন জাতি হারিয়ে ফেলে, যা জীবনের আলামত বলে বিবেচিত, তখন সে জাতি এমন কোন কাজের যোগ্য থাকে না যেখানে হিম্মত ও আযীমত, ত্যাগ ও কুরবানী, মানসিক, আত্মিক ও নৈতিক শক্তি এবং বুদ্ধিবৃত্তির সর্বাপেক্ষা বেশি প্রয়োজন। ইসলাম শুরুর যমানা থেকে যখনই এমন অবস্থার সম্মুখীন হয়েছে আর ইসলামের পতাকাবাহী দল সে অবস্থার মুকাবিলা করার পরিবর্তে ময়দান ছেড়ে পালিয়েছে, তখনই আল্লাহ্তাআলা ইসলামের খিদমতের জন্য এক নবোদ্যমী সাহসী জাতির উত্থান ঘটিয়েছেন যে জাতি ইসলামের ভূলুণ্ঠিত পতাকা আবার উড্ডীন করেছে এবং তাদের মাঝে ঈমানী যিন্দেগীর পরিপূর্ণ বৈশিষ্ট্য পাওয়া যেত। আল-কুরআনের ভাষায় ঃ

يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهٗٓ اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِيْنَ ـ يُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَايَخَافُوْنَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ـ

"আল্লাহ্ তাঁদেরকে মুহাব্বত করেন এবং তারা আল্লাহ্কে মুহাব্বত করে, ঈমানদারদের ব্যাপারে কোমল আর কাফিরদের ব্যাপারে কঠোর, আল্লাহ্র রাস্তায় তারা জিহাদ করে এবং কোন ভর্ৎসনাকারীর ভর্ৎসনার পরওয়া করে না।"

[সূরা মায়েদা ঃ ৫৪]

মূলত এ ছিল লেবাসের পরিবর্তন। চিরন্তন ইসলামের জন্য এ কোন জরুরী বিষয় নয় যে, সে পুরাতন ফাটা ছেঁড়া ব্যবহারের অযোগ্য লেবাসে সর্বদা আবৃত থাকবে। ইসলামের বিধান হলো ঃ

إن الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين ـ

"আল্লাহ্ তা'আলা এ কিতাব (কুরআনের)-এর মাধ্যমে অনেক মানুষকে মর্যাদার আসন দান করবেন এবং অনেক মানুষকে (যারা এ কিতাবকে পরিহার করে) নিচু করবেন।" (মুসলিম শরীফ)

যখন ইসলামের প্রথম পতাকাবাহী আরবদের মাঝে দুর্বলতা ও ভারসাম্যহীনতার সূচনা হয়, ইসলামের প্রতি অমনোযোগী ও ইসলামের খিদমত ও তার জন্য আত্মোৎসর্গ করার স্পৃহা পতনমুখী হয় এবং দুনিয়ার খিদমতের দিকে ধাবিত হয়, তখন আল্লাহ্ তা'আলা ইসলামের পতাকা সমুন্নত রাখার জন্য অনারব সদস্য ও নও মুসলিমদের সন্তানদেরকে প্রস্তুত করেন যারা ইসলামী চেতনা, জিহাদী প্রেরণা, শাহাদতের তামান্না ও ইশকে রাসূল (সা)-এর ক্ষেত্রে অনেক খাঁটি সৈয়দ ও শেখ পরিবার থেকে অগ্রগামী ছিল। সুতরাং যখন ইউরোপ থেকে ক্রুশবাহী খ্রিস্টান সৈন্যদের আক্রমণ শুরু হলো এবং ফিলিস্তীন, লিবিয়া ও আরবদেশসমূহ বিশেষভাবে বিপদের সম্মুখীন হলো, চরম বেয়াদব ও উদ্ধত রক্ত-চক্ষু মদীনা ও রওযা শরীফের দিকে চাইতে লাগল, লাগামহীন অপবিত্র মুখে বেয়াদবীর সীমা লংঘন করতে লাগল, তখন ইসলামের মর্যাদা রক্ষার্থে, রাসূল (সা)-এর আদব রক্ষার্থে যে সব মর্দেখোদা ময়দানে নেমেছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন যঙ্গী ও অপরজন কুরদী ছিলেন। সুলতান নূরউদ্দীন যঙ্গী শহীদ ও সুলতান সালাহ্উদ্দীন আইয়ূবী শুধু ইসলামের ইয্যত রক্ষা করেননি, বরং ইউরোপের ওপর ইসলামের বিজয় ডংকাও বাজিয়েছিলেন। সুলতান সালাহউদ্দীন বেয়াদব পারসনকে নিজ হাতে হত্যা করেন এবং সে সময় প্রিয় নবীর (সা) ইশ্ক ও মুহব্বতের সাগরে ডুবে যে বাক্য বলেছিলেন তা বড় বড় হাশেমী, সিদ্দিকী, ফারূকীর জন্য গর্ব ও নাজাতের কারণ। তিনি বলেছিলেন ঃ

اليوم انتصر لمحمدا صلى الله عليه وسلم ـ

আজ আমি মুহাম্মদ (সা)-এর পক্ষ হতে প্রতিশোধ নেব। আর এ কারণে এমন কোন হাশেমী নেই যে আজ তার ওপর কুরবান হতে প্রস্তুত না হয়ে পারে। কারণ তিনি ইশ্‌ক ও মুহাব্বতের শরাব পিয়ে মত্ত হয়ে শানে রিসালতের দুশমনকে স্বহস্তে হত্যা করেন। কে আছে যে আজ এ কুর্দীর ঈমানের সাথে তাঁর ঈমানকে এক পাল্লায় মেপে দেখবে, অথচ তাঁর পূর্বপুরুষ কয়েক পুরুষ পূর্বেও কুর্দিস্তানের অজ্ঞতার অন্ধকারে হারিয়েছিল এবং আজও তার কোন হদিস পাওয়া যায় না?

এরপর যখন আব্বাসীয় রাজপরিবার আরাম-আয়েশের অতল সাগরে ডুবে ছিল তখন ইসলামের মহত্ত্ব ও মর্যাদাকে রক্ষার জন্য আল্লাহ্‌তা'আলা সালযুকীদেরকে ময়দানে আনলেন। তারা প্রায় এক শত বছর যাবত ইউরোপের বুকে জিহাদের পতাকা সমুন্নত রাখেন এবং বাগদাদের নিযামিয়া ও নিশাপুরের মাদ্‌রাসার মাধ্যমে ইলমে নব্বীর সমুদ্রকে জগৎব্যাপী প্রবাহিত করেন। এরপরে যখন আব্বাসীয়দের ভাগ্যবৃক্ষ ঘুণে খেয়ে গেল, তখন তাতারীদের আক্রমণ তাদেরকে মূলোৎপাটন করেছিল। এই তাতারীরা যারা কিছুদিন আগে আব্বাসীয়দের রক্তে স্নান করে হোলি খেলাই মেতেছিল। তারাই তাদের ইসলাম কবুল করে তাদের গোলামদের কাতারে শামিল হলো এবং ইসলামের খিদমতে আত্মনিয়োগ করে ধন্য হলো। এসব ইসলামের সদাসঞ্জীবন বৃক্ষের কচি-কোমল পাতা ও ফুল–কলি যারা সর্বাবস্থায় ইসলামের সজীব শ্যামলতা অক্ষুণ্ন রেখেছে। অতঃপর আবার যখন প্রাচ্যের সকল পুরাতন মুসলিম জাতি সর্বাত্মকভাবে হতাশার শিকার হয় এবং জীবনের কোন অগ্নিস্ফুলিংগ কোথাও অবশিষ্ট ছিল না, তখন আল্লাহ তা'আলা পাশ্চাত্যে ইসলামের জ্বলন্ত শিখার আবির্ভাব ঘটান যারা এক শতাব্দী নাগাদ ইউরোপের ইচ্ছার বিরুদ্ধে স্বয়ং ইউরোপের যুদ্ধে ইসলামের পতাকা সমুন্নত রাখে আর এ হলো উসমানী খিলাফত। যদিও তারা রক্ত ও বংশের দিক থেকে হযরত উসমান (রা)-এর বংশীয় নয়, কিন্তু আল-কুরআনের খিদমত, এর প্রচার-প্রসার ও বিজয়ের ক্ষেত্রে হযরত উসমান (রা)-এর সাথে তাদের রূহানী সম্পর্ক আছে। লক্ষ লক্ষ নও মুসলিম জাতি ও সম্প্রদায়ের মধ্যে ক'জনের কথা বলা যেতে পারে যারা ইসলামের অবকাঠামোতে সহীহ্ ও শক্তিশালী খুন সঞ্চার করেছেন। তাঁরা তাঁদের চিন্তা-চেতনা, বংশীয় বিচক্ষণতা ও জাতিগত বীরত্ব ও হিম্মতের মাধ্যমে কখনও মুসলমানদের মাঝে ইজতিহাদ, আবার কখনও জিহাদের প্রেরণা জুগিয়েছেন, ইসলামী কুতুবখানাতে অমূল্য গ্রন্থের সংযোজন ঘটিয়েছেন, চিন্তা-চেতনার নবদ্বার উন্মোচন করেছেন, আল-কুরআনের তফসীর, হাদীসের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন, আইনশাস্ত্র প্রণয়ন ও সংকলন করেছেন। এ নিশাপুরী ও আবুস সউদ তুরকী যাঁদের তাফসীর গ্রন্থ আজও দরসের অলংকার? এ বায়যাবী

শরীফের টীকা লেখক শায়খযাদা শিয়ালকোটি কে? হাদীসের খাদেম যায়লাঈ বিন আল-তুরকমানী কোন্ বংশের ? একজন ফিকাহ্শাস্ত্রের ছাত্র হিদায়ার লেখক মারগীনানী ও প্রখ্যাত ফতওয়ার লেখককে ভুলতে পারে? এ সব কী ছিল? ইসলামের চিন্তা-চেতনা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিজয় উম্মতে মুসলিমার দেহে নয়া খুনের সঞ্চারণ ছাড়া আর কিছুই নয়।

বর্তমানেও দূর দূরান্ত পর্যন্ত ইসলামী বিজয়ের অগ্রযাত্রা থেমে থাকে নি। ফলে ইসলামের ধনভাণ্ডারে নতুন নতুন পয়সার সমারোহ চলছে। আমাদের ভারতবর্ষে যেখানে ইসলামী দাওয়াত ও তাবলীগ এক দীর্ঘ সময় পর্যন্ত অত্যন্ত ক্ষীণ গতিসম্পন্ন ছিল। ফলে ইসলাম নিজেই তাকে অনেক জীবন্ত জাগ্রত, বিচক্ষণ, তপ্ত হৃদয়, উচ্চাভিলাষী ব্যক্তিকে দান করেছে, যাদের নজির এ পশ্চাৎপদ, হিম্মতহারা সংকীর্ণ মনোভাব ও বে-একীন-আত্মবিশ্বাসহারা মুসলমানদের কাছে পাওয়া মুশকিল ছিল। তারা মুসলিম জাতির মৃতপ্রায় দেহে নব জীবনের উদ্যম দান করেছে। তাদের মনে ইসলামকে শাশ্বত পয়গাম হিসাবে গ্রহণ করার মত নয়া হিম্মত দান করেছে, তাদের মস্তিষ্ক ইলমের আলোতে উজ্জ্বল করেছে এবং অন্তর প্রেমের যাতনায় উত্তপ্ত করেছে। উদাহরণের জন্য দূরে যাওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। ইকবালের ইশ্ক-মহব্বতের তুলনা কোনো খান্দানী মুসলিম করতে পারে না। প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ানমতে তাঁর শেষ বয়সে এ অবস্থা ছিল যে, মদীনা শরীফের নাম শ্রবণ করার সাথে সাথে তাঁর নেত্রযুগল অশ্রুসিক্ত হয়ে যেত। অনেক হাশেমী ও কুরায়শী [নবী (সা) বংশীয়] এ ব্রাহ্মণযাদার নবী প্রেমের সাথে তার সম্পর্ক ও মুহব্বতের তুলনা করতে পারবে না। সাথে সাথে তাঁর মাঝে ইসলাম যে একটি শাশ্বত পয়গাম এবং রাসূল (সা)-এর ইমামতের প্রতি এমন অটল অবিচল ঈমান ছিল যে, কখনো তিনি একজন দার্শনিক হিসাবে একজন নবী (সা) বংশীয় যুবককে খেতাব করে বলেন ঃ

میں اصل کا خاص سومناتی
ابامرے لاتی ومناتی
توسید ہاشمی کی اولاد
میری کف خاك برہمنزاد
ہےفلسفہ میرے اب وکال میں
پوشیدہ ہے رشیہ ہاےدل میں
اقبال اگرچہ ہے بزھے
اس کیرگ رگ سےباخبرہے
دین مسلك زندگی کی تقویم

دین سد محمدوابراہیم
دل درسخن محمدی بند
اے پورعلی ،زبوعلی چند
چوں دیدہ راھمیں نہ داری
قاندقرشی بہ ازبخاری

আমি মূলত সোমনাথেরই অধিবাসী
আমার পূর্বপুরুষ লাত ও মানাতেরই বিশ্বাসী
তুমিতো হাশেমী বংশের সন্তান
আমার পেশীতে ব্রাহ্মণ্য রক্ত ধাবমান
গ্রীক দর্শন হলো আমার মূল আকর্ষণ
ইকবাল যদিও বা মূর্খ অজ্ঞ ও বেখবর,
তথাপি তার শিরা-উপশিরা সম্পর্কে অভিজ্ঞ
দীন ও মসলকই হলো জীবনের শক্তি অসীম
তাহলে দীন-এ মুহাম্মদ ও ইব্রাহীম
দিল যেন হয় মুহাম্মদ (সা)-এর আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু
হে আলীর বংশধর, সামান্যের তরে হলেও মূল ধারায় ফিরে এসো
যদি তোমার নিকট সঠিক পথ-নির্দেশনা না থাকে
তাহলে আঁকড়ে ধর অন্যকে ছেড়ে মুহাম্মদ কুরায়শীকে।

কিন্তু তাঁর এব কবিতা পাঠ করার পর কেউ কি একথা বিশ্বাস করবে যে, তিনি কাশ্মীরের একজন খালেস ব্রাহ্মণযাদা পুরোহিত ঘরের সন্তান? কোন সঠিক সৈয়দ ও শেখ পরিবারের সন্তান কি এমন ঈমান ও ইয়াকীনের দাবি করতে পারবে?

ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء -

"তাতো আল্লাহ্র অনুগ্রহ তিনি যাকে খুশি তাকে দান করেন"—এর সাথে সাথে ইসলামী প্রেরণা, ঈমানী চেতনা, ইসলামী ভাবধারা, যুগের ফেতনা, ইউরোপিয়ান জাহিলিয়তের চিহ্নিতকরণ, জাতীয়তাবাদ ও দেশাত্মবোধকে ঘৃণা ও প্রতিহত করার ক্ষেত্রে অনেক জ্ঞানী, গুণী ও সহীহ্ সুধী মহল তার মুকাবিলা করতে অক্ষম।

এদিকে কয়েক বছর পূর্বে লিখিত কয়েকটি কিতাব সঠিক ইসলামী চিন্তা-চেতনাকে অত্যন্ত চমকপ্রদ পদ্ধতি, আকর্ষণীয় বিন্যাস শৈলী ও যুক্তিপূর্ণ উপস্থাপনার নমুনা পেশ করে এবং ইসলামের যথাযোগ্য মুখপাত্রের দায়িত্ব পালন

করে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো অস্ট্রেলিয়ার ইহুদী বংশীয় এক জার্মান নওমুসলিম মুহাম্মদ আসাদের আলোড়ন সৃষ্টিকারী গ্রন্থ "ISLAM AT THE CROSS ROAD"—এসব কিছুই ইসলামের তাজা ইলমী, আখলাকী ও চিন্তাগত বিজয় যা আমাদেরকে ভবিষ্যতের তিমিরাচ্ছন্ন আঁধারের মাঝে সুবহে উম্মিদের পয়গাম দেয়।

কিন্তু সাধারণভাবে মুসলিম জাতি শৌর্য-বীর্য প্রদর্শনের ক্ষেত্র ও বিজয় করতলগত করার ঐসব ময়দান থেকে আত্মবিস্মৃত হয়ে চোখ বন্ধ করে আছে যেখান থেকে তাদের টগবগে তাজা খুন, মুক্ত বুদ্ধি, দরদভরা ভগ্ন হৃদয় ও উদ্যম চঞ্চল দেহ পেত। মুসলিম জাতি আজ এ সকল ক্ষেত্র থেকে দিন দিন হতাশ হতে চলেছে, অথচ তাদের সেই পুরাতন ময়দান থেকে একটু অন্যদিকে চিন্তা করার অবকাশ নেই। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, ঐ সকল পুরাতন ক্ষেত্রই ইসলামের মূল পুঁজি বিধায় কোন অবস্থায় তা ধ্বংস হতে দেওয়া যায় না। কিন্তু সর্বজনবিদিত যে, যে মূলধনকে বাড়ানোর চিন্তা করা হয় না বা যেখানে নতুন আমদানীর সম্ভাবনা নেই, তা একদিন নিঃশেষ হয়ে যাবে। তাই চিন্তা-ভাবনা করে ইসলামের মূলধনের মাঝে ব্যাপক আমদানী ও নতুন সংগ্রহের পথ ও পন্থা বের করা প্রয়োজন। কারণ পুরাতন খান্দানী মুসলিমদের মাঝে অনীহা, অলসতা, জড়তা ও অসারতা ছেয়ে গেছে। ফলে ইসলামের পুনর্জাগরণ ও বিজয় কেতনের ব্যাপারে তারা হতাশ হতে চলেছে। তাদের শিরা-উপশিরা রক্ত সঞ্চালন ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে এবং দেহ পঙ্গু হয়ে পড়েছে, দিল মৃতপ্রায় আর দেমাগ বিকল হয়ে গেছে। তাই যে কোন দীনী পয়গাম, ধর্মীয় আন্দোলন, যে কোন ইখলাসভরা ব্যথাতুর হৃদয়ের ডাক, কোন ইল্‌ম ও হিকমত, জাগরণমূলক কবিতা ও অগ্নিঝরা বক্তৃতা তাদের মাঝে জীবন দান করতে অক্ষম। যে সকল জিনিস কোন জাতির মাঝে আবেগউন্মাদও মৃত্যুর প্রতি মুহাব্বত সৃষ্টি করতে সক্ষম ছিল সে সকল পথ ও পন্থা এ সকল খানদানী মুসলমানকে গাফলত থেকে জাগাতে অক্ষম। মুসলিম জনগোষ্ঠীর এক বৃহৎ সংখ্যা আজ এমন যাদের সাথে দীন ও দীনের পথ, ধর্মীয় পরিভাষা ও ধর্মীয় অনুগ্রহসমূহের সাথে কোন সম্পর্ক নেই এবং দীনের প্রতি তাদের কোন আন্তরিক আকর্ষণও নেই। তাদের কাছে আখিরাত কোন আলোচনার বিষয় নয়। জান্নাত ও জাহান্নাম অর্থহীন দু'টি শব্দ মাত্র। তাদের ওপর দুনিয়াবী চাহিদা, মানবিক চাহিদা ও যুগের হাওয়ার গতিতে চলার ভূত সওয়ার হয়ে আছে। তাদের অবস্থা হলো আল-কুরআনের ভাষায় ঃ

إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ ـ

"আপনি তো আপনার ডাক মৃতদেরকে শোনাতে পারেন না বা বধিরদেরকেও শোনাতে পারেন না।" [সূরা রূম ঃ ৫২]

অনেক মানুষ এমন আছে যাদের জ্ঞানের পরিধি অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। স্বভাবগত ও বংশীয় দিক দিয়ে দীর্ঘ দিন যাবত জড়তা ও জ্ঞান চর্চা থেকে পিছিয়ে থাকার কারণে তাদের শক্তিতে ঘুণ ধরেছে এবং স্বভাব-চরিত্র সীমাহীন জড়তা ও নিস্তেজের শিকার হয়ে আছে। ফলে সে জীবন সংগ্রামে অংশ নেওয়ার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছে এবং ইসলামের পতাকা সমুন্নত রাখার জন্য কুরবানী ও ত্যাগের ক্ষেত্রে হয়েছে অযোগ্য। এ অবস্থায় যদি ইসলামের ভাগ্য নির্ধারণের কাজ এ সকল অলস ও বিকলাঙ্গ ব্যক্তি বা জাতি-গোষ্ঠীর ওপর ছেড়ে দেওয়া হয় এবং সকল প্রকার চেষ্টা-তদবীর এমন অকেজো জনসমাজের মাঝে সীমাবদ্ধ রাখা হয়, তাহলে অদূর ভবিষ্যতে ইসলাম এক নয়া তুফানের মুখোমুখি হবে। এজন্য অনতিবিলম্বে এ সকল খান্দান মুসলমানদের দীনের হিফাযতের চেষ্টা ও প্রচেষ্টা করার সাথে সাথে নতুন খনিজ সম্পদের সন্ধান করা প্রয়োজন এবং ইসলামের দাওয়াত তাদের কাছেও পৌঁছানো উচিত। হতাশা ও নৈরাশ্যের কালো তিমিরের মাঝেও যে ধর্ম তাতারী ও তুরস্কের উসমানীয়দেরকে ইসলামের পতাকাবাহী ও রাসূল (সা)-এর জন্য আত্মোৎসর্গকারী তৈরি করতে পারে, সর্বদা মূর্তিপূজারীর ঘর থেকে কা'বার নির্মাতা ও মুহাফিযের ব্যবস্থা করতে পারে, সে দীন কি আজ তার শত্রুদলকে মিত্র ও দীনে ফিতরতের ছায়াতলে আশ্রয় দিতে পারে না? সুতরাং যতক্ষণ এজন্য কোন পরিকল্পনা বা প্রোগ্রাম তৈরি এবং সে অনুপাতে প্রাণপণ চেষ্টা-তদবীর না করা হয়, ততক্ষণ নিরাশা বা এর বিরুদ্ধে কোন প্রকার মতামত পেশ করার অধিকার নেই।

এ যুগসন্ধিক্ষণে ইসলামের জন্য নয়া খুন, নতুন হিম্মত, নতুন উদ্যম, তারুণ্য আর নিঃস্বার্থ ত্যাগ-তিতীক্ষার প্রয়োজন। এ নয়া খুন, নতুন হিম্মত, উদ্দাম তারুণ্য ও নিঃস্বার্থ ত্যাগ-তিতীক্ষা পৃথিবীর অনেক জাতির মাঝে বিদ্যমান। কিন্তু তা আজ অহেতুক ও অতি নগণ্য ক্ষেত্রে ঝরে যাচ্ছে। যে শক্তি-সামর্থ্য ইসলামের পথে, ইসলামের কাজে ব্যয় না হয়, তা শুধু নষ্টই হয় না, বরং তা বিশ্বমানবতার ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ইসলামের শাশ্বত পয়গাম আজ পর্যন্ত ঐ সকল জাতিগোষ্ঠীর কান পর্যন্ত পৌঁছেনি। তাই আমাদের ওপর ফরয আজ ইসলামের দাওয়াত তাদের কাছে পৌঁছিয়ে ইসলামের শক্তি ও ঈমানের তামাশা দেখি যা আমরা কখনো কখনো দুনিয়ার ইতিহাসে নও মুসলিমদের জীবনে লক্ষ্য করেছি। এ সকল নও মুসলিমের জীবনে ইসলামের শাশ্বত পয়গাম ও প্রিয় নবী (সা)-এর বিশ্বব্যাপী ইমামতের ব্যাপারে এমন অবিচল ইয়াকীন, প্রিয় নবী (সা)-এর ব্যক্তিত্বের প্রতি এমন প্রেম-ভালোবাসা, ইসলামের পতাকা চিরউন্নত রাখার জন্য এমন আত্মত্যাগ ও কুরবানী নিয়ে সামনে আসবে যার সামনে আমরা যারা বংশানুক্রমে মুসলমান হয়ে আসছি, লজ্জায় মাথা নুয়ে যাবে এবং যার নজীর শতাব্দীকাল পর্যন্ত দেখা যায়নি।

মরদে খোদা কা ইয়াকীন

(প্রগাঢ় ঈমানই সফলতার উৎস)

বিশ্বাসের বিজয়

কে না জানে ইয়াকীন বা বিশ্বাস দুনিয়ার সবচেয়ে বড় শক্তি! কখনও কখনও এক ব্যক্তির বিশ্বাস হাজার হাজার মানুষের সন্দেহ ও সংশয়ের ওপর বিজয়ী হয়ে থাকে। যখন কোন মরদে মু'মিন কোন কথার ওপর পাহাড়ের মত অটল-অবিচল হয়ে দাঁড়িয়ে যান এবং পরিস্থিতির সম্মুখে আত্মসমর্পণ করতে অস্বীকার করেন ও বিশ্বাসের সম্পর্ককে বলিষ্ঠ হস্তে ধারণ করেন, তখন যুগের প্রচলিত ধারা পরিবর্তিত হয়ে যায়। দূরদর্শী, বিজ্ঞ চিন্তাবিদদের ধারণা ভুল প্রমাণিত হয়, তাদের ভবিষ্যৎ বাণী মিথ্যা সাব্যস্ত হয়। কিন্তু মরদে মু'মিনের বিশ্বাস যাবতীয় সন্দেহ ও সংশয়ের মেঘ এবং সকল ভয়ভীতি ও কুয়াশা ভেদ করে উজ্জ্বল সূর্যের মত উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

ইতিহাসে এ ধরনের ইয়াকীন ও তার বিজয়ের আশ্চর্য ধরনের দৃষ্টান্তের সমারোহ দেখতে পাওয়া যায়। আসমানী গ্রন্থসমূহ ও আম্বিয়া আলায়হিমু'স্ সালামের সীরাত এ ধরনের অনেক অলৌকিক ঘটনা পেশ করেছে যা পাঠ করলে মানব হৃদয় থমকে ওঠে। মনে হয় এসব ঈমান ও ইয়াকীনের জীবন্ত মু'জিযা।

একটু চিন্তা করুন মূসা (আ)-এর ঘটনা। যখন তিনি বনী ইসরাঈলকে নিয়ে মিসর থেকে রওয়ানা হন এবং লোহিত সাগর পার হয়ে সীনাই উপদ্বীপে পৌঁছতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু আল্লাহ্‌র ইচ্ছে ছিল ভিন্ন। তিনি রাস্তা ভুল করেন। আর সত্য বলতে কি, এটাই ছিল সঠিক পথ যা আল্লাহ্ পাকের মঞ্জুর ছিল। ভোর হতেই দেখতে পান, উত্তরে যাবার পরিবর্তে পূর্ব দিকে চলেছেন তিনি। একটু পরেই তিনি লোহিত সাগরের তীরে উপস্থিত। সাগর তখন উন্মত্ত ও তরঙ্গবিক্ষুব্ধ হয়ে প্রবাহিত হচ্ছিল। হঠাৎ কানে আওয়াজ আসে, আরে! ওরা তো এসেই গেছে। মূসা (আ) পেছনে ফিরে দেখলেন ফিরাউন সদলবলে উপস্থিত!

বনী ইসরাঈল চিৎকার করে বলল, "মূসা! আমরা কী অপরাধ করেছিলাম, তুমি আমাদের ইঁদুরের মত চুবিয়ে মারার ব্যবস্থা করেছ? আমাদের ধ্বংসের আর কিই বা বাকী আছে?" ...انا لمدركون। আমরা তো ধরাই পড়ে গেছি!" একটু কল্পনা করুন, পাহাড়সম এমন কে আছেন এই কঠিন মুহূর্তে বিচলিত না হয়ে পারেন? এমন কোন্ শক্তি আছে যা এ সুস্পষ্ট বাস্তবতার সম্মুখে অপরাজিত থাকতে

পারে? কিন্তু হ্যাঁ, কেবল পয়গাম্বরগণের ইয়াকীনই এর সম্মুখে বিজয়ী হতে পারে। চোখ ধোঁকা দিতে পারে, কান ভুল শ্রবণ করতে পারে, অঙ্গ-প্রতঙ্গের অনুভূতি ভুল প্রমাণিত হতে পারে, কিন্তু আল্লাহ্‌র বাণী ভুল হতে পারে না। হযরত মূসা (আ) পূর্ণ শান্তচিত্ত ও পরম নির্ভরতার সাথে বললেন كلاان معى ربى ... سيهدين "অসম্ভব এ হতেই পারে না! আমার প্রভু আমার সাথেই আছেন। তিনিই আমাকে পথ প্রদর্শন করবেন, সুপথে পরিচালনা করবেন এবং গন্তব্য স্থানে পৌঁছে দেবেন।" এর পর যা কিছু ঘটেছে তা সকলেরই জানা আছে।

দ্বিতীয় উদাহরণ শ্রবণ করুন। মক্কা শরীফে মুসলমানগণ অত্যাচারের লক্ষ্যস্থল পরিণত হয়েছিল। প্রত্যেক মুসলমানের জীবন বিপদের সম্মুখীন। সকাল হলে সন্ধ্যার ভরসা নেই, আর সন্ধ্যা হলে সকালের বিশ্বাস নেই। বাহ্যত ইসলামের কোন ভবিষ্যতই ছিল না তখন। যে দিনটি অতিবাহিত হতো তা গনীমত মনে হতো। এমনি অবস্থায় এক গরীব মজলুম সাহাবী হযরত খাব্বাব (রা) রাসূল (সা)-এর সম্মুখে উপস্থিত হলেন। রাসূল (সা) তখন কা'বা শরীফের ছায়ায় উপবিষ্ট। খাব্বাব (রা) আবেদন করে বললেন, "হে আল্লাহ্‌র রাসূল! ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গিয়েছে, এবার আল্লাহ্‌র কাছে আমার জন্য দু'আ করুন!" এ কথা শুনে রাসূল (সা) আবেগে আপ্লুত হয়ে উঠলেন, নিজেকে একটু সামলিয়ে নিয়ে বললেন, "খাব্বাব! এতটুকুতেই ঘাবড়িয়ে গেছ? পূর্ববর্তী উম্মতদের অবস্থা তো এত কঠিন হতো, গর্ত খোঁড়া হতো, এরপর মু'মিনদের সেই গর্তে গেঁড়ে তাদের মাথার ওপর তলোয়ার চালিয়ে তাদের দেহকে দু'টুকরো করে ফেলা হতো। আবার কখনও লোহার চিরুনী দিয়ে গোশ্‌তগুলো দেহ থেকে আলাদা করে ফেলা হতো। তবুও নিজ দীন থেকে তারা বিচ্যুত হতো না। আল্লাহ্‌র শপথ! আল্লাহ্ তাঁর দীনকে অবশ্যই পূর্ণতা দান করবেন। এ দীন এমনভাবে বিস্তৃতি লাভ করবে, য়ামান থেকে হাদারামাউত পর্যন্ত (হাজার হাজার মাইল) একজন লোক সফর করবে, কিন্তু আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন ভয় তাকে স্পর্শ করবে না। শুধু বাঘের ভয় থাকবে, না জানি কখন ছাগল পালের ওপর হামলা করে বসে, অথচ তোমরা বড়ই তাড়াহুড়া করছ।"

একবার ভাবুন সেই সময়কার কথা, যখন আরব ছিল খুন-খারাবী ও হত্যা লুণ্ঠনের লীলাভূমি! সাথে সাথে ইসলামের অসহায়ত্ব ও দুর্বলতার কথাও লক্ষ্য করুন। (এমনি পরিস্থিতিতে বুদ্ধি-বিবেকবহির্ভূত এমন ভবিষ্যত বাণী সেই ব্যক্তি ছাড়া আর কে করতে পারে যার অন্তর নবুওতী বিশ্বাসে পরিপূর্ণ?)

আরেকটি ঘটনা, যা এর চেয়ে আদৌ কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। অবস্থা এই যে, হযরত নবী করীম (সা) ও আবূ বকর (রা) হিজরত করে মদীনায় যাচ্ছিলেন। দুর্বলতা ও দৈন্যের অবস্থা এই যে, মক্কার মত প্রিয় মাতৃভূমি ছাড়তে হচ্ছে। রাস্তায়

কোন নিরাপত্তা নেই। পেছন থেকে কুরায়শরা দ্রুত ছুটে আসছে। অবশেষে ঘটনা এই ঘটল, সুরাকা বিন্ জু'শ্ম দ্রুতগামী ঘোড়ায় চড়ে অস্ত্রসজ্জিত অবস্থায় ঘাড়ের ওপর উপস্থিত প্রায়! হযরত আবূ বকর ঘাবড়িয়ে গিয়ে বললেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! ওতো এক্ষণি এসে পড়ল বলে!" রাসূল (সা) বললেন, "ঘাবড়িও না। আল্লাহ্ আমাদের সাথে আছেন।" তিনি দু'আ করলেন, ঘোড়ার পা যমীনে পুঁতে গেল। সুরাকা বলল, "হে মুহাম্মদ (সা), দু'আ করুন যেন এ বিপদ থেকে মুক্তি পেতে পারি। আমি এ দায়িত্ব গ্রহণ করছি যে, পিছু ধাওয়াকারীদের ফিরিয়ে দেব।" রাসূল (সা) দু'আ করলেন, ঘোড়া উঠে আসল। সুরাকা আবার ধাওয়া করার ইচ্ছা করলে আবার ঐ ঘটনা ঘটল। আবার সে আবেদন করল। এবার মুক্তি পেয়ে সে তার উট রাসূল (সা)-এর খেদমতে পেশ করলে রাসূল (সা) বললেন, "তোমার উটের আমার প্রয়োজন নেই।" সুরাকা যখন ফিরে যেতে উদ্যত হলো তখন রাসূল (সা) বললেন, "সুরাকা! ঐ সময় কেমন হবে, যখন তোমার হাতে পারস্য সম্রাট কিসরার বালা শোভা পাবে? গরীব সুরাকা কিছুতেই বুঝতে পারছিল না, একজন গরীব বেদুঈনের হাতে কোনদিন কিসরার বালা শোভা পাবে? সে বড় আশ্চর্য হয়েই বলল? কিসরা বিন হরমুযের বালা?

রাসূল (সা) বললেন ঃ হ্যাঁ!

একটু চিন্তা করুন! এই নিঃস্ব সহায়-সম্বলহীন অবস্থায় এ কোন্ দৃষ্টি ছিল, যা আরবের এক গরীব বেদুঈনের হাতে শাহানশাহ্ ইরানের বালার সৌন্দর্য অবলোকন করছে? এবং কার মুখ থেকে এ ভবিষ্যৎ বাণী উচ্চারিত হচ্ছে? বাহ্যত তখন কি এমন কোন সম্ভাবনার কথা কল্পনা করা যেত? এ ছিল নবুওতী দৃষ্টি, যা দূর ভবিষ্যত আকাশের অস্পষ্ট তারকাকেও দেখতে পায় এবং বাহ্যিক বুদ্ধি-বিবেকের ও ঘটনা-প্রবাহের বিপরীত কোন ঘটনার সংবাদ দিতে কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হয় না।

এখন একটু সম্মুখে অগ্রসর হোন। খন্দকের যুদ্ধের পূর্ব মুহূর্তে মদীনার আশেপাশে পরিখা খনন করা হচ্ছে। খোদ রাসূলে খোদাও কর্মব্যস্ত। এমন সময় একটি পাথর পাওয়া যায়, যা ভাঙতে কোদাল অচল হয়ে যায়। সাহাবা-ই-কিরাম (রা) রাসূল (সা)-এর নিকট আবেদন করলেন। হুযূর তাশরীফ আনলেন। তখন অবস্থা এই ছিল, ক্ষুধার দরুন রাসূল (সা)-এর পেটে দুটি পাথর বাঁধা। রাসূল (সা) কোদাল দ্বারা আঘাত করেন, পাথর দু'টুকরা হয়ে যায়। তা থেকে বেরিয়ে আসে এক আলোক রশ্মি। রাসূল (সা) বললেন ঃ এ আলোতে আমি ইরানের শ্বেত প্রাসাদ ও শামের সবুজ মহল দেখতে পেলাম। তোমরা এ সকল মহল বিজয় করবে।

একটু চিন্তা করুন। এ কথা এমন ব্যক্তি বলছেন, যাঁর ঘরে তখন খানাপিনার কিছুই ছিল না। আর বলছেন এমন এক অবস্থায় যখন ইসলামের ও মুসলমানদের

অস্তিত্বই বিপদের সম্মুখীন! আরবের গোত্রসমূহ মদীনায় হামলা করতে উদ্যত এবং তারা জীবন মরণের প্রশ্নের সম্মুখীন, এমন ঘোর অন্ধকারেও পয়গাম্বরের ইয়াকীনের আলো চমকে উঠেছে!

পয়গাম্বরদের পর পৃথিবীতে ইয়াকীনের ইতিহাসে সর্বোৎকৃষ্ট যে উদাহরণ পরিদৃষ্ট হয়, তা হলো হযরত আবূ বকর (রা)-এর ইয়াকীন। তাঁর ইয়াকীন, দৃঢ়তা ও আনুগত্যের মাঝেই তাঁর সিদ্দীক হবার রহস্য ও সার্থকতা ফুটে উঠেছে। তাঁর ঘটনাবলী প্রমাণ করে, তিনিই শ্রেষ্ঠ সিদ্দীক হবার উপযুক্ত। তাঁর ব্যাপারে পণ্ডিত ব্যক্তিদের উক্তি যথাযথই হয়েছেঃ "হযরত আবূ বকর নবী ছিলেন না, কিন্তু কাজ করেছেন নবীর মতই।" তিনি প্রমাণ পেশ করেছেন নবী ও রাসূলগণের মতই অটল ও দৃঢ়তার। দৃশ্যত রাসূল (সা)-এর ইনতিকালের পর সমগ্র আরব জাহানে ধর্মত্যাগের দাবাগ্নি ছড়িয়ে পড়ে। শীতের মৌসুমে যেমন বৃক্ষের পাতা ঝরতে থাকে, এমনিভাবে গোত্রের পর গোত্র ধর্ম ত্যাগ করতে থাকে। এক একদিন দশ বিশটা গোত্রের মুরতাদ হবার সংবাদ এসে পৌঁছেছিল। য়ামান হাদারামাউত, বাহরাইন ও নজদের অঞ্চল মুরতাদ হয়ে যায়। অবস্থা এত দূর এসে গড়ায়, কুরায়শদের বানী ছকীফ গোত্রদ্বয়ই কেবল ইসলামের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। সেই সাথে আরব থেকে নির্বাসিত ইহুদী ও খ্রিষ্ট ধর্ম মস্তক উত্তোলন করে। মুনাফিকী ইতোপূর্বে যা ছিল গোপনে, সামাজিক অপরাধ তার মুখোশ খুলে ফেলে। মানুষ প্রকাশ্যে মুনাফিকী কথাবার্তা বলতে শুরু করে। মুসলমানদের প্রভাব গোটা আরব থেকে বিদায় নেয়। আর তাদের দুশমন ব্যাঘ্র মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করে। ঐতিহাসিকগণ খুব অলংকৃত ভাষায় তদানিন্তন কালের মুসলমানদের চিত্রাংকন করেছেন। বলেন, "মুসলমানদের অবস্থা তখন বর্ষার রাত্রির থর থর কম্পমান মেষ পালের মত হয়ে গিয়েছিল!"

ঠিক এমনি পরিস্থিতি ইয়াকীন, আনুগত্য ও আত্মোৎসর্গের এক এমন আশ্চর্য ও অলৌকিক উদাহরণ দেখা যায় যার নজীর পেশ করতে পৃথিবীর ইতিহাস অক্ষম। হযরত উসামার সেনাবাহিনী যা রাসূল (সা) প্রেরণ করার জন্য প্রস্তুত করেছিলেন, রাসূল (সা)-এর ইনতিকালের কারণে তাঁর সফর মুলতবী হয়ে যায়। অপেক্ষমাণ এ সেনাবাহিনীতে আনসার ও মুহাজিরদের বড় বড় দলপতি ও লড়াইয়ের ময়দানে অভিজ্ঞ যোদ্ধারা বর্তমান। খোদ হযরত ওমর (রা) ও হযরত উসামার অধীনে। আর এ ছিল ঐ সময়ের মুসলমানদের সবচেয়ে শক্তিশালী সেনাবাহিনী। বিবেক ও স্বার্থ চিন্তার ফতোয়া কি ছিল? আর রাজনীতির দাবীই বা এ মুহূর্তে কী ছিল? তা ছিল এই. ফৌজ মদীনায় অবস্থান করুক এবং এদের দ্বারা সার্বক্ষণিক বিপদের সম্মুখীন মদীনাবাসীদের জান-মালের হেফাজত করা হোক! কারণ সে সময় ইসলামের অস্তিত্ব মীদনার ওপরই নির্ভর করছিল। লোকেরা হযরত আবূ বকর (রা)-এর কাছে

সেনাবাহিনী বাইরে না পাঠাবার আবেদন জানিয়ে বলে, এটা কোনক্রমেই সমীচীন হবে না। হামলাকারী ও দুশমনের দৃষ্টি এখন মীদনার প্রতি নিবদ্ধ। সেনাবাহিনীর মদীনা ছাড়ার সাথে সাথেই মদীনার ওপর হামলা করা হবে। এ পরামর্শে মদীনার সকল বুদ্ধিমান ব্যক্তিই শরীক ছিলেন। কিন্তু নবী দরবারের পাগলপারা যাঁর কাছে রাসূল (সা)-এর ইচ্ছা পূর্ণ করা ও তার বাস্তবায়নই ছিল সবচেয়ে বড় বুদ্ধিমত্তা ও কৌশল, পরিষ্কার জবাব দেনঃ শপথ ঐ পবিত্র সত্তার, যাঁর মুঠোয় আবূ বকরের জীবন! যদি আমার এও নিশ্চিত বিশ্বাস হয়ে যায়, বনের হিংস্র প্রাণী আমাকে ধরে নিয়ে যাবে, তবুও আমি রাসূল (সা)-এর পবিত্র ইচ্ছা পূর্ণ করব এবং উসামার বাহিনী প্রেরণ করেই ছাড়ব। এরপর বক্তৃতা দিয়ে তিনি লোকদেরকে জিহাদের জন্য প্রস্তুত করলেন এবং বললেন ঃ যারা উসামার বাহিনীর লোক তারা যেন তাদের অবস্থান জরফে পৌঁছে যায়। এমনিভাবে বাহিনী তার অবস্থানে পৌঁছে গেল। হযরত আবূ বকর (রা) গুণে গুণে এমন কিছু ব্যক্তিকে রেখেছিলেন যাঁরা হিজরত করে এসেছিলেন। এঁদেরকে তাঁদের নিজ নিজ গোত্র সামলাবার কাজে নিয়োগ করলেন। যখন ফৌজের সমস্ত ব্যক্তি একত্র হলো, সেনাপতি হযরত উসামা (রা) হযরত ওমর (রা)-কে হযরত আবূ বকর (রা)-এর খিদমতে প্রেরণ করলেন এবং দ্বিতীয়বার ফৌজ ফিরিয়ে আনতে অনুরোধ করলেন। ওমর (রা)-এর সাথে বড় বড় সাহাবী ও দলপতিও ছিলেন। বাহিনী রওয়ানা হয়ে যাবার পর এই ভয় ছিল, দুশমনরা (ইসলামের) খলীফা ও পবিত্র নবী (সা) পত্নীদের ওপর আক্রমণের দুঃসাহস প্রদর্শন করবে এবং তাঁদের অপহরণ করে নিয়ে যাবে। আনসারেদের পয়গাম এই ছিল যে, হযরত উসামা (রা)-এর পরিবর্তে কোন বয়স্ক ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে সেনাপতি নিয়োগ করা হোক! কারণ উসামা (রা.) খুব কম বয়স্ক। হযরত ওমর (রা) উসামার পয়গাম পৌঁছে দিলেন। প্রতিউত্তরে হযরত আবূ বকর (রা) বলেন, "আমাকে যদি কুকুর ও বাঘে ধরেও নিয়ে যায় তবুও আমি বাহিনী প্রেরণ করব। রাসূল (সা) যার ফায়সালা করে গিয়েছেন আমি তার খেলাফ করতে পারি না। সারা মদীনাতে যদি আমাকে একাও থাকতে হয় তবুও থাকব, কিন্তু এর ওপর আমল করেই ছাড়ব।" হযরত ওমর (রা) বললেনঃ আনসারদের পয়গাম হলো উসামার পরিবর্তে কোন বয়োবৃদ্ধ ও অভিজ্ঞ কোন ব্যক্তিকে সেনাপতি নিয়োগ করা হোক। একথা শ্রবণ করতেই হযরত আবূ বকর (রা) আবেগোদ্বেলিত হয়ে হযরত ওমর (রা)-এর দাঁড়ি চেপে ধরে বললেন, "আল্লাহ্র বান্দা! রাসূল (সা) উসামাকে নিয়োগ করেছেন, আর তোমরা আমাকে তাঁর অপসারণের জন্য পরামর্শ দিচ্ছ?" এসব কথাবার্তার পর হযরত আবূ বকর (রা) সেনাবাহিনীর নিকট আসলেন এবং তাদের বিদায় দিতে দিতে চলতে লাগলেন। তিনি পদব্রজে আর হযরত উসামা (রা) উটের পিঠে। তিনি বললেন ঃ "হে রাসূলের খলীফা! হয় আপনি আরোহণ করুন, নইলে আমি নিচে নেমে

আসি!" বললেন, না আমি আরোহণ করব! আর না তুমি নিচে নেমে আসবে। আমার পদদ্বয় আল্লাহ্‌র রাস্তায় একটু ধূলি-ধূসরিত হবে এতে কী অসুবিধা আছে? কারণ মুজাহিদের প্রত্যেক কদমে সাত শ' নেকী ও সাত শ' মর্যাদা বৃদ্ধি পায় এবং সাত শ' গোনাহ্ মাফ হয়। প্রত্যাবর্তন করতে উদ্যত হয়ে হযরত উসামা (রা)-কে বলেন ঃ যদি তোমার মতামত হয় তবে ওমরকে আমার জন্য রেখে যাও। তিনি খুশীর সাথেই এর অনুমতি প্রদান করলেন। অতঃপর তিনি হযরত উসামাকে অসীয়ৎ করলেন, "দেখ! কোন প্রকার খেয়ানত করবে না, চুক্তি ভঙ্গ করবে না, গনীমতের মাল যাতে চুরি না হয় তার প্রতি কঠোরতা অবলম্বন করবে। শিশু, বৃদ্ধ ও মহিলাদের হত্যা করবে না। কোন ফলের গাছ কাটবে না। কারো ছাগল, গরু ও উট যবাই করবে না। মনে রেখ, এমন কিছু মানুষ তুমি দেখবে, নির্জন ইবাদতখানায় বসে যারা ইবাদত করে, তাদেরকে স্বীয় অবস্থার ওপর ছেড়ে দেবে। এমন কিছু লোকও পাবে যারা মাথা মুণ্ডন করে মাথার উপরিভাগে খোঁপার মত কিছু চুল রেখে দিয়েছে, তাদেরকে তলোয়ার দ্বারা একটু হুঁশিয়ার করে দিও। যাও, আল্লাহ্‌র নামে রওয়ানা হয়ে যাও। আর রাসূল (সা) যে সকল নির্দেশ প্রদান করেছেন তা বাস্তবায়ন করে যেও।"

এরপর কী হয়েছিল? যদি ইতিহাসের এ স্থলে কোন শূন্যতা থাকত এবং বিবেক-বুদ্ধিকে তা পূর্ণ করার অনুমতি প্রদান করা হতো, তবে সে লিখত, এ ছিল এক সাংঘাতিক ধরনের রাজনৈতিক ভুল যার ফলে মদীনার ওপর দুশমনরা আক্রমণ করে এবং মদীনা দুশমনদের অধীনে চলে আসে। কিন্তু আল্লাহ্ পাকের কুদরত, হযরত আবূ বকর (রা) ভালবাসা ও পূর্ণ আনুগত্যের বশবর্তী হয়ে এ কাজ করেছিলেন। আর তাঁর বিশ্বাস ছিল রাসূল (সা)-এর বাসনা পূর্ণ করলে কোন সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে না, বরং সকল সমস্যার সমাধানই হলো রাসূল (সা) বাসনা পূর্ণ করা।

আল্লাহ্ পাকের কুদরত তা সত্য প্রমাণ করে দেখিয়ে ছিল। ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, " এ সেনাবাহিনী রওয়ানা হবার সাথে সাথে সমগ্র আরবের ওপর মুসলমানদের ভয়-ভীতি ও প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। লোকেরা বলতে থাকে, যদি মুসলমানদের কাছে শক্তি না-ই থাকবে, তবে এই বাহিনীকে আক্রমণ করতে কেন পাঠাবে? সুতরাং যারা অসৎ উদ্দেশ্য রাখত তারা চমকে গেল এবং মদীনার ওপর আক্রমণ করার মনোভাব পরিত্যাগ করল। ঐতিহাসিক ইব্‌নে আছীর কথাটিকে তাঁর ভাষায় এভাবে বর্ণনা করেনঃ وكان إنفاذجيش أعظم لاور نفعا للمسلمين "উসামার সৈন্য-প্রেরণ করা মুসলমানদের জন্য বিরাট সফলতা বয়ে আনে।"

[আল্‌কামিল, ২য় খণ্ড, ১২৭-২৮ পৃ.]

দুনিয়া হযরত আবূ বকর (রা)-এর দৃঢ় সংকল্পের এক দৃষ্টান্ত দেখেছিল, কিন্তু বিশ্বাস, ভালবাসা ও দূরদর্শিতার আরও একটি পরীক্ষা তখনো অবশিষ্ট ছিল। রাসূল (সা)-এর ওফাতের পরপরই সমগ্র আরব জাহানে যাকাত অস্বীকারের ফিৎনা সৃষ্টি হয়। এটা মহামারীর গতিতে ছড়িয়ে পড়ে। আরবের সকল গোত্র বলতে লাগল, আমাদের নামায, রোযা ও হজ্জ আদায় করতে কোন অসুবিধা নেই, কিন্তু যাকাতের একটি জন্তুও আমরা প্রদান করতে পারব না। যদি দু'একটি গোত্র একথা বলত তবে তো কোন কথাই ছিল না। কিন্তু দু'চারটি গোত্র বাদ দিয়ে সমগ্র আরব জাহান এ কথাই বলছিল। হযরত আবূ বকর (রা) স্বীয় দূরদৃষ্টি দ্বারা বুঝতে পেরেছিলেন, যাকাতের অস্বীকার ধর্মত্যাগের পূর্বাভাস মাত্র এবং ধর্মদ্রোহিতার সিঁড়ির প্রথম ধাপ যার সাথে সাথে আর সকল ধাপ সম্পর্কযুক্ত। কুফর ও দীন বিকৃতির ও দরজা যদি একবার উন্মুক্ত হয়, তবে তা কিয়ামত পর্যন্ত বন্ধ হবে না। আজ যদি হয় যাকাতের পালা, তো কাল আসবে নামাযের পালা, পরদিন রোযা ও হজ্জের এরপর অবস্থা কী দাঁড়াবে? আল্লাহ হিফাজত করুন! ভবিষ্যতের ভয় যদি নাও থাকত তবুও হযরত আবূ বকর (রা)-এর জন্য এটা মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না, "দীনের যে সমষ্টি রাসূল (সা) রেখে গিয়েছেন এবং হযরত আবূ বকর যার তত্ত্বাবধায়ক নির্বাচিত হয়েছেন, এতে কোন প্রকার কম বেশী হবে!" এ মুহূর্তে হযরত আবূ বকর (রা)-এর মুখ দিয়ে আকস্মিকভাবে যে বাক্য বের হয়ে আসে ইতিহাস তা হুবহু সংরক্ষণ করেছে যার মাঝে তাঁর আন্তরিক জয্‌বা, দীনের সাথে গভীর সম্পর্ক ও তাঁর সিদ্দীক মর্যাদার অভিব্যক্তি ছিল। তিনি বলেন ঃ أينقص الدين وانا حي এও কি সম্ভব? আবূ বকরের জীবন থাকতে আল্লাহ্‌র দীনের এতটুকু ক্ষতি হবে? তিনি ফয়সালা করে নিয়েছিলেন, মুসলমানদের লাশের বিনিময়ে হলেও এ ফিৎনার দরজা চিরতরে বন্ধ করে দিতে হবে। সমগ্র মদীনা একদিকে আর হযরত আবূ বকর (রা) একা একদিকে। সাহাবাদের বললেন, "দীনের মাত্র একটি স্তম্ভকে অস্বীকারকারীর সাথে কাফির ও মুশরিকদের মত কিভাবে লড়াই করা বৈধ হবে?" কেউ বললেন, সারা আরব যেখানে এ ফিৎনায় জড়িত, তখন কার কার সাথে লড়াই করা যাবে? কিন্তু হযরত আবূ বকর (রা) বললেন, "খোদার কসম, যদি একটি ছাগল ছানাও যা রাসূল (সা)-এর যুগে যাকাত হিসাবে প্রদান করা হতো, তাও দিতে কেউ অস্বীকার করে, তবে তার সাথেও আমি জিহাদ করব।" অবশেষে হযরত আবূ বকর (রা)-এর ইয়াকীন সকল সংশয় ও সন্দেহের ওপর বিজয়ী ও প্রতিষ্ঠিত হলো। সকলেই তাঁর সাথে একমত হলেন। তিনি বিভিন্ন দিকে মোট এগারটি বাহিনী প্রেরণ করলেন। এর মাঝে তো তিনজন স্বতন্ত্র নবুওতের দাবীদারও ছিল। তাদের শায়েস্তা করা প্রয়োজন ছিল। এ ভণ্ড নবুওতের দাবীদারদের সঙ্গে আরবের ক্রীম শ্রেণীর অভিজ্ঞ যোদ্ধারাও ছিলেন যাঁরা পরবর্তীতে ইরাক ও ইরান বিজয়ের গৌরব অর্জন

করেছিলেন। এ সময় আরবের সমগ্র সামরিক শক্তি ও বীরত্ব ইসলামের মুকাবিলায় ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছিল, বরং একথা বলা যায়, এত বড় সামরিক শক্তি ইতোপূর্বে আর কখনও ইসলামের মুকাবিলায় আসেনি। এদিকে মদীনা শূন্য হয়ে গিয়েছিল। একথা প্রচারিত হয়ে গিয়েছিল, মদীনাতে লড়ার মত অল্প সংখ্যক মানুষই আছে। হযরত আবূ বকর (রা) মদীনায় হিজরতের জন্য হযরত আলী, তাল্‌হা, যুবায়র ও আবদুল্লাহ্ ইবন্ মাসউদ (রা)-কে নিয়োজিত করেন এবং মদীনাবাসীকে সার্বক্ষণিক মসজিদে নব্বীতে উপস্থিত থাকার নির্দেশ প্রদান করেন। কারণ জানা ছিল না, কখন শত্রুরা আক্রমণ করে। মাত্র তিন দিন অতিবাহিত না হতেই হঠাৎ শত্রুরা আক্রমণ করে বসে। পাহারারত সৈন্যদল আক্রমণকারীদের বাধা প্রদান করে এবং হযরত আবূ বকর (রা)-কে সংবাদ দেয়। হযরত আবূ বকর (রা) মসজিদে অবস্থানকারীদের অবগত করান এবং পেছন থেকে দুশমনদের তাড়া করে "যী'কাসা" পর্যন্ত পৌঁছে দেন।

ওখানে তারা মশকে হাওয়া ভর্তি করে দড়িতে বেঁধে রেখেছিল। ওগুলোকে তারা সজোরে যমীনের ওপর ছেঁচড়িয়ে টানতে থাকে যার ফলে মুসলমানদের উটসমূহ এমনভাবে ছুটে পালায় যে, মদীনাতে এসে নিঃশ্বাস ফেলে। মুরতাদরা মুসলমানদের দুর্বলতা অনুভব করতে পারে এবং তারা তাদের বড় কেন্দ্র 'যিলকা'সা'কে একথা অবহিত করে। এরপর সেখান থেকে নতুন যোদ্ধা দল আসে। হযরত আবূ বকর (রা) সারা রাত্রি জিহাদের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন এবং প্রভাতেই হঠাৎ করে শূন্য ময়দানে দুশমনদের ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং তাদেরকে তলোয়ারের মুখে নিক্ষেপ করেন। সূর্যোদয় হতে না হতেই শত্রু সেনাদের পরাজয় ঘটে। হযরত আবূ বকর (রা) তাদেরকে যিলকাসা পর্যন্ত পশ্চাদ্ধাবন করেন। এ বিজয়ের প্রেক্ষিতে মুরতাদদের ওপর সাংঘাতিক আঘাত লাগে। কিন্তু আবস ও যারয়ান গোত্রদ্বয় তাদের গোত্রের সকল মুসলমানকে বেছে বেছে হত্যা করে। এতে হযরত আবূ বকর (রা) কসম খেয়ে বললেন ঃ তিনি মুসলমানদের রক্তের পূর্ণ প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন এবং যে সংখ্যক মুসলমানকে তারা হত্যা করেছে তার চেয়েও বেশী মুশরিককে হত্যা করবেন। এরই মাঝে মদীনা শরীফে যাকাতের পশু পৌঁছে যায়। ঐদিকে হযরত উসামা (রা)-এর বাহিনী চল্লিশ দিন পর ফিরে আসে। হযরত আবূ বকর (রা) তাঁকে মদীনায় নিজের স্থলাভিষিক্ত করে তাঁর বাহিনীকে বিশ্রামের নির্দেশ দেন এবং নিজে সঙ্গীদের নিয়ে বের হন। মুসলমানরা তাঁকে আল্লাহ্‌র দোহাই দিয়ে মদীনায় অবস্থান করতে অনুরোধ জানায়। কিন্তু তিনি বললেন, "আমি মুসলমানদের সাথে পূর্ণ সমতার ব্যবহার করতে চাই। এরা এখন আরাম করবে আর আমি এখন জিহাদে যাব"।

তিনি মদীনা থেকে বের হন এবং অনেক দূর অবধি দুশমনদের পরাজিত করতে করতে অগ্রসর হন। অবশেষে সমগ্র আরবে মুসলমানদের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।

হযরত আবূ বকর (রা)-এর ইয়াকীন ও আবেগ মুসলমানদের মাঝে জিহাদের যে প্রেরণা ও আত্মোৎসর্গের জীবন স্পন্দন ফুঁকে দিয়েছিল তা পরিমাপ করার জন্য শত শত জিহাদের মাঝে মাত্র ইয়ামামার যুদ্ধের ঘটনাই যথেষ্ট। আসল কথা হলো, এই আবেগ-উচ্ছ্বাস ও জীবন স্পন্দন ছাড়া ইরতিদাদের (ধর্মত্যাগের) এই জগত জোড়া ফিৎনা এবং আরব গোত্রসমূহের বংশগত শৌর্য-বীর্য ও বেদুঈনসুলভ বীরত্বের মুকাবিলা করা (যা অল্প কিছু দিনের মধ্যে ইরান ও সিরিয়াকে পরাজিত করতে সক্ষম হয়েছিল) কোন প্রকারেই সম্ভব ছিল না। যদি গভীরভাবে লক্ষ্য করা যায়, তবে দেখা যাবে, এখানেও হযরত আবূ বকর (রা)-এর বিশ্বাসই ছিল ক্রিয়াশীল।

নজদের একটি অঞ্চলের নাম ইয়ামামা যা বনূ হানীফা গোত্রের কেন্দ্র ছিল, আর বনূ হানীফা ছিল রবী'আ গোত্রের একটি শাখা। এদের মধ্য থেকে মুসায়লামা নামে এক ব্যক্তি নবুওতের দাবী করে বসে। সে ধূর্ততা ও হিংসা-বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে কুরায়শদের নেতৃত্ব ও রাজনৈতিক প্রতিপত্তি খর্ব করার মানসে কিছু মানুষকে নিজের আয়ত্ত করে নেয়। হযরত আবূ বকর (রা) ভণ্ড নবী মুসায়লামাকে শায়েস্তা করার জন্য হযরত খালিদ ইবন ওয়ালীদ (রা) কে নিযুক্ত করেন এবং মুহাজির ও আনসারদের ভেতর থেকে প্রবীণ সাহাবীদের সমন্বয়ে একটি বড় কাফেলা হযরত খালিদ ইবন ওয়ালীদ (রা)-এর সাথে দিয়ে দেন। বনূ হানীফা ইয়ামামাতে শিবির স্থাপন করে অপেক্ষা করছিল। শিবিরে ছিল ৪০ হাজার যোদ্ধা। যুদ্ধ আরম্ভ হবার পূর্বক্ষণে বনূ হানীফার এক বক্তা জ্বালাময়ী বক্তৃতার মাধ্যমে যোদ্ধাদের মারতে ও মরতে উৎসাহিত করে।

মুহাজিরদের পতাকা আবূ হুযায়ফার গোলাম "সালেম"-এর হাতে ছিল। আর আনসারদের পতাকা ছিল ছাবেত ইবন্ কায়সের হাতে। সকলেই নিজ নিজ পতাকাতলে সমবেত ছিলেন। ইতোমধ্যেই জিহাদের দামামা বেজে ওঠে। আর তা এত তীব্র আকার ধারণ করে যে, এ সম্পর্কে লিখতে যেয়ে ঐতিহাসিক ইবনে আছীর বলেন, ইতোপূর্বে আর কখনও মুসলমানদের এমন লড়াইয়ের সম্মুখীন হতে হয়নি। মুসলমানরা পশ্চাৎপদ হতে উদ্যতপ্রায়। এমনি মুহূর্তে একে অপরকে চিৎকার করে বলতে লাগলো, আরে আরে, যাও কোথায়। আনসারদের পতাকাবাহী ছাবেত (রা) বললেন, হে মুসলমানেরা! পশ্চাৎপদ হয়ে তোমরা অন্যায়ের পথ প্রশস্ত করছ। হে আল্লাহ্! আমি বনূ হানীফার (মুরতাদদের) কার্যকলাপকে ঘৃণা করি এবং

মুসলমানদের কার্যকলাপের দরুন তোমার দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।" কথাটি বলে অগ্রসর হলেন এবং শাহাদত বরণ করলেন। হযরত ওমর-এর ভাই হযরত যায়দ (রা) মুসলমানদের আহ্বান করে বললেন, "তোমরা দৃষ্টি অবনত করে নাও, দাঁত কামড়ে ধরে দুশমনদের মাঝে ঢুকে পড় এবং হত্যা করতে করতে অগ্রসর হও।" হযরত হুযায়ফা (রা) বললেন, "হে কুরআনের বাহকগণ! আজ নিজেদের কৃতিত্ব দিয়ে কুরআন সজ্জিত কর।" হযরত খালিদ (রা) তীব্র বেগে হামলা চালিয়ে শত্রুকে অনেক পিছনে হটিয়ে দিলেন। লড়াই প্রচণ্ড রূপ ধারণ করেছিল। বনূ হানীফা তাদের এক এক গোত্রের নাম নিয়ে জোশ সৃষ্টি করছিল এবং বীর বিক্রমে লড়ছিল। লড়াইয়ের দৃশ্য ছিল এই যে, কখনও মুসলমানদের পাল্লা ভারী হচ্ছিল, আবার কখনও মুরতাদদের পাল্লা। এমনি মূহূর্তে আবূ হুযায়ফার ভৃত্য সালেম ও যায়দ (রা) ইবন খাত্তাব শাহাদাত বরণ করেন। হযরত খালিদ (রা) লড়াইয়ের এ চিত্র দেখে বললেন, হে লোকসকল! সকল গোত্র পৃথক পৃথক হয়ে লড়তে থাক যাতে প্রতিটি গোত্রের বীরত্ব ও আত্মত্যাগের পরিমাপ করা যায় এবং বোঝা যায়, আমাদের কোন্ বাহু দুর্বল, যার কারণে আমাদের ক্ষয়-ক্ষতির সম্মুখীন হতে হচ্ছে। অতঃপর প্রতি গোত্র পৃথক হয়ে লড়তে আরম্ভ করল তখন সকলে বলতে লাগল, এখন পলায়ন করতে লজ্জাবোধ হওয়া উচিত। এরপর যুদ্ধ আরও তীব্র রূপ পরিগ্রহ করল। বেশ কিছুক্ষণ রক্তক্ষয়ী লড়াই চলতে থাকে। একটু পরেই রণাঙ্গন লাশে ভরে যায়। আনসার আর মুহাজিররাই বেশীর ভাগ যুদ্ধে শহীদ হন। মুসায়লামা এক স্থানে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে ছিল এবং তাকে কেন্দ্র করেই লড়াই চলছিল। হযরত খালিদ (রা) অনুভব করলেন, যতক্ষণ মুসায়লামামা না যাবে ততক্ষণ বনূ হানীফার যুদ্ধ উন্মাদনা হ্রাস পাবে না। হযরত খালিদ (রা) অগ্রসর হলেন এবং يا محمداه (সে সময়কাররন হুংকার) বলে তাকে নিজের মুকাবিলায় অবতীর্ণ হতে আহ্বান জানালেন। কিন্তু সে তা মঞ্জুর না করায় খালিদ তীব্র আক্রমণ চালালেন। মুসায়লামা পশ্চাৎপসরণ করল। তার আশেপাশে যারা ছিল, তারাও পিছু হটতে বাধ্য হলো। মুসলমানরা খালিদের আহ্বানে চতুর্দিক থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ল। বনূ হানীফা পশ্চাৎপসরণ করল। তারা মুসায়লামাকে বলতে লাগল ঃ তুমি আমাদের সাথে যে সকল ওয়াদা করতে আজ তা কোথায়? মুসায়লামা বললঃ এখন নিজ নিজ বংশ ও গোত্রের পক্ষে লড়াই কর। এই মুহূর্তে বনু হানীফার দলপতি মাহকুম স্বীয় গোত্রকে আহ্বান করল এবং পার্শ্ববর্তী বাগানে আশ্রয় গ্রহণ করল। বনু হানীফা চর্তুদিক থেকে বাগানে এসে একত্র হলো এবং দরজা বন্ধ করে দিল। হযরত বারা ইবন্ মালিক (রা) বললেন ঃ হে মুসলমানেরা! আমাকে উঠিয়ে বাগানের ভেতর নিক্ষেপ কর। লোকে বলল ঃ এমনটি হতেই পারে না। তিনি শপথ করে বললেন ঃ আমাকে তোমরা বাগানের ভেতর নিক্ষেপ করেই দেখ না! অতঃপর লোকে তাঁকে

কোন প্রকারে ওপরে ওঠালে তিনি দেওয়াল টপকে ভেতরে লাফিয়ে পড়লেন এবং দরজা খুলে দিলেন। মুসলমানরা সদলে বাগানে ঢুকে প্রচণ্ড লড়াইয়ের লিপ্ত হয়। দুই পক্ষের জ. মালের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হলো। অপর পক্ষে আনসারদের পতাকাবাহী ছাবেত ইবন্ কায়স (রা) শহীদ হলেন। এক ব্যক্তির তলোয়ারে তাঁর পা কেটে যায়। তিনি সেই কর্তিত পা দিয়ে এমনভাবে ঐ ব্যক্তির মুখে আঘাত করলেন যে, সে তাতেই মারা যায়।

হযরত হামযা (রা)-এর হত্যাকারী হযরত "ওয়াহ্শী" স্বীয় গুনাহের কাফ্ফারা আদায়ের সুযোগ সন্ধান করছিলেন। তিনি মুসায়লামার প্রতি বর্শা নিক্ষেপ করতেই তা লক্ষ্যবস্তুতে যেয়ে বিদ্ধ হয়। এরপর এক আনসারী অগ্রসর হয়ে মুসায়লামাকে আঘাত করলেন। মুসায়লামার হত্যার সাথে সাথে বনূ হানীফা ভেঙে পড়ল। মুসলমানরা তখন তাদেরকে কচুকাটা করতে থাকে। এতে তাদের অধিকাংশই মারা পড়ে। মুসলমানদের ভেতর তিন শত ষাটজন আনসার সাহাবী শহীদ হন। অসংখ্য কুরআনের হাফেজ এই জিহাদে শাহাদত বরণ করেন এবং নিজেদের ইলম ও আমলের হক আদায় করেন।

বনূ হানীফার মুজায়া নামক এক দলপতি ভুল বুঝিয়ে ও ধোঁকা দিয়ে হযরত খালিদের সাথে সন্ধি স্থাপন করে গোত্রের লোকদের জান বাঁচাতে সক্ষম হয়। দরবারে খিলাফত থেকে নির্দেশ আসে, বনূ হানীফার কোন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ যেন জীবিত না থাকে। কিন্তু হযরত খালিদ (রা) সন্ধির পূর্ণ মর্যাদা রক্ষা করেন এবং দরবারে খিলাফতে এ মর্মে খবর প্রেরণ করেন যে, সন্ধি হয়ে গেছে বিধায় এর অন্যথা করা সম্ভব হলো না। হযরত ওমর (রা) এ সময় তাঁর ছেলে আবদুল্লাহকে বলেছিলেন, "তোমার চাচা শাহাদত বরণ করেছেন আর তুমি জীবিত ফিরে এসেছ? আমি তোমার মুখ দেখতে চাই না।" হযরত আবদুল্লাহ্ বললেন ঃ আমি কি করব? আমরা উভয়েই শাহাদত কামনা করেছিলাম। কিন্তু তাঁর মনস্কামনা পূর্ণ হয়েছে, আর আমার আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণই রয়ে গেল।

মুসায়লামা কায্যাব, আসওয়াদ আনাসী, তুলায়হ প্রমুখ নবুওতের মিথ্যা দাবীদাররা একের পর এক নিহত ও পরাজিত হলো। সমগ্র আরব জাহান মুরতাদ ও তাদের হত্যা ধ্বংসযজ্ঞ থেকে মুক্ত হয়ে গেল। হযরত আবূ বকর ও তাঁর সেনাপতিবৃন্দ অলিগলি ও প্রতিটি গোত্রকে মুরতাদমুক্ত করেন; সেই সাথে মুরতাদদের ঘোষণা করতে বলেন, "আমরা কাফের ছিলাম, আমাদের মৃত ব্যক্তিরা জাহান্নামী আর তোমাদের মৃতরা শহীদ। লড়াইয়ের ময়দানে যা কিছু মুসলমানদের হস্তগত হয়েছে তা সবই গনীমতের মাল। আমাদের হাতে যারা শহীদ হয়েছে আমরা তাদের দিয়্যাৎ প্রদান করব। আর যা কিছু মুরতাদদের হস্তগত হয়েছে, তা

মুসলমানদেরকে ফেরৎ দেওয়া হবে। আর যারা আজও মুরতাদ অবস্থায় আছে তারা আরব ভূমি ত্যাগ করবে এবং যেখানে খুশী সেখানে চলে যাবে।"

ধর্মত্যাগীদের এ ফেৎনার মুকাবিলা হযরত আবূ বকর (রা)-এর এমন এক অতুলনীয় কৃতিত্ব, মানবেতিহাস যার উদাহরণ পেশ করতে অক্ষম। তিনি নবী (সা)-এর প্রতিনিধিত্বের হক আদায় করে দিয়েছেন। আজ দুনিয়ার বুকে যে ইসলাম সংরক্ষিত আছে এবং শরী'আত যে অক্ষয় অবস্থায় আমাদের সম্মুখে বিদ্যমান এসব কিছু নবী করীম (সা)-এর পর হযরত আবূ বকর (রা)-এর অবিচলতা, সুউচ্চ সৎ সাহস ও সর্বাত্মক প্রচেষ্টারই ফল। আজ ধরাপৃষ্ঠে যেখানেই ইসলামের কোন নিদর্শন সমুন্নত হয়ে আছে এবং দীনের ওপর যা কিছু আমল করা হচ্ছে, এর সব কিছুতেই হযরত আবূ বকরের অংশ রয়েছে। আজ নামাযের প্রতিটি রাকাতে, যাকাতের প্রতিটি পয়সায়, রোযার প্রতিটি মিনিটে ও হজ্জের প্রতিটি আরকানে হযরত আবূ বকর-এর অধিকার প্রতিষ্ঠিত আছে। কারণ যাকাতের ব্যাপারে যদি তিনি কোন প্রকার শিথিলতা প্রদর্শন করতেন এবং ইরতিদাদের ফিৎনার মুকাবিলা করার ব্যপারে কোন প্রকার দুর্বলতার পরিচয় দিতেন, তবে অজানা থাকত নামায, না থাকত যাকাত আর না থাকত রোযা ও হজ্জ। যতদিন ইসলাম দুনিয়াতে জীবিত থাকবে (দু'আ করি, আল্লাহ্ একে কিয়ামত পর্যন্ত জীবিত রাখুন) সমগ্র উম্মতের আমলের সমপরিমাণ বিনিময় হযরত আবূ বকর (রা) পেতে থাকবেন। আল্লাহ্ হযরত আবূ বকর (রা)-এর ওপর চিররাযী হোন।

হযরত আবূ বকর (রা)-এর সৎ সাহস ও পাহাড়সদৃশ অবিচলতা রাসূল (সা)-এর সীনা তথা ঈমান ও ইয়াকীনের কেন্দ্র থেকে পেয়েছিলেন যার ভিত্তিতেই তাঁকে সত্যবাদীশ্রেষ্ঠ বলা হতো। এজন্যই তিনি ইসলামের পতাকাকে সংরক্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। হযরত আবদুল্লাহ্ বিন্ মাসউদ (রা) বলেন, "রাসূল (সা)-এর পর আমরা এমন এক পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলাম যে, সে সময় আল্লাহ্ পাক যদি আবূ বকরকে দাঁড় না করাতেন তবে আমাদের ধ্বংসের আর কিছুই বাকী ছিল না। আমরা সব এর ওপর একমত হয়ে গিয়েছিলাম যে, উটের বাচ্চার (যাকাতের জন্তু) ব্যাপারে আমরা কারো সাথে আমৃত্যু লড়াই করব না। আর মদীনাতে যতটুকু ইবাদত-বন্দেগী সম্ভব হয়, করতে থাকব। কিন্তু হযরত আবূ বকর (রা) এর বিরুদ্ধে বেঁকে বসলেন এবং মুরতাদদের অপমান, যিল্লতি ও তাদের ফিৎনার দরজা চিরতরে বন্ধ না করা পর্যন্ত তিনি সন্তুষ্ট হতে পারেন নি।" এখানে এই বিশ্বাস সম্পর্কে বিশেষভাবে একটি কথা মনে রাখতে হবে, যে বিশ্বাস স্বীয় প্রবৃত্তির অনুবর্তী হয়ে অথবা কোন মানবীয় শক্তি কিংবা বৈদেশিক সাহায্যের ভিত্তিতে হয়ে থাকে এবং এর উৎস যদি ঈমান ও আ'মালে সালেহা না হয় , আর না হয় আল্লাহ্র প্রতি পূর্ণ ভরসার ভিত্তিতে, বরং বস্তুগত উপায়-উপকরণ ও রাজনৈতিক

কলা-কৌশল ও কোন প্রকার জোড়াতালির ওপর হয়, তবে অনেক সময় তার পরিণতি হয় ভয়াবহ। ইতিহাস সাক্ষী, এই ধরনের বিশ্বাস দুনিয়াতে বড় বড় ধ্বংস ডেকে এনেছে। গোটা জাতি একটা মিথ্যা বিশ্বাস ও এক ব্যক্তির অন্যায় ও অযৌক্তিক জিদের কারণে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। যে বিশ্বাস ও ভরসার ওপর আল্লাহ্‌র সাহায্য এসে থাকে তার জন্য নিম্নে বর্ণিত বস্তুসমূহ আবশ্যক ঃ

১। একমাত্র আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা করতে হবে, বস্তুর ওপর কোন প্রকার যেন ভরসা না হয়।

২। নিয়মিত পরামর্শ ও কৌশল অবলম্বনে যেন কোন প্রকার ত্রুটি না হয়। অতঃপর ঈমানী দূরদর্শিতার মাধ্যমে যে ফয়সালা হবে তার ওপর অটলভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকতে হবে।

৩। সুদৃঢ় বিশ্বাসের অধিকারী ব্যক্তিকে ঈমান ইখলাছের রূপ ও গুণে গুণান্বিত হতে হবে। সাথে সাথে তাকে আল্লাহ্‌র বন্দেগীর প্রতি গভীর অনুরাগী হতে হবে।

৪। হক ও সত্যবাদিতার ওপর এর ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। আল্লাহ্‌র নিকট তার পেশকৃত দরখাস্ত যেন জাল ও দুর্বল না হয়। এ সকল গুণ অর্জিত হবার পরই আসবে ঐ পর্যায় যার কথা আল্লাহ্ পাক তাঁর বাণীতে উল্লেখ করেন ঃ

إِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ ـ
أَلَّا تَخَافُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَأَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِيْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ ـ

"নিশ্চয় যারা বলে, আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ্, অতঃপর তাতেই অবিচল থাকে, তাদের কাছে ফেরেশতা অবতীর্ণ হয় এবং বলে, তোমরা ভয় করো না, চিন্তা করো না এবং তোমাদের প্রতিশ্রুত জান্নাতের সুসংবাদ শোন।"

[সূরা হা-মীম সজদাহ ঃ ৩০]

আজ সমগ্র মুসলিম বিশ্বে যে সকল মুসীবত আসছে, ইসলামের ভিত্তি যেভাবে নড়বড়ে হয়ে গিয়েছে, মুসলমানদের মনোবলে যেভাবে ভাটা পড়েছে, তাদের মন-মানসিকতার ওপর যেভাবে বিষাদ নেমে এসেছে, তারা যেভাবে ইসলামের ভবিষ্যত সম্পর্কে নিরাশ হতে চলছে এবং যেভাবে হতাশা ও নিরাশাপূর্ণ বাক্য কলম ও মুখে উচ্চারণ করতে শুরু করেছে, এরূপ কঠিন মুহূর্তে এ ধরনের বিশ্বাসেরই সর্বাধিক প্রয়োজন যা পতনমুখী অন্তরসমূহকে সদৃঢ়ভাবে ধরে রাখবে। নিভু নিভু মানসিকতাকে ঈমানী উষ্ণতায় উষ্ণ করে তুলবে এবং ঘুমন্ত হিম্মৎকে করে তুলবে জাগ্রত। একটু গভীরভাবে চিন্তা করে দেখুন, ইরতিদাদের ফিৎনাকালীন পরিস্থিতি ও বর্তমান অবস্থার মাঝে কত পার্থক্য! রাসূল (সা)-এর বিয়োগব্যথা মুসলমানদের অর্ধমৃত ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় করে দিয়েছিল। প্রত্যেকেই সেই বিয়োগব্যথায় ছিল

বিহ্বল। সকলেই যখন নিজেকে ইয়াতীমের ন্যায় মনে করছিল, সেই প্রিয়তম ব্যক্তিত্ব যিনি আহত অন্তরে প্রলেপ দানকারী ও মনের ব্যথা উপশমকারী ছিলেন এবং যাঁকে কাছে পেলে সকল ব্যথা ও সকল দুঃখ বিদূরিত হয়ে যেত, যাঁর পবিত্র অবয়ব দর্শনে কোমল হৃদয়বিশিষ্ট নারী তার বাপ, ভাই, স্বামী ও পুত্রের শাহাদাতের টাটকা ক্ষত থাকা সত্ত্বেও চিৎকার দিয়ে ওঠে ঃ আপনি বেঁচে থাকলে কোন বিপদই নেই, সব কিছুই তুচ্ছ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি তাদের মাঝ থেকে বিদায় গ্রহণ করেন। তাঁর বিদায়ের সাথে সাথেই চতুর্দিকে হতে ইসলামের ওপর আক্রমণ, শুরু হয়ে যায়। সেই সাথে সমগ্র আরব জাতি ইসলাম থেকে দূরে সরে যায় অথচ এরাই ছিল ইসলামের মূল ভিত্তি ও পুঁজি, যার ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল ইসলামের গগনচুম্বী সৌধ। যে ইসলাম আরবের প্রতিটি কোণে পৌঁছে গিয়েছিল তা আজ শুধু মক্কা, মদীনা ও তায়েফে এসে সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। ইসলামের মূলকেন্দ্র মদীনার ওপর নিবদ্ধ ছিল দুশমনদের সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি। সকাল সন্ধ্যায় ছিল আক্রমণের ভয়। ডানে বামে ইরানী ও রোমক শাহানশাহরা ছিল ওঁৎ পেতে। তাদের সঙ্গেও কিছু ছোট খাটো সংঘর্ষ শুরু হয়ে গিয়েছিল। কুরআন শরীফ মুসলমানদের বক্ষেই সংরক্ষিত ছিল। ত'র শিক্ষা তখনও ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়নি। অবস্থা এমনি ছিল যে, যেন ইসলামের সমস্ত পণ্যদ্রব্য এক জাহাজে আর তা আজ উথাল-পাতাল ঢেউপরিবেষ্টিত। কিন্তু আল্লাহ্ পাকের হাজার হাজার রহমত (রা) হযরত আবূ বকর ও তাঁর বিশ্বস্ত আত্মউৎসর্গকারী সংগীবর্গের ওপর বর্ষিত হোক! না তারা নিরাশ হয়ে পড়েছিলেন, না তাদের মনোবলে ভাটা পড়েছিল। তাঁরা একদিকে রাসূল (সা)-এর শেষ ইচ্ছাকে পূর্ণ করেছেন। অপরদিকে সমগ্র আরব উপদ্বীপে ছড়িয়ে পড়া ইরতিদাদের আগুন নিভিয়েছেন। অতঃপর এমন কঠিন মুহূর্তেই পৃথিবীর দুই পরাক্রমশালী সাম্রাজ্যের ওপর আক্রমণও করেন। ইসলামী সেনাবাহিনী মুরতাদদের সাথে লড়াই করে একটু বিশ্রামেরও সুযোগ পায়নি, এমনি মুহূর্তে ইরাক ও সিরিয়ার মত দুই শক্তির ওপর আক্রমণ করে বসেন, অথচ তাদের অস্ত্রশস্ত্র ও উপায়-উপকরণ ছিল পর্যাপ্ত পরিমাণ, যাদের সাম্রাজ্য ছিল বিশাল ও বিস্তীর্ণ। শুধু তাই নয়, যতক্ষণ না ইরাক থেকে নিয়ে হিন্দুস্তান পর্যন্ত এবং আরবের উত্তর সীমান্ত থেকে জিব্রাল্টার ও বসফোরাস প্রণালী পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ময়দান কণ্টকমুক্ত করতে সক্ষম হয়েছেন ততক্ষণ পর্যন্ত আরামের সাথে বসেন নি, এমন কি চীন ছাড়া এশিয়ার সকল সভ্য দেশ ও আফ্রিকার সকল জনপদ ও সভ্য অঞ্চল এবং ইউরোপের এক বিরাট অংশ মুসলমানদের অধীনে চলে আসে।

কিন্তু সে যুগের তুলনায় আজকের দুনিয়ার চিত্র কিছুটা ভিন্ন ধরনের। সে সময়ে মুসলমান মাত্র মক্কা, মদীনা ও তায়েফেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছিল। কিন্তু আজ দুনিয়ায় এমন কোন অংশ নেই যেখানে মুসলমান বসবাস করে না। সে সময়

মুসলমানদের সংখ্যা এক হাজারের বেশী ছিল না। কিন্তু আজ ১০০ কোটিরও বেশী। সে সময় মাত্র তিনটি শহর ছাড়া আর কোথাও মুসলমানরা ক্ষমতাসীন ছিল না। কিন্তু আজ পঁয়তাল্লিশটির (৪৫ টিরও বেশী দেশ বিদ্যমান) লক্ষ লক্ষ বর্গমাইল এলাকা মুসলমানদের করতলগত। ঐ সময় সহজে দু'বেলা খানা জুটত এমন মানুষের সংখ্যা ছিল অপ্রতুল। কিন্তু আজ কদাচিৎ এমন মানুষ পাওয়া যাবে যারা বুভুক্ষ হয়ে মৃত্যুবরণ করছে। সে সময় হাজার টাকার মালিকের সংখ্যা হাতে গুণে বলা যেত, কিন্তু আজ কোটিপতির সংখ্যা নির্ণয় করাও মুশকিল। আজ না কোন নৈরাশ্যের অবকাশ আছে, আর না হতাশার কোন কারণ আছে। প্রয়োজন শুধু আল্লাহ্‌র প্রকৃত বান্দা হওয়া এবং নিজকে ঈমানী শক্তি ও আমল দ্বারা সজ্জিত করা। যদি আমরা এমনটি করতে পারি তবে সকল সমস্যা ও সংশয় ঈমান উত্তপ্ততার সামনে অদৃশ্য হয়ে যাবে যেমন প্রভাতের কুয়াশা ও রাতের শিশির সূর্যের তীব্র প্রখরতায় অদৃশ্য হয়ে যায়।

وصلى الله تعلى على خير خلقه محمدواله وأصحابه اجمعين ـ

প্রবৃত্তি পূজা নাকি আল্লাহ্‌র দাসত্ব?

[১৯৫৪ ইং সনের ২৮ নভেম্বর রাতে আমীনুদ্দৌলা পার্কে অনুষ্ঠিত এক সমাবেশে ভাষণটি প্রদান করা হয়। বিপুল সংখ্যক অমুসলিমের উপস্থিতি ও অংশ গ্রহণসহ দশ-বার হাজার লোকের এক সমন্বিত সমাবেশে প্রদত্ত এই ভাষণটি ব্যাপক প্রভাব সৃষ্টি করে।]

সোজাসাপ্টা কথা

আমি আপনাদের সাথে এখন কিছু অন্তরের কথা বলতে চাই। এমনভাবে কথাগুলো বলতে চাই যে, যেন আপনাদের প্রত্যেকের সাথেই একাকী বসে কথাগুলো বলছি। বাস্তবেই যদি এটা সম্ভব হতো, আপনাদের মধ্য থেকে প্রত্যেক বন্ধুর সাথেই ভিন্ন ভিন্নভাবে যদি কথা বলতে সক্ষম হতাম, তাহলে অবশ্যই তা-ই করতাম যেন বক্তৃতা মনে না করে আমার কথাগুলো কোন একজন বন্ধুর হৃদয়ের ব্যথা মনে করে আপনারা শোনেন। কিন্তু আমি কী করতে পারি, এমনটি তো বাস্তবে সম্ভব নয়। যদি সম্ভব হতো, তাহলে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী অবশ্যই এর ওপর আমল করত। নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতা উপলক্ষে তারা কোন সভা অনুষ্ঠান করত না।

কারণ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বীদেরকে নির্বাচনী সভাগুলোতে সেই কথাগুলোই বলতে হয়, যে কথাগুলো কাউকে নিভৃতে নিয়ে গিয়ে বলাটাই বেশী উপযোগী অর্থাৎ নিজের গুণ-গান বর্ণনা করা, নিজের যোগ্যতার প্রচার করা এবং নিজের শানে নিজেই কাব্য রচনা করার কাজই তারা করে। তাই আমি আপনাদের কাছে এতটুকুই আবেদন করতে পারি, দয়া করে আমার নিবেদনগুলোকে আপনারা কোন মঞ্চের বক্তৃতা মনে না করে অন্তরের কথা মনে করে শুনবেন।

প্রবৃত্তি পূজা নাকি আল্লাহ্‌ প্রেম?

দুনিয়ায় জীবন যাপনের বহু পদ্ধতি ও ধারা চালু রয়েছে। মনে করা হয়ে থাকে, জীবনের বহু প্রকার রয়েছে। প্রাচ্যের জীবন, পাশ্চাত্যের জীবন, আধুনিক জীবনধারা, প্রাচীন জীবনধারা ইত্যাদি, ইত্যাদি। কিন্তু বাস্তবে জীবনের মৌলিক প্রকার মাত্র দুটি। একটি হলো রিপু ও প্রবৃত্তিপূজারী জীবন, অপরটি আল্লাহ্‌প্রেমী জীবন। অন্য যেসব প্রকার যেসব বিচিত্র নামে প্রসিদ্ধ, সেগুলোও এই মৌলিক দুই প্রকার জীবনেরই শাখা-প্রশাখা।

প্রথম প্রকার জীবনের বৈশিষ্ট্য হলো, মানুষ নিজেকে নিজে লাগামহীন উট মনে করে জীবন যাপন করে এবং মনে যা আসে তাই করে বসে। এই জীবনকে

মনচাহি জীবনও বলা যেতে পারে। দ্বিতীয় প্রকার জীবন হলো এমন ব্যক্তিদের জীবন, যারা বিশ্বাস রাখেন যে, তাঁদেরকে কেউ সৃষ্টি করেছে এবং সেই সৃষ্টিকর্তাই তাদের জীবনের মালিক ও শাসক। তিনিই তাঁর প্রয়োজন, সুবিধা ও উপযোগিতা সম্পর্কে সবচেয়ে বেশী অবগত। সেই সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে জীবন যাপনের এমন কিছু নিয়ম-নীতি ও ধারা রয়েছে যার অনুসরণ করা অপরিহার্য।

প্রবৃত্তিপূজার প্রাধান্য

হিন্দুস্থানে 'মহাভারত' নামে অনেক বড় একটি ঐতিহাসিক দ্বন্দ্ব হয়েছে। মহাভারতের ঐতিহাসিক বিবেচনা নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপনের কোন উদ্দেশ্য আমার নেই। কিন্তু এই পৃথিবীতে অন্য একটি মহাভারতের সন্ধান পাওয়া যায়। এটি হিন্দুস্তানের প্রসিদ্ধ মহাভারত থেকেও অধিক প্রাচীন। এটি সেই দ্বন্দ্ব, যা অল্লাহ্প্রেম ও প্রবৃত্তিপূজার মাঝে সর্বদাই বিরাজমান। এই দ্বন্দ্ব কোন একটি রাষ্ট্রেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং পৃথিবীর প্রতিটি রাষ্ট্রে এই দ্বন্দ্ব পৌঁছে গেছে। এই দ্বন্দ্ব শুধু যুদ্ধের ময়দানেই সীমিত নেই, বরং বাড়ী-ঘরেও এই দ্বন্দ্বের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। এটি মূলত জীবনের দু'টি ধারা, যা সর্বদা একে অপরের ওপর জয়ী হওয়ার চেষ্টা করে আসছে। আম্বিয়া পয়গাম্বরগণ নিজ নিজ সময়ে প্রতিটি স্থানে আল্লাহ্প্রেমী জীবনের দাওয়াত দিয়ে এসেছেন। তাঁদের সফলতার যুগে সেই প্রকার জীবনেরই প্রাবল্য ছিল। কিন্তু প্রবৃত্তিপূজা স্থায়ীভাবে কখনো বিলুপ্ত হয়নি। যখনই সুযোগ পেয়েছে, তখনই সে জীবনের ওপর আধিপত্য বিস্তার করেছে। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের যুগ হলো সেই যুগ, প্রবৃত্তিপূজা যেই যুগে সম্পূর্ণভাবে জীবনের ওপর চেপে বসে আছে। জীবনের প্রতিটি শাখা, প্রতিটি ময়দান তার গ্রাসে পরিণত হয়ে গেছে। বাড়ী-ঘরে প্রবৃত্তিপূজা, হাট-বাজারে প্রবৃত্তিপূজা, অফিস-আদালতে প্রবৃত্তিপূজা, কল-কারখানায় প্রবৃত্তিপূজা, যেন এটি এমন এক সমুদ্র যা গোটা স্থলভাগ প্লাবিত করে ফেলেছে এবং আমরা তাতে গলা পর্যন্ত ডুবে আছি।

প্রবৃত্তিপূজা স্বতন্ত্র একটি ধর্ম

প্রবৃত্তিপূজা বর্তমানে স্বতন্ত্র একটি ধর্মে পরিণত হয়ে গেছে। না, শুধু এতটুকুই নয়, বরং এর ধরনটা সব সময় এমনই হয়ে থাকে এবং এই ধর্মের অনুসারীর সংখ্যা থাকে সবচেয়ে বেশী। অন্য সকল ধর্মের তালিকায় এই নামের কোন ধর্মের উল্লেখ করা হয় না এবং এই নামের ধর্মের অনুসারীদের সংখ্যারও কোন গণনা করা হয় না। কিন্তু স্ব স্ব ক্ষেত্রে এটাই পূর্ণ বাস্তবতা যে, এই গুপ্ত ধর্মই পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ধর্ম। আর এই ধর্মের অনুসারীরাই বিদ্যমান সর্বাধিক সংখ্যক। আপনাদের সামনে বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীদের সংখ্যা-শুমারি এভাবে এসে থাকে যে, খ্রিস্ট ধর্মের অনুসারীদের সংখ্যা এত, ইসলামের অনুসারী এত এবং হিন্দু ধর্মের অনুসারী

এত। তবে এদের সকলের মধ্য থেকেই একটি বড় সংখ্যা সেই সব লোকের, যারা বলে থাকে, আমি ধর্মের পরিচয়ে খ্রিস্টান, হিন্দু অথবা মুসলমান। কিন্তু মূলত তারা সেই প্রবৃত্তিপূজারী ও আত্মপূজার ধর্মেরই অনুসারী।

প্রবৃত্তিপূজা ও আত্মপূজার জীবনের প্রচলন ও এর গ্রহণযোগ্যতা শুধু এ কারণেই যে, এতে মানুষ মজা বেশী পায়। মানলাম, প্রবৃত্তিপূজার জীবন বড়ই মজার ও সুখের জীবন এবং প্রত্যেক মানুষের স্বভাবজাত চাহিদাও থাকে সুখ উপভোগ করা, কিন্তু যদি পৃথিবীর সকল মানুষকে সামনে নিয়ে ভেবে দেখা হয়, তাহলে এ ধরনের জীবন পৃথিবীর জন্য একটি অভিশাপ বৈ অন্য কিছু নয়। পৃথিবীর সকল যন্ত্রণা, সকল দুঃখ এই প্রবৃত্তিপূজারই ফল। পৃথিবীর সমস্ত ধ্বংস, সমস্ত সংকট, সমস্ত অনাচারের দায় সেই সব লোকের ওপরই বর্তায়, যারা এই অপয়া ধর্মের অনুসারী।

এই পৃথিবীতে প্রবৃত্তিপূজার এই ধর্মের অবকাশ কেবল সেই অবস্থাতেই ঘটতে পারে, যখন গোটা পৃথিবীতে শুধু একজন মানুষেরই অস্তিত্ব থাকে। শুধু সেই অবস্থাতেই সে নিজের মনের বাসনাকে যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে পূরণ করার অধিকার অর্জন করে। কিন্তু বাস্তবতা তো এমন নয়। এই পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা এখানে কোটি কোটি মানুষের বসতি বানিয়েছেন এবং তাদের সকলের সাথেই মনের চাহিদা ও মনের প্রয়োজনীয়তা জড়িয়ে রয়েছে। এমন অবস্থায় যে ব্যক্তি-ই মানচাহি জীবন অতিবাহিত করার চেষ্টা করে, সে এই বাস্তবতা থেকে যেন চোখ বন্ধ করে রাখে যে, তার সাথে তারই সমজাতীয় আরো অনেকেই রয়েছে! কিন্তু বাস্তবতা থেকে চোখ বন্ধ করে রাখলে বাস্তব বিষয়টি তো আর ভুল প্রমাণিত হয়ে যায় না, বাস্তবতা তার আপন জায়গাতেই টিকে থাকে। এ কারণেই কিছু লোকের প্রবৃত্তি ও আত্মপূজার ফলাফল অবশ্যই অপরের জন্য দুর্ভোগ ও যন্ত্রণা বয়ে নিয়ে আসে।

প্রবৃত্তিপূজারী মনের রাজা

প্রবৃত্তিপূজার জীবন যাপনকারী হয়ে থাকে মনের রাজা। মনের রাজা তো ঐ রাজা, গোটা জগত জুড়ে প্রবৃত্তির দৌরাত্ম্য চললেও যার মোটেও পেট ভরে না। সে তার চেয়েও আরো অধিক সম্পদের লোভ করে থাকে।

ভেবে দেখুন, যখন এই সমগ্র জগতও একজন মাত্র মনের রাজার আত্মায় প্রশান্তি আনতে যথেষ্ট হয়নি, তখন এক এক বাড়ীর সীমিত পৃথিবীতে যে একাধিক মনের রাজা বিদ্যমান, তারা কি করে প্রশান্তি ও স্বস্তি পেতে পারে? আত্ম ও প্রবৃত্তিপূজার এই ব্যাধি প্রতিটি বাড়ীতে চার-চারটি মনের রাজা তৈরি করেছে। বাপ মনের রাজা, মা মনের রাণী; ছেলেও রাজা, মেয়েও রাণী। এ অবস্থায় কিভাবে বাড়ী-ঘরগুলাতে শান্তি-স্বস্তি থাকতে পারে? এই প্রবৃত্তিপূজার জীবন যাকে

প্রত্যেকেই অর্জন করতে চায়, একটি অগ্নিকুণ্ডে পরিণত হয়ে গেছে, যেখানে প্রতিটি বাড়ীর লোকজনও জ্বলছে, প্রতিটি রাষ্ট্রের নাগরিকরা পুড়ছে এবং পৃথিবীর গোটা মানব বসতি যে অগ্নিকুণ্ডে ঝলসে যাচ্ছে।

প্রবৃত্তিপূজার জীবন বিপদের উৎস

পৃথিবীর বিপদ ও সংকটের উৎস এটাই যে, প্রত্যেকেই নিজ নিজ রিপু ও প্রবৃত্তির অনুসরণ করতে চায়। এই বিপদ ও সংকটের সমাধান এটাই, মনের বক্তব্য গ্রহণ করার পরিবর্তে আল্লাহ্‌র অনুসরণ করুন। কোটি মানুষ তো দূরের কথা, এই পৃথিবী মাত্র দু'জন মানুষেরও মনচাহি জীবন যাপনের অবকাশ নিজের মধ্যে ধারণ করে না। এ কারণেই মনচাহি জীবন যাপনের ইচ্ছা ত্যাগ করুন এবং সেই ধারার জীবন যাপনের চেষ্টা করুন, যার পয়গাম আল্লাহ্‌র পয়গাম্বরগণ দিয়ে গেছেন অর্থাৎ আল্লাহ্‌র দাসত্ব ও আল্লাহ্‌প্রেমের জীবন। এই পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা প্রতি যুগে এই জীবনের আহ্বানকারী পয়গাম্বরগণকে পাঠিয়েছেন। কেননা এই জীবনধারা অবলম্বন করেই পৃথিবী চলতে পারে।

পয়গাম্বরগণ পূর্ণ সামর্থ্য ব্যয় করে এই জীবনধারার দাওয়াত দিয়েছেন এবং প্রবৃত্তিপূজার তীব্রতা ভেঙে চূর্ণ করতে সর্বাত্মক চেষ্টা-শক্তি ব্যয় করেছেন। কিন্তু যেমন শুরুতে আমি নিবেদন করেছি, তথাপি পৃথিবীতে আত্মপূজা ও প্রবৃত্তিপূজার প্রচলন বন্ধ হয়নি। যখনই আল্লাহ্‌র দাসত্বের আহ্বান শিথিল হয়েছে, তখনই প্রবৃত্তিপূজার প্রচলন বেড়ে গেছে। প্রবৃত্তিপূজার প্লাবন আসতে আসতেই পৃথিবীর সাধারণ লোকদের সমস্যা বেড়ে গেছে এবং অসহনীয় পর্যায় পর্যন্ত পৌছে গেছে। উদাহরণস্বরূপ খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর সময়কালটাকে দেখুন। এই শতাব্দীতে রিপু ও প্রবৃত্তিপূজার জীবনের প্রচলন শীর্ষ চূড়ায় পৌছে গিয়েছিল। দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল এরই প্রভাব। এ ছিল এক প্রবহমান নদী, যার স্রোতে ছোট-বড় সব কিছু ভেসে যাচ্ছিল। রাজা-বাদশাহ নিজ নিজ প্রবৃত্তির পূজায় লিপ্ত ছিল, প্রজা-সাধারণও রাজা-বাদশাহদের অনুকরণে পরিণত হয়েছিল অপ্রবৃত্তিপূজার শিকারে। উদাহরণস্বরূপ ইরানের অবস্থা বর্ণনা করছি।

ইরানী জাতির প্রতিটি শ্রেণী প্রবৃত্তিপূজার ব্যাধিতে আক্রান্ত ছিল। ইরানের বাদশাহ্‌র প্রবৃত্তিপূজার অবস্থা এমন ছিল যে, তার স্ত্রীর সংখ্যা ছিল বার হাজার। যখন মুসলমানগণ সেই দেশটিকে এমন বিপদ থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে আক্রমণ চালালেন এবং ইরানের বাদশাহ পালিয়ে গেল, সেই নাজুক মুহূর্তেও অবস্থা এমন ছিল যে, বাদশাহ্‌র সাথে ছিল এক হাজার বাবুর্চি, এক হাজার ছিল তার স্তুতিবাক্য পাঠকারী এবং আরো এক হাজার ছিল বাজ ও শিকারী পাখীর সংরক্ষক ও ব্যবস্থাপক। কিন্তু তারপরও বাদশাহর আক্ষেপ ছিল যে, সাংঘাতিক সহায়-সম্বলহীন

অবস্থায় তাকে বের হয়ে যেতে হয়েছে। সেই যুগের জেনারেল ও সেনাপতিরা লক্ষ টাকার টুপি ও লক্ষ টাকার মুকুট লাগাত। উঁচু সোসাইটিতে মামুলি ধরনের পোশাক পরা ছিল এক ধরনের অপরাধ। কিন্তু এই শ্রেণীর প্রবৃত্তিপূজা সাধারণ জনগণকে কেমন দুর্ভোগে ফেলেছিল, এ বিষয়টির অনুমান আপনি এই তথ্য থেকে করতে পারেন যে, কৃষকদের অবস্থা এমন করুণ হয়ে গিয়েছিল যে, তারা কর দিতে পারত না এবং ক্ষেত-খামার ত্যাগ করে খানকাহ আর ইবাদতখানায় এসে আশ্রয় নিত। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা আমীর-উমারাহদের প্রতিযোগিতার শিকারে পরিণত হয়ে দেউলিয়া হয়ে যেত। ফলে অর্থনৈতিক নৈরাজ্য ছিল সর্বপ্লাবী। মোটকথা জীবন সেখানে কী ছিল? একটি রেসের ময়দান ছিল। জুলুম ও সীমা লংঘন ব্যাপক ছিল। প্রত্যেক বড় তার ছোটকে এবং শাসক তার শাসিতকে লুণ্ঠন করা এবং তাদের রক্ত চোষার প্রচেষ্টায় লেগে ছিল। গোটা সোসাইটিতে একরাশ হতাশা ছড়িয়ে পড়েছিল। আপনারা বুঝতে পারছেন, এমন সোসাইটিতে নৈতিকতা, বিশ্বাস ও চরিত্র কিভাবে গড়ে উঠতে পারে এবং আখেরাতের ভাবনা ও নৈতিক দায়িত্বের ভাবনা কার থাকতে পারে? এই সমস্ত উন্নত বিষয়গুলোকে তো প্রবৃত্তিপূজার প্লাবনই ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু এমন কেউ ছিল না যে, এই প্লাবনের মুখে বাঁধ রচনা করবে এবং স্রোতকে রুখে দাঁড়াবে।

রাসূলুল্লাহ (সা.)-ই প্রবৃত্তিপূজার স্রোতকে ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন

কারো মাঝে সাহস ছিল না, স্রোতের বিরুদ্ধে কদম ফেলে দেখাবে। স্রোতটি কিসের ছিল? পানির স্রোত নয়, সাধারণ প্রচলনের স্রোত। সেই স্রোতের গতি ঘুরিয়েদেওয়ার সাহস করতে পারে একমাত্র কোন সিংহহৃদয় ব্যক্তি। আল্লাহ্‌র মঞ্জুর ছিল– ঐ স্রোতের গতি ঘুরে যাবে। এই কাজের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা আরবে একজন মানুষ সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁকে নবুওয়াত দান করেছেন যাঁকে আমরা মুহাম্মদ (সা.) নামে স্মরণ করি। তিনি প্রচলিত স্রোতের বিরুদ্ধে শুধু কদমই রাখেন নি, সেই স্রোতের গতিকে ঘুরিয়ে দেখিয়েছিলেন। সেই সময় এমন কোন লোক দিয়ে কাজ হতো না, যে স্রোতের গতি পাল্টে দিতে না পারলেও সেই স্রোতে প্রবহমান বস্তুকে উদ্ধার করতে পারে। কেননা তখন এমন কোন সংরক্ষিত ও নিরাপদ জায়গা ছিল না যেখানে সেই স্রোতের প্রবাহ বইছে না। ইবাদতখানা ও গীর্জাগুলোও এই প্লাবনের নিয়ন্ত্রণে চলে এসেছিল। এই সমুদ্রে কোথাও কোন আশ্রয়-দ্বীপ ছিল না। আর থাকলেও তা প্রতি মুহূর্তে ছিল খতরার মধ্যে। ঈমান, নৈতিক চরিত্র, ভদ্রতা, সংস্কৃতি ও অল্প কথায় মানবতার প্রাণকে সেই প্লাবন থেকে বাঁচানোর কাজ যদি কেউ করতে সক্ষম হতেন তাহলে কেবল সেই ব্যক্তি-ই সক্ষম হতেন যাঁর মাঝে স্রোতের গতি ঘুরিয়ে দেওয়ার সাহস রয়েছে। এমন ব্যক্তিত্ব তখন শুধু আল্লাহ্‌র সেই আখেরী পয়গাম্বরের ছিল, যিনি গণরেওয়াজের ঐ

স্রোতকে, যা এক ঝড়ের রূপে প্রবৃত্তিপূজার দিকে প্রবাহিত হচ্ছিল, মাত্র কয়েক বছরের প্রচেষ্টায় আল্লাহ্র দাসত্বের দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন। খ্রিস্টিয় ষষ্ঠ শতাব্দীর পৃথিবীর ইতিহাসে আমরা যে বিস্ময়কর বিপ্লবের চিত্র এক নিশ্বাসে দেখতে পাই, যা সমস্ত জীবন ও শেষ পর্যন্ত সমগ্র জগতকে প্রভাবিত করেছে এবং এখনও মানবতা ও আল্লাহ্র দাসত্বের যতটুকু পুঁজি অবশিষ্ট রয়েছে, এর সবই সেই মহান পয়গাম্বররের শ্রম ও মেহনতের সুষুমামণ্ডিত ফসল।

কবি বলেন,

দুনিয়ায় এখন যে বসন্ত পল্লবিত

তার সব চারা গাছ তাঁরই লাগানো ছিল।

অসম্ভব নয়, আপনাদের কারো এই সন্দেহ হতে পারে, এমন দাবী করা তো ঠিক নয় যে, সেই যুগে সাধারণভাবে মানুষ শুধুই প্রবৃত্তিপূজারী ছিল। কেননা অন্য কিছু কিছু বস্তুর পূজারীও সে যুগে ছিল। কিছু লোক সূর্য পূজা করত, কিছু লোক আগুন পূজা করত, কিছু লোক ক্রুসের পূজা করত, কিছু লোক গাছ পূজা করত এবং কিছু লোক করত পাথরের পূজা। এ বিষয়গুলো স্ব স্ব স্থানে সঠিক। কিন্তু এই সমস্ত পূজা সেই এক পূজারই বিভিন্ন প্রকার, যে পূজার গণপ্রচলনের কথা আমি দাবী করছি। এই সব পূজা এ কারণেই করা হতো যে, এগুলো প্রবৃত্তিপূজার পরিপন্থী ছিল না। এসব পূজা পূজারীর মনচাহি জীবন যাপনে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করত না। আগুন, মাটি, পাথর, সূর্য ইত্যাদি বস্তুগুলো তো পূজারীদের একথা বলত না, তোমরা এই কাজ করো এবং এই কাজ থেকে বিরত থাক। এজন্যই তারা এসব বস্তুর পূজার পাশাপাশি নিজের প্রবৃত্তির আনুগত্যও করত। এ দু'য়ের মাঝে তারা কোন সংঘাত দেখত না।

মোটকথা আমাদের পয়গাম্বর (সা.) এই স্রোতের সাথে লড়াই করার এবং এই স্রোতের গতিধারা পাল্টে দেওয়ার দায় নিজ দায়িত্বে গ্রহণ করলেন। আর এভাবে গোটা সোসাইটির সাথে দ্বন্দ্ব কিনে নিলেন, অথচ তিনি তাঁর এই সোসাইটিতে অত্যন্ত গ্রহণযোগ্য ও সকলের প্রিয়ভাজন ছিলেন। সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত– এই সম্মানজনক উপাধিতে তাঁকে ডাকা হতো। ব্যক্তিগত উন্নতি ও সম্মান লাভের বহু সুযোগ তাঁর ছিল। তাঁর প্রতি তাঁর গোত্রের এতই নির্ভরতা ও আস্থা ছিল যে, সম্মান ও উন্নতির এমন কোন উঁচু স্তর ছিল না, যা তাঁর অর্জন হতো না। কিন্তু এসব তখনই সম্ভব ছিল, যখন তিনি তাদের জীবনের গতিকে ভুল না বসতেন এবং তাদের জীবনের গতিকে অন্য একদিকে প্রবাহিত করার ইচ্ছা ও সংকল্প ব্যক্ত না করতেন। কিন্তু তাঁকে তো আল্লাহ পাক দাঁড় করিয়েছেনই এজন্য যে, প্লাবনের স্রোতে নিজেও যেন ভেসে না যান এবং অন্য কাউকেও ভেসে যেতে না দেন।

তাই সবার আগে তিনি নিজের জীবনকে আল্লাহ্‌র দাসত্বমুখী জীবনের নমুনা বানিয়ে পেশ করেছেন। অন্য কথায় বলা যায়, স্রোতের বিরুদ্ধে নিজে কদম ফেলে দেখিয়েছেন, তারপর সম্পূর্ণ সমাজের গতি প্রবৃত্তিপূজা থেকে সরিয়ে আল্লাহ্‌র দাসত্বের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা শুরু করেছেন।

আল্লাহ্‌র দাসত্ব জন্মানোর মৌলিক তিনটি বিষয়

এই চেষ্টা সফল করার লক্ষ্যে তিনি মৌলিক তিনটি বিষয় মানুষের সামনে পেশ করলেন। এক: এই বিশ্বাস করো, তোমাদের ও সমগ্র জগতের সৃষ্টিকর্তা আর এই জগতের ওপর কর্তৃত্ববান সত্তা এক। দুই: এই বিশ্বাস করো, এই জীবন শেষ হওয়ার পর অন্য একটি জীবন আছে। সেই জীবনে এই জীবনের হিসাব-নিকাশ হবে। তিন: এই বিশ্বাস করো, আমি আল্লাহ্‌র পাঠানো পয়গাম্বর। তিনি এই জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় বিধি-বিধান দিয়ে আমাকে পাঠিয়েছেন। এই বিধি-বিধান মেনে আমাকেও চলতে হবে, তোমাদেরও চলতে হবে। তিনি যখন এই সব ঘোষণা করলেন, তখন সমাজে হৈ চৈ পড়ে গেল। বিরুদ্ধবাদীরা উঠে দাঁড়াল। তারা উঠে দাঁড়াল এজন্য যে, এই স্লোগান তাদের জীবনযাত্রায় ব্যাঘাত সৃষ্টিকারী ছিল। সারা জীবনকাল যেই দিকে প্রবাহিত হচ্ছিল, তা ছেড়ে দিয়ে অন্যমুখী হওয়া ফলত কোন সহজ কাজ তো ছিল না। জীবনের ডিঙ্গি স্রোতের তালে তালে বয়ে যাচ্ছিল। কোন কষ্ট ছিল না। তাদের কী আর দায় পড়েছে যে, স্রোতের বিপরীতে ডিঙ্গি চালিয়ে নানা দুর্ভোগ ও শংকা তারা কিনে আনবে! এজন্য তারা চেয়েছে, এই আওয়াজ যেন থেকে যায়। কিছু কিছু লোক রসূলে কারীম (সা)-এর নিয়তের ওপরই সন্দেহ করে বসেছে। তাদের বুঝেই আসছিল না, তাদের মতই দেখতে একজন মানুষ এমন প্রত্যয়ী কি করে হতে পারে যে, জীবনের এই ঝড়ো স্রোতের গতি সে পাল্টে দেওয়ার চেষ্টা করছে। তারা ভেবেছে, এই স্রোতে তো শুধু আমরাই নই, গোটা দুনিয়ার সকল জাতি, সকল জাতির বিদ্বান ও প্রাজ্ঞশ্রেণী, নেতা ও সাধুমহল সবাই ভেসে চলেছে। এই স্রোতে ভেসে চলেছে শুকনা খড়কুটোর মত সকল জাতির ধর্ম ও সংস্কৃতির সরদারেরা, জাতিসমূহের বিশ্বাস ও নীতি-আদর্শ, তাদের প্রজ্ঞা ও দর্শন, সাহিত্য ও রাজনীতি। তারা এই দাবী ও দাওয়াতের ব্যাপারে কাউকে আন্তরিক মনে করার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অক্ষম ছিল। এ কারণে তারা ভেবেছে, এই ডালে জরুর 'কুছ কালা' রয়েছে। তারা ভেবেছে, হতে পারে এই অতি উচ্চ আহ্বানের পেছনে অন্য কোন উদ্দেশ্য ও অন্য কোন খাহেশ কাজ করছে। এজন্য তারা একটি প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে পাঠাল।

এই প্রতিনিধি দল তাদের নিজেদের ধ্যান-ধারণা অনুযায়ী তিনটি বড় জিনিস তাঁর সামনে উপস্থাপন করল। তারা বলল, এ ধরনের কথাবার্তা দিয়ে আপনার

উদ্দেশ্য যদি এটা হয়ে থাকে, আমরা যেন আপনাকে নিজেদের নেতা হিসাবে গ্রহণ করি, তাহলে এই কথাবার্তা ত্যাগ করুন। আপনার নেতা হওয়ার ইচ্ছা আমরা মঞ্জুর করে নিলাম। অথবা যদি অনেক ধন-সম্পদের প্রত্যাশী আপনি হন, তাহলে তা-ও আমরা গ্রহণ করতে প্রস্তুত কিংবা আপনি যদি কোন সুন্দরী নারীর প্রতি আগ্রহী হন, তাহলে আমরা সেই ইচ্ছাও পূরণ করব। আমরা দেশের সবচেয়ে সুন্দরী নারী আপনার সামনে পেশ করব। আপনি যেসব নতুন কথা ওঠাতে শুরু করেছেন, সে কথাগুলো শুধু বন্ধ করুন। কিন্তু আল্লাহ্‌র এই সাচ্চা রাসূল ও খোদায়ী দাসত্বের সর্বশ্রেষ্ঠ এই পতাকাবাহী চূড়ান্ত অমুখাপেক্ষিতার সাথে উত্তর দিলেন, আমি তোমাদের কাছ থেকে কিছু নিতে চাই না। আমি তো তোমাদের কিছু দিতে চাই। আমি যা দিতে চাই, সেগুলো হলো এই তিনটি কথা, যেগুলোর প্রতি আমি তোমাদের আহ্বান করছি। আমি চাই, মৃত্যু-পরবর্তী জীবনে তোমরা যেন শান্তি পাও! আর সেটা আমার এই তিন কথার ওপর নির্ভরশীল। তাঁর কথাই শুধু নয়, তাঁর গোটা জীবনই সেই লোকদের এ ধারণাকে ভিত্তিহীন প্রমাণিত করেছে যে, তিনি পৃথিবীর কোন বস্তুর প্রতি আগ্রহী ছিলেন না। শত্রুতা ও বিরোধিতা এমনই তীব্র রূপ ধারণ করেছিল যে, তাঁকে মক্কা ছেড়ে মদীনায় যেতে হয়েছিল। কিন্তু আল্লাহ্‌র দাসত্বের আহ্বান তিনি ছাড়েন নি।

প্রবৃত্তিহীনতা ও আল্লাহ্‌র দাসত্ব: আশ্চর্য উদাহরণ

বিরুদ্ধবাদীদের কোন ধারণাই ছিল না যে, প্রবৃত্তিপূজা থেকে তাঁর অবস্থান কত দূরে ছিল এবং প্রবৃত্তিপূজার এই স্রোতের বিপরীতে সাঁতরে যাওয়ার কী পরিমাণ শক্তি ও দৃঢ়তা তাঁর মাঝে ছিল। তিনি প্রবৃত্তিপূজা থেকে এতই দূরে ছিলেন যে, মক্কা ছেড়ে বাধ্য হয়ে চলে যাওয়ার কিছুদিন পর যখন আবারও মক্কায় বিজয়ী বেশে ফিরে এলেন, নিজের শত্রুদের পরাজিত করে এলেন, তখনও তাঁর আল্লাহ্‌র দাসত্বমূলক চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের সামান্যতম পরিবর্তন ঘটেনি। বিজয়ের সামান্যতম পরিমাণ উন্মাদনাও তাঁর ওপর চড়াও হতে পারেনি। বিজয়ী বেশে তাঁর মক্কা প্রবেশের ধরনটিও ছিল এমন যে, তিনি উটে সওয়ার হয়ে আসছিলেন, গায়ে ছিল গরীব মানুষের পোশাক এবং মুখে ছিল আল্লাহ্‌র শোক্‌র, নিজের অক্ষমতা ও বিনয়ের প্রকাশ। এই অবস্থায় মক্কার এক লোক তাঁর সামনে পড়ে গেল এবং ভয়ে কাঁদতে শুরু করল। তিনি বললেন, ভয় পেয়ো না। আমি কুরাইশ গোত্রের সেই গরীব মহিলার ছেলে, যে শুকনা গোশ্‌ত খেত। ভেবে দেখুন, কোনো বিজয়ী বীর এ ধরনের মুহূর্তে এমন কোন কথা বলতে পারে, যার ফলে লোকজনের মন থেকে তাঁর প্রতি ভীতি উঠে যায়! এ ধরনের মুহূর্তে চেষ্টা করা হয় যেন অধিক থেকে অধিকতর ভীতির সঞ্চার করা যায়।

আপনারা বর্তমানেও দেখতে পাচ্ছেন এবং অতীতের অবস্থাও ইতিহাসে পড়ে দেখতে পারেন, রাষ্ট্র ও ক্ষমতা যাদের হাতে এসে যায়, তাদের পরিবার-পরিজন তার দ্বারা কী পরিমাণ লাভবান হয়, কী পরিমাণ সুবিধা ভোগ করে এবং কত আরাম-আয়েশ ও বিনোদন তাদের সামনে লুটিয়ে পড়ে। কিন্তু আল্লাহ্র দাসত্বের এই ঝাণ্ডাবাহীর অবস্থা এক্ষেত্রেও প্রচলিত পৃথিবী থেকে ছিল ভিন্ন। তাঁর আদরের কন্যা নিজের ঘরে সব কাজ নিজ হাতে করতেন যার ফলে তাঁর হাতে কড়া পড়ে গিয়েছিল এবং শরীরে পানির মশক বহনের চিহ্ন পড়ে গিয়েছিল। একদিন তিনি শুনতে পেলেন, যুদ্ধের ময়দান থেকে কিছু দাস-দাসী আব্বাজানের খেদমতে হাজির করা হয়েছে। তিনি ভাবলেন, আমিও এক-আধটা দাস অথবা দাসী চেয়ে নিয়ে আসব। তিনি তাশরীফ নিয়ে গেলেন। নিজের দুর্ভোগের কথা ব্যক্ত করলেন। হাতে কড়া পড়ে যাওয়ার দাগ দেখালেন। হুযূর (সা) বললেন, আমি তোমাকে দাস-দাসীর চেয়েও উত্তম জিনিস দিচ্ছি। অন্য মুসলমানদের ভাগে দাস-দাসীকে যেতে দাও। ঘুমানোর সময় তেত্রিশবার সুবহানাল্লাহ্, তেত্রিশবার আলহামদুলিল্লাহ ও চৌত্রিশবার আল্লাহু আকবার পড়ে নিও।

প্রবৃত্তিহীনতা ও আল্লাহ্র দাসত্বের এ এক অদ্ভুত দৃষ্টান্ত, এ এক আশ্চর্য উদাহরণ!

নিঃসন্দেহে তিনি ছিলেন আল্লাহ্র উপসনাকারী ও আল্লাহ্র দাসত্বকারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি। এরপরও কি কেউ তাঁর প্রবৃত্তিহীনতার বিপক্ষে কোন প্রশ্নের অক্ষর ব্যয় করতে পারে! অপরের পক্ষে এই উদারতা ও বদান্যতাকে এবং নিজের ও নিজের সন্তানদের ক্ষেত্রে এই নিঃস্বতা ও দারিদ্র্যকে প্রাধান্য দেওয়া মূলত পয়গাম্বরেরই বৈশিষ্ট্য।

বর্তমানে আপনাদের মাঝে এমন লোক আছেন, যারা অতীত দিনে কয়েক দিন অথবা কয়েক বছর জেল খেটেছেন। আজ ক্ষমতা লাভের পর সুদসহ সেই সব কষ্টের হিসাব উঠিয়ে নিচ্ছেন। যখন কোন ব্যক্তির হাতে ক্ষমতা ও আইনের শক্তি এসে যায়, তখন সে নিজের স্বজন ও সন্তানদেরকে আইনের হাত থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করে থাকে। কিন্তু আল্লাহ্র দাসত্ববাদীদের মহান নেতার অবস্থা এক্ষেত্রেও ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। এক মহিলার চুরির অপরাধ প্রমাণিত হয়েছে। তিনি হাত কেটে ফেলার নির্দেশ দিয়েছেন। লোকজন রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর একজন নৈকট্যপ্রাপ্ত ও প্রিয় সাহাবীকে দিয়ে সুপারিশ করিয়েছে, মহিলাকে ক্ষমা করে দেওয়া হোক। সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর চেহারা ক্রোধে লাল হয়ে গেছে। তিনি বলেছেন, আল্লাহ্র কসম! যদি মুহাম্মদ (সা.)-এর কন্যা ফাতেমা দ্বারাও এমন অপরাধ ঘটে যায়, তাহলে মুহাম্মদ (সা) তার হাতও কেটে ফেলবে।

মুহাম্মদ (সা) তাঁর জীবনের শেষ হজ্ব পালনকালে মুসলমানদের বিশাল সমাবেশে কিছু আইন-কানুন ও বিধি-বিধানের ঘোষণা করেন। তখন সবার আগে নিজের আত্মীয়-স্বজন ও নিজের পরিবারের ওপর সেসব আইন-কানুন জারি করেন। তিনি 'আম মজমার মধ্যে ঘোষণা করেন, আজ থেকে জাহেলিয়াতের সকল রীতি-নীতি বিলুপ্ত করা হলো। সুদী লেনদেন আজ থেকে বন্ধ এবং সবার আগে আমি আমার চাচা আব্বাস (রা)-এর সুদী ঋণকে বাতিল ঘোষণা করছি। এখন থেকে তার সুদ কারো ওপর আবশ্যকীয় নয়। তিনি আর সুদের পয়সা কারো নিকট থেকে উসূল করতে পারবেন না।

এটাই ছিল আল্লাহ্র দাসত্ব। পক্ষান্তরে আজকের আইনপ্রণেতাগণ যদি এ ধরনের কোন আইন তৈরির জন্য প্রস্তুত হতেন, তাহলে আগেই নিজের আত্মীয়-স্বজন ও পরিচিত নিকটজনকে জানিয়ে দিতেন, অমুক আইন আসছে। তাড়াতাড়ি নিজের ভাবনাটা ভেবে নাও। জমিদারী বিলুপ্ত করার আইন পাশ হতে যাচ্ছে। যত তাড়াতাড়ি যমীন ছোটাতে পার, ছুটিয়ে নাও। বেচতে চাইলে বেচে দাও। এমনই মুহূর্তে তিনি ঘোষণা করেছেন, ইসলামপূর্ব জাহেলিয়াত যুগের সকল রক্তের দাবী বাতিল করা হলো। এখন আর সেই সময়ের কোন খুনের প্রতিশোধ গ্রহণ করা যাবে না। এই আইনের অধীনে আমি সবার আগে রবী'আ ইবনে হারিছের (আমার বংশের) রক্তের দাবী বাতিল ঘোষণা করছি।

আমাদের নবী (সা) উপমাহীন এই আল্লাহ্র দাসত্ব নিয়ে, যার কয়েকটি মাত্র উদাহরণ আমি দিয়েছি, প্রবৃত্তিপূজার প্লাবনের সাথে লড়াই করেছিলেন। তাঁর লড়াই ছিল সেই প্লাবনের বিরুদ্ধে, যে প্লাবন সকল জাতিকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। অবশেষে তিনি সেই প্লাবনকে রুখে দাঁড়াতে সমর্থ হন। লোকজন বাধ্য হয়ে তাঁর কথায় কান পাতে এবং তাঁর পয়গাম মেনে নেয়।

বিস্ময়কর বিপ্লব

এভাবে যেসব ব্যক্তি নবীজীর এই তিনটি মৌলিক বিষয়কে যথার্থভাবে গ্রহণ করে নিয়েছে, যা আল্লাহ্র দাসত্বমুখী জীবনের মূল ভিত্তি, সে সব লক্ষ-কোটি মানুষের জীবনের গতি এমনভাবেই বদলে গেছে যে, বর্তমান পৃথিবীতে বিশ্বাস করাই দুরূহ হয়ে পড়ে, এমনও মানুষ হতে পারে! আমি উদাহরণস্বরূপ তাঁদের মধ্য থেকে কয়েকজনের আলোচনা করব।

নবীজীর দাওয়াত গ্রহণকারীদের মধ্য থেকে একজন ছিলেন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা), যিনি নবীজী (সা)-এর ওফাতের পর তাঁর প্রথম স্থলাভিষিক্ত। ইসলামী রাষ্ট্রের অবস্থা এমন ছিল যে, তিনি ইসলামী রাষ্ট্রের সবচেয়ে উঁচু পদের অধিকারী হলেও জীবন এমনভাবে কাটাতেন যে, তার ফলে তাঁর পরিবারের

লোকেরা কিছু মিষ্টি খেতে চায়। তিনি উত্তরে বললেন, রাষ্ট্রীয় কোষাগার তো আমাদের মুখ মিষ্টি করার দায়িত্ব বহন করে না। কিন্তু ভাতা হিসাবে সেখান থেকে যা কিছু আমরা পাই, যদি তা থেকে কিছু বাঁচাতে পার, বাঁচিয়ে নাও এবং কোন মিষ্টি জিনিস রান্না করো। স্বামীর কথামতো হযরত আবূ বকর (রা)-এর স্ত্রী প্রতিদিনকার খরচ থেকে অল্প অল্প পয়সা জমিয়ে একদিন হযরত আবূ বকর (রা)-এর হাতে তুলে দিলেন যেন তিনি মিষ্টি রান্না করার জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনে এনে দেন। তিনি সেই পয়সা নিয়ে রাষ্ট্রীয় কোষাগারের দায়িত্বশীলের কাছে চলে গেলেন এবং সেই পয়সা রাষ্ট্রীয় কোষাগারে ফেরত দিয়ে দিলেন এবং বললেন, এগুলো রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে ভাতা হিসাবে আমি যা পাই, তা থেকেই বাঁচানো পয়সা। এতে বোঝা যায়, আমাদের প্রয়োজন এই পরিমাণ অর্থ ছাড়াও মিটে যায়, তাই এখন থেকে এই পরিমাণ অর্থ কমিয়ে আমার ভাতা দেবেন।

দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর ফারূক (রা)-এর খেলাফতের যুগে যখন মুসলমানগণ বায়তুল মুকাদ্দাস বিজয় করলেন এবং হযরত ওমর (রা) সেখানে তাশরীফ নিয়ে গেলেন, তখন তাঁর সঙ্গে সঙ্গীরূপে একজন গোলাম ছিল। কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় এই শাসকের কাছে সওয়ারী ছিল শুধু একটি। সেই সওয়ারীতে কিছু পথ তিনি সওয়ার হয়ে যেতেন এবং কিছু পথ গোলামকে সওয়ার বানিয়ে তিনি পায়ে হেঁটে চলতেন। যে সময় তিনি বায়তুল মুকাদ্দাসে প্রবেশ করছিলেন, সে সময় গোলাম সওয়ারীর ওপর ছিল এবং তিনি পায়ে হেঁটে চলছিলেন। তাঁর পরিহিত কাপড়ে ছিল অনেক জোড়া-তালি। তাঁর যুগেই একবার দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল। তখন তিনি নিজের জন্য সেই খাবার খাওয়া জায়েয মনে করতেন না, দুর্ভিক্ষের কারণে প্রজা-সাধারণের পক্ষে যা সহজলভ্য ছিল না।

হযরত খালিদ (রা) যিনি মুসলিম সেনা বাহিনীর কমান্ডার-ইন-চীফ ছিলেন এবং স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে সম্মানসূচক খেতাব দিয়েছিলেন 'সায়ফুল্লাহ' বা 'আল্লাহ্র তরবারি'; তিনি এমনই প্রবৃত্তিমুক্ত ছিলেন এবং প্রবৃত্তিপূজা থেকে এ পরিমাণ স্বাধীন ছিলেন যে, একবার তাঁর একটি ত্রুটির কারণে এক রণাঙ্গনে তাঁর কাছে তৎকালীন খলীফা হযরত ওমর (রা)-এর পক্ষ থেকে তাঁর অপসারণের চিঠি পৌঁছলে তাঁর কপালে সামান্যতম ভাঁজও পড়ল না, বরং তিনি বললেন, যদি আমি এ মুহূর্ত পর্যন্ত ওমর (রা)-এর সন্তুষ্টি অর্জন কিংবা আমার সুনাম বৃদ্ধির জন্য যুদ্ধ করে থাকি, তাহলে এখন আর যুদ্ধ করতাম না। কিন্তু যেহেতু আমি আল্লাহ্র জন্য যুদ্ধ করে থাকি, তাই সেনাপতির পরিবর্তে একজন সাধারণ সিপাহীর ভূমিকা নিয়েই আমি যথারীতি যুদ্ধ করে যাব। পক্ষান্তরে এর বিপরীতে এ যুগের একটি তাজা দৃষ্টান্ত হলো, জেনারেল ম্যাক আর্থার। কোরিয়ায় যুদ্ধে লিপ্ত সৈন্যদের সেনাপতির

পদ থেকে তাকে প্রেসিডেন্ট অপসারণ করার পর সে ভীষণ ক্ষুব্ধ হলো এবং ট্রুম্যান কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লেগে গেল।

আল্লাহ্‌র দাসত্বমুখী সমাজ

এই কয়েকজন মানুষই শুধু নন, বরং তিনি পুরো জাতি ও সমাজকে এই নীতির ভিত্তিতেই শিক্ষা দিয়েছিলেন যে, সেটি আল্লাহ্‌র দাসত্বের পরিচায়ক একটি সমাজে পরিণত হয়ে যায়। তাঁর নীতি ছিল এই যে, যদি কেউ কোন পদ মর্যাদার প্রার্থী বা আগ্রহী হতেন, তিনি তাকে পদমর্যাদা দিতেন না। পক্ষান্তরে এমন সাজেতে পদমর্যাদার প্রার্থী সাজা, নিজের গুণ-গান বর্ণনা করা এবং ক্ষমতার জন্যে একে অন্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার কোন অবকাশই নিম্নোক্ত আয়াত জীবন্ত থাকে, তাদেরকে কি ঠুনকো অহংবোধ ও কোন ধরনের বিপর্যয় ভাবনা স্পর্শ করতে পারে?

تِلْكَ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَايُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِى الْاَرْضِ وَلَافَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ـ

"সেই আখেরাতের আবাস আমি এমন লোকদের জন্যই নির্ধারিত করে দেব, যারা পৃথিবীতে কোন উচ্চতা চায় না এবং বিপর্যয় ছড়িয়ে দিতে চায় না। আর শেষ পরিণতি আল্লাহভীরুদের জন্য।" [সূরা কাসাস ঃ ৮৩]

এই আয়াতকে সামনে নিয়ে কোন ফেৎনা-ফাসাদ ও দ্বন্দ্বের অপরাধে অপরাধী হওয়া কি তাঁদের পক্ষে সম্ভব ছিল?

এটিই ছিল আল্লাহ্‌র দাসত্বের আহ্বান যা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) দুনিয়ার সামনে পেশ করেছিলেন এবং পরিণতির দিক থেকে এটিই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কল্যাণকর প্রয়াস হিসাবে প্রমাণিত হয়েছে। কোন ব্যক্তি পৃথিবীর অন্য কোন দাওয়াত ও মিশনের নাম ধরে এ কথা বলতে পারবে না যে, তা পৃথিবীকে এ পরিমাণ কল্যাণ উপহার দিয়েছে, অথচ এই দাওয়াত ও মিশনের পক্ষে মানুষের এ পরিমাণ প্রচেষ্টা ও এ পরিমাণ উপায়-উপকরণের প্রয়োগ হয়নি, যে পরিমাণ প্রয়োগ ঘটছে আধুনিক যুগের কোন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিপ্লবের পক্ষে। কিন্তু তারপরও এই সকল বিপ্লব ও আন্দোলনের সম্মিলিত উপকারও সেই একটি মাত্র দাওয়াতের উপকার ও কল্যাণের এক-দশমাংশও হতে পারবে না। এই পৃথিবী সেই দাওয়াতকে গ্রহণ করে নিলে আজও দুনিয়া থেকে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সকল অবিচার ও নৈতিক ত্রুটি বিদায় নেবে।

কিন্তু অন্যদের সম্পর্কে কি বলব, যখন স্বয়ং এই মিশনের ঝাণ্ডাবাহীরাই বর্তমানে প্রবৃত্তিপূজায় লিপ্ত হয়ে গেছে! প্রবৃত্তিপূজা তো আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে চুপ করে বসে ছিল না। সুযোগ পেয়েই সে আল্লাহ্‌র দাসত্বের ঝাণ্ডাবাহীদের ওপর এক চোট

প্রতিশোধ আদায় করে নিয়েছে। যে মুসলমানগণ প্রবৃত্তিপূজাকে পরাজিত করে দিয়েছিল এবং যাদের বিশেষত্ব ছিল কুরআন মজীদের এই ঘোষণা—

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ـ

"তোমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি, মানব জাতির জন্য তোমাদেরকে বের করা হয়েছে। তোমারা মানুষকে কল্যাণের আদেশ দেবে এবং অকল্যাণ থেকে বিরত রাখবে।"

[সূরা আল-ইমরান ঃ১১০]

আফসোস! তারাই এখন প্রবৃত্তিপূজার অসহায় শিকারে পরিণত হয়েছে।

পৃথিবীর সেরা দুর্ভোগ প্রবৃত্তিপূজা

আজ পৃথিবীর সবচেয়ে বড় দুর্ভোগ হলো প্রবৃত্তিপূজা। পৃথিবীর বড় বড় লিডার ও শান্তির পতাকাবাহী ট্রুম্যান, চার্চিল, স্ট্যালিন সবচেয়ে বড় প্রবৃত্তিপূজারী। এরা নিজেদের প্রবৃত্তিপূজার মধ্য দিয়ে ও জাতীয় অহংবোধের মধ্য দিয়ে, যা প্রবৃত্তিপূজারই উন্নত ও বিকশিত রূপ, পৃথিবীকে ছাই বানিয়ে দেওয়ার জন্য সর্বক্ষণ প্রস্তুত। এটম বোমার চেয়েও বিপজ্জনক ও ভয়ংকর হলো প্রবৃত্তিপূজা, যা পৃথিবীকে ধ্বংস করে দিয়েছে। লোকজন ক্রুদ্ধ হয় এটম বোমার ওপর। তারা বলে থাকে, এটম বোমা কেয়ামত ঘটিয়ে দিতে পারে। আমি তো বলি, এটম বোমার অপরাধ কি? আসল অপরাধী তো এটম বোমার নির্মাতা। তার চেয়ে আগে অপরাধী হলো, সেই সব বিদ্যায়তন ও সেই সব সংস্কৃতি, যেগুলো এই বোমাকে অস্তিত্বে এনেছে। আর এসব কিছুরই মূল হলো প্রবৃত্তিপূজা যা এই সংস্কৃতির জন্ম দিয়েছে।

আমাদের দা'ওয়াত

আমাদের দা'ওয়াত ও আমাদের আন্দোলন শুধু এটাই এবং এই লক্ষ্যেই যে, প্রবৃত্তিপূজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হোক! আল্লাহ্র দাসত্বমুখী জীবনধারা ব্যাপক করা হোক! আমরা এই বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই আপনাদের মুখোমুখি হয়েছি। আমরা জাতির প্রতিটি শ্রেণীর মানুষকে আহ্বান করি এবং তাদের সামনে আল্লাহ্র দাসত্বের শ্রেষ্ঠতম ঝাণ্ডাবাহী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর শিক্ষা, তাঁর জীবনচরিত ও তাঁর সাথীবর্গের ঘটনাবলী উপস্থাপন করি, যাঁরা ছিলেন আল্লাহ্র দাসত্বের পথের সঠিক ও সত্য পথপ্রদর্শক। আমাদের বিশ্বাস অনুযায়ী তাঁদের দেখানো পথেই রয়েছে মানবতার মুক্তি এবং পৃথিবীর যাবতীয় দুর্ভোগের সমাধান। আমাদের কাজ ও বক্তব্য একটি উন্মুক্ত গ্রন্থ যার ইচ্ছা হয়, তিনি এই গ্রন্থ পাঠ করে দেখুন।

আলোর চূড়া

আজ থেকে ১৪০০ বছর আগের পৃথিবীর দিকে একটু লক্ষ্য করে দেখুন। উঁচু উঁচু আকাশচুম্বী বালাখানা আর খাজানা ভরা সোনারূপা ঝলমলে পোশাকের কথা ছেড়ে দিন। এতো মানুষের পুরাতন ছবির এলবামে অথবা যাদুঘরেও দেখা যায়। কিন্তু এদিকে একটু খেয়াল করে দেখুন, মানবতার কখনো উত্থান-প্রাণ জাগ্রত হতো কি? পশ্চিম থেকে পূর্বে, উত্তর হতে দক্ষিণে, মোটকথা সমগ্র দুনিয়ার প্রান্তে প্রান্তে ঘুরে দেখুন এবং শ্বাস বন্ধ করে ভাল করে কান পেতে শুনুন, তার শিরা সঞ্চালনের গতি অনুভব করা যায় কিনা অথবা তার হৃদয়ের স্পন্দন শোনা যায় কিনা?

জীবন সাগরে বড় বড় রাঘব বোয়াল ছোট ছোট চুনো পুঁটিকে শেষ করে দিত। মনুষ্য জংগলে মানুষ নামী ক্ষুধার্ত বাঘ-সিংহ ও শূকরগুলো নিরীহ ছাগল-ভেড়াগুলোকে চিড়ে ফেড়ে উদরে পূরত। পাপ-পুণ্যের ওপর, অসভ্যতা সভ্যতার ওপর, প্রবৃত্তি বুদ্ধিবৃত্তির ওপর এবং মানবীয় চাহিদা আত্মার চাহিদা ও আবেগ-অনুভূতির ওপর ছেয়ে গিয়েছিল। এ সত্ত্বেও এ বিশাল বিস্তৃত পৃথিবীর কোথাও এর বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ ছিল না। মানবতার প্রশস্ত পেশানিতে অস্থিরতা বা ক্রোধের কোন চাপ পরিলক্ষিত হতো না। গোটা পৃথিবী নীলামের এক বাজারে পরিণত হয়েছিল। রাজা-বাদশা, উযীর-নাযীর ধনী-গরীব সকলকেই এ বাজারের পণ্য-সামগ্রী হিসাবে দাম হাঁকা হচ্ছিল। সকলেই নগণ্য দামে বিক্রি হচ্ছিল। কেউ এমন ছিল না যার মানবিক মূল্য ক্রেতার ক্রয় ক্ষমতার উর্ধ্বে এবং সে দাঁড়িয়ে জোর গলায় এ আহ্বান দিতে পারে, এ বিশাল বিস্তৃত আকাশ আমার এক উল্লম্ফন-আস্ফালনের স্থানের জন্য যথেষ্ট নয়। এই সমগ্র পৃথিবী ও এই গোটা জীবন আমার উৎসাহদীপ্ত আবেগের তুলনায় অনেক সংকীর্ণ ও সংকুচিত। কারণ এক অন্তহীন জীবনের জন্য আমাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আমি এই নশ্বর ও এক সীমাবদ্ধ দুনিয়ার ক্ষুদ্রতম এক টুকরোর বিনিময়ে নিজের সত্তাকে কিভাবে বিক্রি করতে পারি?

বিভিন্ন দেশ-জাতি, নানা গোত্রীয় সম্প্রদায় ক্ষুদ্রতর পরিমণ্ডলে পরিবার ও গোষ্ঠীর মাঝে সীমাবদ্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং বিরাট বিরাট দৃঢ়চেতা ব্যক্তি যারা নিজেদেরকে মহত্ত্ব ও মহানুভবতা, আত্মত্যাগের আস্ফালন করত, অর্ধ হাতের ন্যায়

এই সংকীর্ণ কুটিরে থাকতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল। কেউই এর সংকীর্ণতার কাঠিন্য অনুভব করত না বা কেউ শ্বাসরুদ্ধ হতো না। কেউ এ থেকে বিশাল ও বিস্তৃত দুনিয়ায়, বরং তার চেয়েও বিস্তৃতির কথা চিন্তাও করত না। তারা জীবনের সকল ক্ষেত্রে কেবল নিজ স্বার্থ ও ধান্দাবাজির বেড়াজালে জড়িয়ে ছিল। তখন মানবতা ছিল যেন একটি প্রাণহীন লাশ যার মাঝে রূহের উত্তাপ, অন্তরের জ্বালা ও প্রেমের উষ্ণতা বলতে কিছুই ছিল না। মানবতার আবাসস্থানে গজিয়েছিল কাঁটাযুক্ত ঝাড়-জঙ্গল। চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছিল ঘন ঘন বন-বনানী যা ছিল হিংস্র হায়েনা ও বিষাক্ত কীট-পতঙ্গের রাজত্ব অথবা মানবতার এ আবাসভূমি ছিল যেন কাদা-পানির পচা নর্দমা যা ছিল রক্তচোষা বিষাক্ত জোঁকের আবাসভূমি। ভয়াবহ এ জঙ্গলে সব শ্রেণীর হিংস্র হায়েনা ও সব ধরনের শিকারী পাখি আর কাদা-পানির নর্দমাতে নানা রকমের খুনপিয়াসী জোঁক বিরাজ করত। কিন্তু মানুষের জন্য সৃষ্ট এ পৃথিবীতে কোন মানুষ পরিলক্ষিত হতো না। যাদেরকে মানুষ বলে মনে করা হতো, তারা পাহাড়ের গুহায় ও চূড়াতে কিংবা নিজদের খানকা-উপাসনালয়ের নির্জনতায় আত্মগোপন করে কেবল নিজদের কল্যাণ চিন্তায় মগ্ন ছিল অথবা মানব সমাজে থেকে ও মানব সমাজের প্রতি চোখ বন্ধ করে ফালসফা কিংবা দর্শনশাস্ত্রে আত্মভোলা ছিল বা কাব্য চর্চার মাধ্যমে আনন্দ ও তৃপ্তির সাগরে নিমজ্জিত ছিল। জীবনতরীর ভরাডুবি দেখেও কাউকে তীরে নেওয়ার সুযোগ কিংবা অবসর তাদের ছিল না।

হঠাৎ নিথর মৃতপ্রায় দেহে প্রাণের সঞ্চার হলো। তাজা খুন শরীরের শিরা-উপশিরায় তীব্র গতিতে প্রবাহিত হতে লাগল। দেহ-মন উদ্দামতা ও চঞ্চলতা শক্তি ফিরে পেয়ে কর্মতৎপর হয়ে পড়ল।

ফলে যে সকল পশু-পাখি তাকে মৃত মনে করে তার মৃতপ্রায় শীতল দেহে বাসা বেঁধেছিল তাদের দেহ হেলতে এবং তাদের বাসা দুলতে দেখল। ঐতিহাসিকগণ এ ঘটনাকে এভাবে বর্ণনা করেন যে, ইরানের বাদশাহ 'কিসরার' প্রাসাদের ইট-পাথর ছিটকে পড়ল এবং পারস্যের বাদশাহ কায়সারের অগ্নিশালা নিভে গেল। এ যুগের ইতিহাসবিদগণ এভাবে চিত্রাংকন করে মানব সভ্যতার সামনে তুলে ধরে। মানবতার এই অভ্যন্তরীণ আন্দোলনে তার দেহের ওপর তীব্র ঝটকা লাগল। তার অবশ অসাড় দেহে যত দুর্বল ও ভগ্ন কেল্লা ছিল তাতেও কম্পন সৃষ্টি হয়েছিল। মাকড়সার সকল জাল ও আবর্জনায় গড়া সকল বাসা চূর্ণবিচূর্ণ হতে দেখা গেল। ভূমিকম্পের তীব্র ঝাকুনিতে যদি লৌহ প্রাচীর ও ইস্পাতের তৈরী স্তম্ভ বসন্তের পাতার মত ঝরতে পারে, তাহলে পয়গম্বরের (সা) আগমনকালে কেনই বা কায়সার কিসরার মন গড়া নিযাম ও দর্শনে কম্পন সৃষ্টি হবে না?

জীবনের এ গরম খুন যা মানবতার মৃতপ্রায় শীতল দেহে প্রাণের সঞ্চার করল

বিশ্ব মানবতার মুক্তির দূত হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর আবির্ভাবের ঘটনা, যা সভ্য দুনিয়ার মিলন কেন্দ্র মক্কা মুকাররমাতে ঘটেছিল। তিনি দুনিয়াকে যে শিক্ষা ও পয়গাম দিয়েছিলেন, সে সারসংক্ষিপ্ত বক্তব্য জীবনের সকল ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করেছিল। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় এবং মানব জীবনের শিকড়সমূহ ও জীবনের সকল মিথ্যা রাজপ্রাসাদের ভিত্তি অতি ভীষণ প্রলয়ংকরভাবে আর কখনো প্রকম্পিত হয় নি যেমন লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ-এর ঘোষণায় আন্দোলিত হয়েছিল। আর গর্দভ মস্তিষ্কের ওপর এমন প্রচণ্ড আঘাত কখনো পড়েনি যেভাবে এ শব্দ দ্বারা আঘাত হানা হয়েছে। এতে সে ক্রোধে ফেটে পড়ে এবং তর্জন-গর্জন করে বলে ওঠে ঃ اجعل الا لهة الهاواحدا ان هذالشئ عجاب। যাদের আমরা ইবাদত করতাম এবং আমরা যাদের বান্দা তাদের সকলকে ছেড়ে দিয়ে এক মা'বুদই না কি সে নির্ধারণ করেছে? এত বড় আশ্চর্যের কথা! এ ধ্যান-ধারণার লোকেরা এ সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে, এটি আমাদের জীবন ধারণের রীতিনীতির বিরুদ্ধে একটি গভীর ও সাজানো চক্রান্ত। সুতরাং আমাদের সিদ্ধান্ত নেওয়া অতীব জরুরী ঃ

وانطلق الملأ منهم أن مشوا واصبرا على الهتكم إن هذا لشئ يراد -

তাদের নেতৃস্থানীয় ও দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ একে অপরকে কাছে গেল, চল, নিজেদের উপাস্যদের ওপর অবিচল থাক। এতো কোন পূর্ব পরিকল্পিত কাজ মনে হচ্ছে।

এই কালেমার স্লোগান ও ধ্বনি মানব জীবনের ও মানব সমাজের সকল ধ্যান-ধারণার ওপর এমন একটি আঘাত ছিল যা চিন্তা-চেতনার উৎস ও জীবন ধারণের উপায়-উপকরণকে প্রভাবান্বিত করেছিল। এ কালেমার অর্থ হলো- যেমন আজও তাই মানা হয়, এ সুন্দর সুরভী পল্লবী স্বেচ্ছায় গজিয়ে ওঠা জঙ্গল নয়, বরং রুচিশীল মালীর লাগানো সুন্দর পরিপাটী করা মনোহর বসুন্ধরা আর মানুষ এই গুলশানের সর্বোৎকৃষ্ট সুগন্ধ সুশোভিত ফুল। এ সদা হাস্যোজ্জ্বল, সজীব ও সেরা ফুল, যা হাজারও বসন্তের সৌন্দর্য ও মাধুর্য, উদ্দেশ্যহীন নয় যা হেলায় দলিত হতে থাকবে। মানুষের মানবিক রত্নের মূল্য তো বিধাতা ছাড়া অন্য কেউ দিতে পারে না। তার মাঝে যে সীমাহীন আগ্রহ, বুলন্দ হিম্মত ও ব্যথিত অন্তর আছে তা সারা দুনিয়া মিলেও শান্ত করতে পারবে না এবং দুনিয়ার এ ধীর গতিসম্পন্ন উপকরণসমূহ তার তীব্র গতির সাথে তাল মেলাতে অক্ষম, বরং তার জন্য এমন এক অনন্ত অসীম দুনিয়ার প্রয়োজন যার সামনে এ জীবন একটি ক্ষুদ্র চলতে অক্ষম কণা ও বিন্দু অথবা খেলনার বস্তু বলে বিবেচিত হবে। যেখানের আরাম-আয়েশ ও

দুঃখ-দুর্দশার তুলনায় এখানের আরাম-আয়েশ ও দুঃখ-কষ্ট তুলনাহীন। এজন্য মানুষের মানসিক চাহিদা হওয়া উচিত এক আল্লাহ্‌র ইবাদত, আত্মচেতনা, ও আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন করা এবং তার জীবনকে এ সকল কাজের জন্য সদা সচেষ্ট রাখা। মানুষকে কোন আত্মা, কোন গোপন শক্তির বা দ্বৈতশক্তি কোন গাছপালা, পাহাড়-পর্বত, কোন প্রকার ধাতব বস্তু ও জড় পদার্থ, ধন-দৌলত, সম্মান-আত্মমর্যাদা, শক্তি-সমৃদ্ধি, কোন ব্যক্তি ও কোন আধ্যাত্মিক শক্তির সামনে গোলাম ও দাস-দাসীর ন্যায় মাথানত তরুলতার মত পদদলিত হওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। সে তো চিরউন্নত সুমহান প্রভু আল্লাহু আকবারের সামনে নত করে এবং সকল হীন ও নিচুতার ঊর্ধ্বতর 'উন্নত মম শির' থাকবে। সে হবে সারা দুনিয়ার সকল সৃষ্টির মাথার মুকুট, নয়ন-মণি আর বিশ্ব ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সবাই হবে তার খাদেম এবং সে হবে এক মহান সত্তার গোলাম ও অনুগত বান্দা। তার সামনে ফিরিশতাদের সিজদা করিয়ে এবং তাকে এক আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য সকলকে সিজদায় অবনত হতে নিষেধ করে, এ কথা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছে যে, এই মায়াবী ধরায় ফিরিশতা নিয়ন্ত্রিত সকল শক্তি তার অধীনে এবং তার সামনে সদা অবনত। আর এর প্রতিদানে তার শির আল্লাহর সামনে অবনত এবং সে আল্লাহর সকল আদেশ-নিষেধের অনুগত।

মানুষের মস্তিষ্ক এত ভয়ানক বিকল ও পঙ্গু হয়ে পড়েছিল যে, সে দেহ-মন, অনুভূতি ও বস্তুবাদের আগে সহজে কোন কিছু চিন্তাই করতে পারত না। তার চিন্তা-চেতনা ভীষণভাবে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছিল। ফলে সে কোন মানুষ সম্পর্কে ধীর-স্থিরতার সাথে কোন গভীর ধারণা ও মহৎ আশা করতে পারত না। মানুষ নিজেরাই কিছু নীতিমালা নির্ধারণ করেছিল। ফলে প্রত্যেক নতুন ব্যক্তিকে ঐ নির্ধারিত কষ্টি পাথরে মেপে দেখত। জীবনের প্রতিটি মোড়ে যে সকল ক্ষুদ্র টিলা গড়ে উঠেছিল, হিমালয় সমতুল্য প্রত্যেক মানুষকে ঐ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টিলার সামনে এনে দেখত। আর এ কারণে তারা গভীর চিন্তাধারা ও অত্যন্ত তীক্ষ্ণতার সাথে এ সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছিল যে, রাসূলুল্লাহ (সা) সম্ভবত ধন-দৌলত, আরাম-আয়েশ অথবা রাজ্য বা রাজত্বের লোভী। বাস্তবও তাই ছিল। কারণ সে সময় পর্যন্ত এ ভূমণ্ডলে এ থেকে আর ভিন্ন কিছুই দেখা যায় নি। সত্য বলতে কি, সে যুগের দৃঢ় প্রত্যয় আকাশচুম্বী ঈগলদেরকে এ থেকে ঊর্ধ্বে কখনও উড়তে দেখা গিয়েছিল কি? তারা প্রিয় নবী (সা)-এর দরবারে একটি টিম পাঠিয়েছিল। মূলত তারা যা কিছু পেশ করেছিল তা সে যুগের চিন্তা-চেতনা ও মানসিকতার এবং সেকালের মানুষের অনুভূতির সঠিক ও স্বচ্ছ চিত্র ছিল। অন্যদিকে তিনি (সা) যে উত্তর দিয়েছিলেন, তা নবুওয়তের সঠিক অর্থ, দায়িত্ব-কর্তব্য মুসলিম উম্মতের বাস্তব রূপরেখা তুলে ধরেছিল। তিনি প্রমাণ করে দেখিয়েছিলেন, তিনি কোন কিছুরই আশাবাদী নন।

তিনি যে আদর্শ ও মতবাদের পতাকাবাহী, তা তাদের ঐ সকল উঁচু চূড়া থেকে আকাশ-পাতাল ব্যবধান সমতুল্য ঊর্ধ্বে। তিনি নিজের ভোগ-বিলাসের চিন্তা করেন নি, বরং বিশ্বমানবতার সকল মানুষের মুক্তি ও কল্যাণ কামনায় অধীর ছিলেন। তাঁর নিজের জন্য কোন কৃত্রিম জান্নাত তৈরির ন্যূনতম আগ্রহ ছিল না, বরং জান্নাত থেকে বিতাড়িত বনী আদমকে প্রকৃত জান্নাতে অনন্ত জীবন যাপন করার জন্য ব্যস্ত ছিলেন। তিনি নিজের জন্য রাজ্য ও রাজত্বের পরিকল্পনা না করে সৃষ্টির সেরা মানব জাতিকে মানব দাসত্বের বেড়ি থেকে মুক্ত করে এ নভোমণ্ডলের প্রকৃত বাদশাহ এক আল্লাহ্‌র দাসত্বের শিক্ষা দিতে সচেষ্ট ছিলেন। এ মহৎ লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সামনে রেখে এ উম্মত জন্ম নেয় এবং এ মহাপয়গাম ও শাশ্বত বাণী বুকে ধারণ করে দিগ্বিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এ উম্মতের সঠিক ভাবধারা সম্পর্কে সম্যক অবগত এবং ইসলামের জীবন্ত পয়গাম সম্পর্কে জ্ঞাত এবং যারা ইসলামী দাওয়াতের সঠিক রূহ আত্মস্থ করেছিল এমন প্রতিনিধি কায়সার ও কিসরার মত পরাক্রমশালী বাদশাহের দরবারেও নির্ভীকভাবে স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেছিলঃ আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের এক বিশেষ ও মহৎ কাজে নিয়োজিত করেছেন। তাঁর বান্দাদেরকে মানুষের গোলামীর যাঁতাকল থেকে মুক্ত করে তাঁরই গোলামীর শিক্ষা দেয়া, দুনিয়ার সংকীর্ণতা থেকে আযাদ করে এক প্রশস্ত ধরণীর পথ দেখান এবং ধর্মের যুলুম-অত্যাচারে নিষ্পেষিত মানবতাকে নাজাত দিয়ে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় দেওয়াই হলো আমাদের জীবনের মহান ব্রত। এ উম্মতের যখন ইসলামের অনুপম আদর্শ ও আল্লাহ্‌র বিধান অনুপাতে রাষ্ট্র পরিচালনা করার সুযোগ হয়েছিল, তখন তারা যা বলত এবং যে সুন্দর অনুপম আদর্শ ও বৈষম্যহীন সমাজ ব্যবস্থার আহ্বান জানাত, তা বাস্তবে পরিণত করে। তাঁরা দেখিয়েছেন মুসলিম আদর্শবান শাসকদের রাজত্বকালে এক আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন মানুষের গোলামী হতো না, কোন মানব দর্শন বা দলের মতবাদ চলত না, বরং আল্লাহ্‌প্রদত্ত ঐশী বিধান প্রতিষ্ঠিত হতো। হাকিম বা খলীফা সামান্যতম মানবিক চাহিদাকে সংকোচ করার কারণে বলে উঠত, "মানুষ মাতৃগর্ভ হতে আযাদ ও স্বাধীন ভূমিষ্ঠ হয়েছে, তুমি তাকে আর কত দিন গোলামীর জিঞ্জীরে আবদ্ধ করে রাখবে?" উম্মতে মুসলিমার বড় থেকে বড় হাকিম বড় বড় রাজধানীতে এমন সাধারণ বেশে থাকতেন যে, মানুষ তাঁকে সাধারণ কুলি-মজুর মনে করে মাথায় বোঝা উঠিয়ে দিত, আর তিনি তাদের বোঝাকে তাদের বাড়ীতে দিয়ে আসতেন। মুসলিম সমাজের বড় বড় সম্পদশালী বিত্তবান লোক এমন সহজ-সরল জীবন যাপন করত যে, তাদের দেখে মনে হতো, তারা ক্ষণস্থায়ী জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে কোন রকম আয়েশই মনে করতেন না, বরং তাদের দৃষ্টি অন্য কোন জীবনের সন্ধানে ব্যস্ত আর তাদের চাওয়া-পাওয়া অন্য কোন সুখ-সমৃদ্ধির অপেক্ষায়।

দুনিয়ার আনাচে-কানাচে জীবনের প্রতিটি বাঁকে বাঁকে এ উম্মতের অস্তিত্ব বস্তুবাদের দৈহিক, মানবিক আনন্দ-উল্লাস ও ভোগ বিলাসিতার ঊর্ধ্বে এক অন্য বাস্তবতার পয়গাম ছিল। এ উম্মতের প্রত্যেক ব্যক্তিজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে, এমন কি মৃত্যুর পরও এ চিরসত্য বাস্তবতার চূড়ান্ত আহ্বান করে বলে, সে এ মায়াবী দুনিয়ার বস্তুবাদী শক্তির ঊর্ধ্বে এক মহাপরাক্রম শক্তি, এক প্রাচুর্যময় স্বাচ্ছন্দ্য ভরা বাস্তব জীবন আছে। এ যাদুমাখা দুনিয়ায় চোখ মেলে দেখার আগেই তার কানেই এ মহান সত্যের বাণী আযান ধ্বনি পৌছানো হয় এবং এ ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার মায়াজাল ছিঁড়ে আল্লাহ্‌র দরবারে হাযিরা দেওয়ার পথে এ সত্যবাণীর সাক্ষ্য দিয়ে ও প্রর্দশনী করে তাকে আলবিদা করা হয়।

যখন কর্মমুখর এ দুনিয়ার বুকে নীরবতার পর্দা পড়ে যায় বা কর্মব্যস্ততায় পূর্ণ শহর ডুবে যায় এবং দুনিয়াতে পার্থিব প্রয়োজন ছাড়া অন্য কোন প্রয়োজন ও অনুভূতিশীল সত্তা ছাড়া অন্য কিছুর অস্তিত্বের কল্পনা করা হয় না, ঠিক সে সময় ঐ আযানের ধ্বনি চিন্তাজগতের খেয়ালী মূর্তির ওপর কুঠরাঘাত করে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়ে এ দীপ্ত আহ্বানকে শুনিয়ে দেয়, না------না--। দৈহিক ও মানবিক চাহিদা থেকেও অধিক চাহিদার অন্য এক স্পষ্ট বাস্তব জিনিস আছে। আর এটাই মুক্তির পথ ও সফলতার পথ ঃ حى على الصلوة - حى على الفلاح -(এসো সালাতের দিকে, এসো সফলতার দিকে)।

বাজারের সকল হৈ চৈ এ আযান ধ্বনির মহিমার সামনে আত্মসমর্পণ করে। সকল ব্যস্ততা এ মহাআহ্বানের সামনে সম্পূর্ণ মূল্যহীন হয়ে পড়ে। আল্লাহ্‌র বান্দারা এ পূত-পবিত্র ধ্বনির পেছনে পাগলের ন্যায় দ্রুত পায়ে এগিয়ে চলে। রাত্রে যখন সারা শহরবাসী গভীর সুখ নিদ্রায় মত্ত, এই কলরবমুখর বসুন্ধরা যেন একটি উজাড় কবরস্থান, হঠাৎ মৃতপ্রায় লাশের এ বস্তিতে জীবনের ঝর্ণাধারা এমন তীব্র গতিতে বয়ে চলে যেমন রাত্রের কাজল কালো চাদরের ওপর সোনালী সকালের আলোর সিপাহীদের বিপ্লবী আন্দোলন। الصلوة خير من النوم-"ঘুম হতে সালাত উত্তম"—এর সুর ঝংকারে এ মৃত্যুপ্রায় ঘুমন্ত মানবতা এক নব জীবন ও নব উদ্দ্যাম পয়গাম লাভে ধন্য হয়। রাজত্বের মোহে পড়ে আত্মবিস্মৃত হয়ে বলে ঃ انا ربكم الاعلى। আমিই তোমাদের সবচেয়ে বড় খোদা এবং আমি ছাড়া আর তোমাদের কোন ইলাহ নেই,-এর ভাব প্রকাশ করতে থাকে ঠিক তখনি একজন সাধারণ মুয়াজ্জিন তাঁরই রাজত্বের সুউচ্চ মিনারের চূড়া থেকে اشهد ان لا اله إلا الله "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই" (আল্লা মহান আল্লাহ বড়)—এর ধ্বনি শুনিয়ে তার প্রভুত্বের দাবির মিথ্যা আস্ফালনের সাথে বিদ্রূপ করে এবং ما لكم من اله غيرى —এর ঘোষণা দিয়ে প্রকৃত বাদশাহ্‌র রাজত্বের উদাত্ত

আহ্বান শুনিয়ে দেয়। ফলে দুনিয়ার পরিবেশ অস্থিতিশীলতা থেকে এবং তার চিন্তা-চেতনার গতিবিধি ভারসাম্যহীনতা থেকে মুক্ত হয়।

মু'মিনের রক্ত-মাংসের সাথে এ পার্থিব জীবনের কোন উপায়-উপকরণের কোন সম্পর্ক নেই। যদি সে কোন দেশ থেকে চলে যায়, তাহলে সে দেশের দৈনন্দিন জীবন কোন রকম ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। দুনিয়া যেভাবে আয়-ব্যয় করত, সেভাবেই জীবন ধারণ করবে। কিন্তু স্মরণ রাখা দরকার, তার দেহ তখন আত্মাহীন এক মৃত লাশে পরিণত হবে, মানবিক চিন্তাধারার ঠাকুর ঘরে, যেখানে আত্মপূজা ও পেট পূজা ছাড়া আর কিছুই নেই, সেখানেই এক পাগলমনা দরবেশ যার ইশ্‌ক ও মাতলামিতে এ জগত থাকে সরগরম। সুতরাং সে যদি এখান থেকে চলে যায় তাহলে এ দুনিয়া একটি বাণিজ্য মেলা ও এ জীবন প্রাণহীন একটি লাশ ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ মানব জীবনের কল্পনার রাজ্যে সেই একজন আত্মবিশ্বাসী মানুষ, তার আত্মবিশ্বাস আত্মপরাজিত ও ভগ্ন হৃদয়ের কেন্দ্রস্থল ও বিফল ও নৈরাজ্যের সাগরে ডুবুডুবু মানুষের জন্য কূল-কিনারা। আত্মাভিলাষী, স্বার্থপর জনসমুদ্রে সেই একজন আত্মত্যাগী মহামানব। তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি সেই মাত্র জীবন বাজি রেখে নিজের সর্বস্ব অন্যের কল্যাণের জন্য নিঃস্বার্থভাবে বিলিয়ে দেন। অনুভূতিহীন পাষণ্ড মানবতার মাঝে তিনিই একজন প্রেমিক, সারা দুনিয়ার সকল ব্যথায় তিনি জ্বলে পুড়ে মোমের মত গলতে থাকেন। ধন-দৌলতের ওপর দরিদ্রতাকে, রাজত্বের ওপর চাটাইকে, দুনিয়ার ওপর আখেরাতকে ও নগদের ওপর বাকীকে, সাদৃশ্যের ওপর অদৃশ্যকে অগ্রাধিকার দেওয়া এবং ঈমানের ওপর জান উৎসর্গ করার অধিক হিম্মত ও সৎ সাহস যুগে যুগে তাঁদেরই বুকে দেখা দিয়েছে।

কোন দেশ ও জাতি তাঁকে স্থান দিয়ে তাঁর ওপর কোন কৃপা করেনি, বরং তাঁরই কৃপায় ও মেহেরবানীতে সারা বিশ্ববাসী নিষ্কলুষ তাওহীদ বাণীর শিক্ষা পেয়ে ধন্য হয়েছে। প্রেম ও ভালবাসা, নিঃস্বার্থ বন্ধুত্ব ও সামাজিক সংহতি ও অত্যাচারমুক্ত ভেদাভেদহীন এক আদর্শ সমাজ কাঠামো মানুষকে উপহার দিয়েছেন। মানুষকে মানুষের গোলামী থেকে আযাদী দিয়েছেন। আমীর-গরীবের দুর্ভেদ্য প্রাচীর ভেঙ্গে একে অন্যের সাথে প্রেম-প্রীতির সম্পর্ক গড়ে তুলেছেন। যুগ যুগ ধরে সর্বহারা নারীর অধিকার আদায় করে তার সাথে ইনসাফ করতে শিক্ষা দিয়েছেন, মানুষ ও মানবতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করার নির্দেশ দিয়েছে। জীবনের অধিক সাফল্য, মানুষ-মানুষের প্রতি অধিক মহত্ত্ব, মহানুভবতা ও দুনিয়ার ব্যাপারে আরো বিশাল ধ্যান-ধারণা দান করেছেন। বংশপূজা, ধনদৌলতের পূজা ও বাদশাহ ও তার নীতির পূজা থেকে মুক্তি দিয়েছেন। বৈরাগ্য, নীরব নিঃসঙ্গ জীবন-অর্পণ, মানবতার প্রতি বিরূপ মনোভাব এবং শত সহস্র বছর পুরাতন ধ্যান-ধারণা ও

মন-মানসিকতার অটুট দুর্ভেদ্য প্রাচীর ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে চিন্তা-চেতনার সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত করে, শিক্ষা-দীক্ষার ক্ষেত্র থেকে বিধি-নিষেধ উঠিয়ে দিয়ে ব্যাপক শিক্ষার ব্যবস্থা করেছেন, ধর্মের ওপর থেকে ব্যক্তি ও বংশীয় ইজারাদারী শেষ করে ব্যক্তিগত আমল ও চেষ্টার প্রয়োজনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

আজ শিক্ষা-দীক্ষার উন্নতি যে পর্যায়ে পৌছেছে তা কে না জানে যে, এ তাঁরই ব্যথাতুর হৃদয়ের দান এবং সেই একদিন মানবতার অগ্রযাত্রার অগ্রনায়ক ছিল। আজ ইউরোপ জ্ঞান-বিজ্ঞানের ময়দানে শিক্ষকের আসনে সমাসীন। কিন্তু একথা সকলেই জানে, একদিন স্পেনীয় মুসলিম জাতি তাদেরকে শিক্ষা-দীক্ষা দিয়ে পশুত্বের স্তর থেকে মুক্ত করে আলোর দিশা দিয়েছিল। আজ ভারত তথা সারা বিশ্বে আদল-ইনসাফ, বিশ্ব-মানবতার প্রতি সাম্য, প্রেম-প্রীতি ও সমান অধিকারের স্লোগান ধ্বনিত হচ্ছে। কিন্তু কে অস্বীকার করবে, এ সকল শব্দ কত প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়েছিল এবং আজ তার মূল্য সবাই বুঝতে সক্ষম হয়েছে। মুসলমান কোন বংশ-জাতির নাম নয় বা ইসলাম কোন বিভিন্ন কুসংস্কার, প্রথা বা কোন পৈত্রিক সম্পত্তির নাম নয়। তার সঠিক পরিচয় হলো, ইসলাম একটি দাওয়াত ও পয়গাম, এ একটি আদর্শ ও জীবন চলার পথে আল্লাহ্র জীবন বিধান যার দাবী হলো, মানুষের দৃষ্টি যেন বস্তুবাদ ও অনুভূতিশীল বিষয়াদি এবং দেহ-মনের সাথে সম্পর্কিত সংকীর্ণ দুনিয়ার উর্ধ্বে উঠে যায় এবং তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য যেন অন্ন-বস্ত্রের উর্ধ্বে হয়ে যায় এবং তার কাছে আবাসস্থল যেন এক দেশের চৌদরজা থেকে অনেক প্রশস্ত বলে বিবেচিত হয়। যার দাবী হলো যে, মানুষ হবে মানবতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং তার সহানুভূতি হবে দেশ ও জাতির সীমারেখামুক্ত। আর তার ত্যাগ-তিতিক্ষা মৃত্যু পর্যন্তই শেষ নয় অর্থাৎ তার কাছে দেহের সাথে সাথে হৃদয় ও আত্মার প্রশান্তির উপায়-উপকরণও রয়েছে। তার কাছে এমন ঈমানী শক্তি ও ঐশী নীতিমালা আছে, যার আলো-আঁধারে, মানব সমাজে বা নির্জনে, দরিদ্রতায় বা বিত্তশালী হয়ে নিরুপায় বা একক ক্ষমতা বলের মাঝেও তাকে নিয়ম-নীতির গণ্ডিতে রাখতে সক্ষম। তার কাছে মানবিক-দর্শন, মনগড়া অভিজ্ঞতার আলোতে গড়ে ওঠা নিয়ম-নীতির পরিবর্তে এমন একটি শক্তিশালী নির্ভেজাল ঐশী নীতিমালা আছে, যা সর্বকালে, সর্বস্তরে প্রচলিত হতে পারে। তার কাছে বিভিন্ন মন-মানসিকতাসম্পন্ন মানুষকে এবং বিভিন্ন কালের পথের দিশা দেয়ার জন্য সর্বগুণের অধিকারী এমন এক মহান পুরুষের জীবন-চরিত মাহফূজ রয়েছে যার জ্ঞানদর্শন ও চালচলনের উৎস, ধারণা, অভিজ্ঞতা বা মনগড়া ও মতবাদ আবেগময় ও মনষ্কাম চরিতার্থ ছিল না। তাঁর অনুপম আদর্শ সর্বযুগে ভারসাম্যপূর্ণ জীবন পদ্ধতি, সভ্যতা-সংস্কৃতি ও শান্তিপূর্ণ মানবতার পয়গাম দিতে সক্ষম। কারণ সব নিয়ার উন্নতি-অবনতি

সময় বা দেশের প্রতিটি পরিবর্তনের ধারায় তাঁর অস্তিত্ব পূর্ণময়। সুতরাং এমন মহাপয়গামের অগ্রপথিক, এমন সকল গুণে গুণান্বিত জামাতের অস্তিত্ব দুনিয়ার কোন প্রান্তে থাকা কারো কোন অবদান নয়, বরং এ সৃষ্টির স্রষ্টার একমাত্র মনোবাসনা, দৈনন্দিন জীবনে সর্বাপেক্ষা বড় প্রয়োজনীয় বস্তু।

যখন রাতের অন্ধকার দিনের আলোর ওপর ছেয়ে যায়, মন প্রবৃত্তির সৈন্যদল বিজয় দর্পে এগিয়ে আসে, যখন মানুষ একমুঠো অন্নের লোভে নিজের সহোদরকে হত্যা করতে কুণ্ঠাবোধ করে না, যখন এক জাতি নিজের মিথ্যা দর্প ও আত্মগর্বে অন্য দুর্বল জাতিকে গ্রাস করে নেয়, ধন-দৌলতের পূজারীরা প্রকাশ্যে ধন-দৌলতের আরাধনা করতে থাকে, যখন দেশ ও জাতির নামে মানুষকে বলিদান করতে দেখা যায় এবং মানুষ দৌলত ও ক্ষমতার নেশায় মত্ত হয়ে নিজেকে খোদায়ী দাবি করতে থাকে, গুদামজাতকরণ ও পুঁজিবাদের ভুয়া কারণে মানুষ যখন ক্ষুধার তাড়নায় মরতে থাকে, প্রবৃত্তির অগ্নিশিখা দাবানলে পরিণত হয় আর আত্মার দীপ্ত শিখা নিভে যায়, যখন যিন্দেগীর বাণিজ্য বন্দরে আত্মাবিশিষ্ট মানুষ মূল্যহীন অপদার্থ হয়ে দাঁড়ায় এবং প্রাণহীন ধাতব পদার্থ অমূল্য রত্ন মর্যাদার স্থান পায়, যখন উলঙ্গপনা ও নির্লজ্জতা, গুনাহ ও পাপের দৌরাত্ম্য বেড়ে গিয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানে ও সভ্যতা-সংস্কৃতির পদে সমাসীন হয়, যখন স্বার্থপরতা ও মনোবাসনা চরিতার্থ ছাড়া দুনিয়াতে অন্য কিছুর প্রভাব নজরে আসে না, সারা দুনিয়াতে সর্বপ্রকার অকল্যাণ ছড়িয়ে পড়ে, তখন এ সৃষ্টির আত্মা, আর্ত চিৎকার করে এ মর্দে খোদাকে দীপ্ত কণ্ঠে আওয়াজ দিতে থাকে—

خیز کہ شد مشرق ومغرب خراب

"কে আছ জোয়ান হও আগুয়ান হাঁকিছে ভবিষ্যত,
এ তুফান ভারী, দিতে হবে পাড়ি, নিতে হবে তরী পার।"

নয়া তুফান

ইরতিদাদের নয়া তুফান

ইসলামী ইতিহাসে অসংখ্য রিদ্দতের (ধর্মত্যাগের) ঘটনা ঘটেছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য ও ভয়ংকর ঘটনা হলো প্রিয় নবী (সা)-এর ইন্তিকালের পর পর আরব গোত্রসমূহের রিদ্দতের ঘটনা। হযরত আবূ বকর (রা) রিদ্দতের এ ভয়ংকর তুফানকে সূচনা পর্বেই নিস্তব্ধ করে দেন এমন ঈমান ও আযীমতের দ্বারা যার নমুনা ইতিহাসে বিরল।

রিদ্দতের এ ভয়ংকর তুফানের আরেকটি ঘটনা ঘটেছিল স্পেনে মুসলমানদের দেশান্তর করার পর। সেখানে খ্রিস্টান বানাবার তৎপরতা অথবা অন্য ঐ সকল এলাকাতে যেখানে পশ্চিমা খ্রিস্টান সরকার গঠিত হয় এবং সেখানে খ্রিস্টান মিশনারী ও বিভিন্ন সংগঠন খ্রিস্টান বানাতে তৎপর ছিল। এ ছাড়া ভারতে হিন্দু ব্রাহ্মণ্যবাদ ও আর্যদের চাপের মুখে কিছু দুর্বল মন-মানসিকতার মানুষ ইসলাম ত্যাগ করে হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করে। কিন্তু এটা খুবই বিরল ঘটনা। কিন্তু বাস্তব ঘটনা হলো, মুসলমানদের ইতিহাসে স্পেনের রিদ্দতের ঘটনা ছাড়া, যদি এটাকে রিদ্দত বলা হয়, মুসলমানদের ইতিহাসে ব্যাপকভাবে রিদ্দতের ঘটনা ঘটেনি, যেমন ধর্মীয় ঐতিহাসিকদের অভিমত।

রিদ্দতের ঐ সকল ঘটনা হতে দু'টি জিনিস স্পষ্ট হয়। একটি হলো মুসলমানদের পক্ষ থেকে চরম ক্রোধ, দ্বিতীয় হলো ইসলামী সমাজচ্যুতি। সুতরাং কোন ব্যক্তি যদি ইসলাম ত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে যায় তাহলে সে মুসলমানদের ক্রোধের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয় এবং সে যেই ইসলামী সমাজে স্বাভাবিক জীবন যাপন করত তা থেকে তাকে সমাজচ্যুত হতে হয় এবং শুধু ইসলাম ত্যাগ করার কারণে তার ও তার সমাজ, নিকট আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের মাঝে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। ফলে রিদ্দত তার জন্য এক সমাজ হতে অন্য সমাজে এবং এক জীবন হতে অন্য জীবনে পদার্পণ করার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আর এ কারণে তার পরিবার তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে এবং তাকে সপরিবারে ত্যাগ করে। আর তাই তার থাকে না কোন বৈবাহিক সম্পর্ক ও ভ্রাতৃত্ব বন্ধন। সে সর্বপ্রকার মিরাছ থেকে হয় বঞ্চিত।

রিদ্দতের ঘটনাসমূহ মুসলমানদের মাঝে ইসলামের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ-প্রতিহত করা ও অন্যান্য ধর্মের সাথে ইসলামের তুলনামূলক আলোচনা

করার এক মানসিকতা সৃষ্টি করে। আর এ কারণে ইসলামী জগতের যে কোন প্রান্তে রিদ্দতের ঘটনা ঘটে সেখানেই উলামায়ে কিরাম, দাওয়াতে দীনের কর্মিগণ এবং কলম সৈনিকগণ এর কারণসমূহ নির্ণয় করে প্রতিরোধে দাঁড়িয়ে যায়। তারা ইসলামের অনুপম আদর্শ ও বৈশিষ্ট্যগুলো মানুষের সামনে উপস্থাপন করে। আর তাদের বিরুদ্ধে ইসলামী সমাজে ক্রোধ ও বিরূপ প্রতিক্রিয়ার এক উত্তাল তরঙ্গের সৃষ্টি হয়। ঘরে-বাইরে, সাধারণ ও অসাধারণ সর্বস্তরের মুসলিম জনতার মাঝে প্রতিবাদ ওঠে। প্রতিকারের প্রবল মন-মানসিকতা তৈরি হতো।

কিন্তু ইসলামী জগত এই শেষ যুগে রিদ্দতের এমন এক তুফানের সম্মুখীন যা ইসলামী জগতের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে এবং এগুলো ব্যাপকতা, ভয়াবহতার শক্তি ও গভীরতার ক্ষেত্রে আগের সকল রিদ্দতের ঘটনায় ওপর বিজয় লাভ করেছে। এ থেকে কোন একটি দেশ ও নিরাপদ নয়, বরং খুব কম সংঘবদ্ধ মুসলিম পরিবারই এ থেকে মুক্তি পেয়েছে। এ রিদ্দতের ঘটনা ঘটেছিল প্রাচ্যের ইসলামী দেশগুলোর ওপর ইউরোপের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের পর। প্রিয় নবী (সা)-এর ওফাতের পর হতে বর্তমান কাল পর্যন্ত মুসলিম জগতে ও ইসলামী ইতিহাসে এটাই হলো সর্ববৃহৎ রিদ্দতের ঘটনা।

রিদ্দতের অর্থ

ইসলাম ও শরী'আতের পরিভাষায় এ ছাড়া আর রিদ্দতের কী অর্থ হতে পারে? এক ধর্মের পরিবর্তে অন্য ধর্ম এবং এক আকীদা-বিশ্বাসের পরিবর্তে অন্য আকীদা-বিশ্বাস গ্রহণ করা, প্রিয় নবী (সা) যা নিয়ে এসেছেন, যা সর্বজনস্বীকৃত ও সন্দেহাতীতভাবে দীন বলে বিবেচিত, তাকে অস্বীকার করা, এর নামই তো হলো রিদ্দত।

আর মুরতাদদের কাজ কি? তাদের কাজ হলো প্রিয় নবী (সা)-এর শাশ্বত পয়গামকে অস্বীকার করে খ্রিস্ট ধর্ম বা ইহুদী ধর্ম বা হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করা অথবা ধর্ম, নবুওত, ওহী বা আখিরাতকে অস্বীকার করা। রিদ্দতের এ অর্থই তৎকালীন আলেম-উলামা ও মুসলিম সমাজ গ্রহণ করত। আর এ কারণে কোন ব্যক্তি স্বধর্ম ত্যাগ করে খ্রিষ্ট ধর্ম গ্রহণ করলে গীর্জায় যেত অথবা হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করলে মন্দিরে প্রবেশ করত। উদাহরণস্বরূপ, ফলে সকলেই তা জানতে পারত এবং তার দিকে আঙুল উঠিয়ে ইঙ্গিত করা হতো, আর মুসলিম সমাজ তার থেকে পরিপূর্ণভাবে নিরাশ হতো। আর তাই সে সময় মুরতাদ হওয়ার ঘটনা অধিকাংশ সময় গোপন কোন ঘটনা হতো না।

ইউরোপীয় দর্শন ও তার প্রভাব

ইউরোপ প্রাচ্যের কাছে এমন কিছু দর্শন নিয়ে এসেছে যার মূল ভিত্তি হলো ইসলামের মৌলিক আকীদা-বিশ্বাসকে প্রত্যাখ্যান করা এবং এ জগত

পরিচালনাকারী ও সংরক্ষণকারী ঐ শক্তিকে অস্বীকার করা যার মাধ্যমে এ ধরণী অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব লাভ করেছে এবং তারই হাতে রয়েছে এর কর্তৃত্ব। যেমন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে ঃ ألا له الخلق والأمر। "জেনে রাখ, সৃষ্টি ও নিয়ন্ত্রণ তাঁরই।"

ঐ সকল দর্শনের মূল ভিত্তি হলো আসমানী শরী'আত প্রত্যাখ্যান এবং আখলাকী ও রূহানী নীতি-নৈতিকতা বর্জন। ঐ সকল দর্শনের কিছু হলো জীবন সৃষ্টি ও জাগতিক উন্নতির বিষয়বস্তু আর কিছু হলো নীতি-নৈতিকতার বিষয়বস্তু আর কিছু হলো মনোবিজ্ঞান বিষয়ক, কিছু হলো রাজনীতি ও অর্থনীতি বিষয়ক। মোটকথা এ সকল দর্শনের মূলনীতি, অবকাঠামো ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য যতই ভিন্ন ভিন্ন হোক না কেন, মানুষ ও জগত সম্পর্কে শুধু বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে সবই অভিন্ন। মানুষ ও জগতের বাহ্যিক ও কর্মের বস্তুবাদী বিশ্লেষণই হলো এর মূল লক্ষ্য-উদ্দেশ্য।

ইউরোপের ঐ সকল দর্শন প্রাচ্যে ইসলামী সমাজের ওপর আক্রমণ করে তার দিল ও দিমাগে মিশে একাকার হয়ে গেছে, বরং এটা ইসলামের আবির্ভাবের পরে ইতিহাসের পাতায় একটি বৃহৎ ধর্মরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে এবং এর প্রচার-প্রসার, এর শিকড়ের গভীরতা এবং দিল ও দিমাগের ওপর এর প্রভাব অন্য সকল ধর্ম থেকে ব্যাপক ও বিস্তৃত। আর এ কারণে মুসলিম বিশ্বের বুদ্ধিজীবী ও ফুলকলি এর দিকে ঝুঁকে পড়ে একে আত্মস্থ করে ফেলেছে এবং একে দীন হিসাবে গ্রহণ করেছে। যেমন একজন মুসলিম ইসলামকে পূর্ণ দীন হিসাবে গ্রহণ করে বা একজন খ্রিস্টান খ্রিস্ট ধর্মকে গ্রহণ করে থাকে। তারা এর জন্য প্রাণ উৎসর্গ করতেও প্রস্তুত। তারা তার প্রতীকসমূহকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখে এবং এর প্রবক্তা ও নেতাদেরকে সমীহ করে। তারা তাদের বই-পুস্তক ও সাহিত্যেকর্মের মাধ্যমে অন্যদেরকে এদিকে দাওয়াত করে। তারা এর সাথে সাংঘর্ষিক অন্য ধর্ম, মতবাদ ও রীতিনীতিকে খাট করে দেখে। আর যারা একে ধর্ম দর্শন হিসাবে গ্রহণ করে তাদের মাঝে ভ্রাতৃত্ব সম্পর্কে গড়ে ওঠে। সুতরাং এদিক থেকে এর সদস্যবৃন্দ একটি জাতি, একটি পরিবার, একটি সেনা ছাউনিতে পরিণত হয়েছে।

এ হলো ধর্মহীন একটি ধর্ম

এ দর্শনকে ধর্ম নয় তো আর কি বলা যেতে পারে? যদিও বা এর প্রবক্তারা একে ধর্ম বলতে অস্বীকার করে। কেননা এ মতাদর্শ সর্বজ্ঞ ও মহাজ্ঞানী বিশ্বস্রষ্টা যিনি প্রতিটি বস্তুকে নিপুণভাবে সৃষ্টি করেন এবং সুন্দর জীবন পদ্ধতি দান করেন, তাকে অস্বীকার করে। অস্বীকার করে হাশর ও বিচার দিবসকে, অস্বীকার করে জান্নাত-জাহান্নাম ও ভাল মন্দের প্রতিদানকে, অস্বীকার করে রিসালাত-নবুওয়াতকে, অস্বীকার করে আসমানী শরী'আত ও শরী'আতের সীমারেখাকে। মহানবী

(সা)-এর অনুসরণ করা প্রত্যেক মানুষের জন্য ফরয, তাঁর অনুসরণেই থাকে হিদায়াত ও সফলতা নিহিত এবং ইসলামই এমন সর্বশেষ ও শাশ্বত পয়গাম যা দুনিয়া ও আখিরাতের সকল কল্যাণের কেন্দ্রবিন্দু এবং ইসলামই হলো সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোৎকৃষ্ট জীবন পদ্ধতি। ইসলামই এমন এক জীবন বিধান যে, এছাড়া আল্লাহ্‌র কাছে অন্য কোন জীবন বিধান গ্রহণযোগ্য নয়, এছাড়া বিশ্বমানবতা সফলতার সোনালী প্রান্তে পৌঁছতে সক্ষম নয়— এ সকল বাস্তবতা অস্বীকার করে। স্বীকার করে না যে, দুনিয়া সৃষ্টি হয়েছে মানুষের জন্য আর মানুষ সৃষ্টি হয়েছে আল্লাহ্‌র জন্য।

এটাই হলো অধিকাংশ মুসলিম বিশ্বের নেতৃস্থানীয় শিক্ষিত ও বুদ্ধিজীবীদের ধর্ম দর্শন, যদিও বা তারা এর প্রতি ঈমান ও সহযোগিতার ক্ষেত্রে এক স্তরের নয়। কারণ নিঃসন্দেহে তাদের মাঝে অনেকে এমন আছে যারা আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান রাখে এবং ইসলামকে দীন হিসাবে গ্রহণ করে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, এ শ্রেণীর অধিকাংশের পরিচয়, অধিকাংশ সদস্য ও নেতৃবর্গের ধর্ম হলো বস্তুবাদী দর্শন এবং ধর্মহীন নীতিমালায় প্রতিষ্ঠিত ইউরোপীয় জীবন ব্যবস্থা।

এ হলো রিদ্দত, তবে নয়া কিন্তু নেই সিদ্দীকী দৃঢ়তা

বাস্তবেই এটা রিদ্দত- ধর্মবিমুখিতা। আমি আবার বলতে চাই, এ রিদ্দত মুসলিম বিশ্বের এক প্রান্ত হতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত সব কিছু পরিষ্কার করে ফেলেছে। আক্রমণ করেছে ঘর-বাড়ি থেকে শুরু করে স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি ও বিভিন্ন একাডেমীর ওপর। সুতরাং বর্তমান প্রতিটি শিক্ষিত পরিবারের, আল্লাহ যাকে রক্ষা করেছেন, সে ছাড়া কোন না কোন সদস্য একে ধর্ম হিসাবে অবশ্যই গ্রহণ করেছে, বা একে মনপ্রাণ দিয়ে ভালবাসে বা এর প্রতি দুর্বল। তাদের সাথে যদি একান্তে আলোচনা করা হয় বা নির্জনে কথাবার্তা বলা হয় বা তাদের কার্যকলাপের প্রতি দৃষ্টি রাখা হয়, তাহলে স্পষ্টই হয়ে যাবে যে, তারা আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাসী নয় বা আখিরাতের প্রতি সন্দেহহীন অথবা তারা প্রিয়নবী (সা)-এর প্রতি আস্থাশীল নয়। তারা মহাগ্রন্থ কুরআন মাজীদ ও চিরন্তন জীবন বিধানের প্রতি বিশ্বাসী নয়, বরং তাদের ব্যাপারে একথা বলাই শ্রেয়, তারা এ সব বিষয়ে চিন্তা করে না এবং এসব বিষয়ে খুব একটা আগ্রহীও নয়। তাদের কাছে এর তেমন কোন গুরুত্ব নেই।

নিঃসন্দেহে এটা রিদ্দত–ধর্মবিমুখিতা। কিন্তু এ রিদ্দত মুসলমানদের দৃষ্টি আকর্ষণ বা এ ব্যাপারে তাদের উদ্বিগ্ন করতে সক্ষম হয়নি। কারণ এমন মুরতাদ কখনো গির্জা বা মন্দিরে প্রবেশ করে না অথবা তারা মুরতাদ হয়ে অন্য ধর্ম গ্রহণের কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা দেয় না। আর তাই তাদের পরিবার তাদের ব্যাপারে থাকে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। ফলে তাদের পরিবার-পরিজন তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে না, বরং

তারা ঐ পরিবারে বসবাস করে তার থেকে উপকৃত হয় এবং কখনো তাদের ওপর তদারকি করে। অনুরূপ সমাজ ও তাদের ব্যাপারে অজ্ঞ থেকে যায়। ফলে সমাজ তাদের ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করে না, তাদেরকে তিরস্কার করে না এবং তাদের সাথে সম্পর্কও ছিন্ন করে না, বরং তারা সে সমাজে বসবাস করে এবং সামাজিক অধিকার ভোগ করে। আবার কখনো সমাজের ওপর কর্তৃত্ব করে।

নিশ্চয় রিদ্দতের এ নয়া তুফান ইসলামী বিশ্বের জন্য এক মহাসমস্যা, মুসলিম জাতির জন্য এক মহাআতংক। রিদ্দতের এ নয়া তুফান সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে এবং ইসলামী সমাজকে পুরোপুরিভাবে গ্রাস করে ফেলেছে, অথচ এখনো কেউ সচেতন হয়নি। উলামায়ে কিরাম ও দীনের প্রতি অনুভূতিশীল ব্যক্তিবর্গও এ ব্যাপারে কোন আশংকা বোধ করে নি। আগের যুগে বলা হতো "বিচার সংক্রান্ত আছে কিন্তু সমাধানের জন্য আবুল হাসান (আলী) নেই" আর আমি বলি, রিদ্দতের নতুন তুফান আছে কিন্তু এর মুকাবিলায় আবূ বকর সিদ্দীক (রা) নেই।

এটা এমন একটি সমস্যা, যার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা, গণজোয়ার বিপ্লবের যাতে সংঘর্ষের প্রয়োজন নেই, বরং অনেক ক্ষেত্রে সংঘাতের কারণে সমস্যা ২৯ক্ষতিকর ও বিস্ফোরক হয়ে দাঁড়ায়। কারণ ইসলাম বিচার বিভাগীয় তদন্ত বা সংঘাতে বিশ্বাসী নয়। মূলত এ সমস্যা নিরসনের জন্য প্রয়োজন হিম্মৎ, প্রজ্ঞা, ধৈর্য, সহনশীলতা, প্রয়োজন গবেষণার, কেন এ ধর্ম দর্শন প্রাচ্যের ইসলামী জগতে ব্যাপক আকারে বিস্তৃতি লাভ করেছে? কিভাবে মুসলমানদের ঘরে আক্রমণ করতে সক্ষম হলো? কিভাবে দিল ও দেমাগের ওপর এমন কঠোর আক্রমণ করতে সক্ষম হলো? এ সব কিছু উপলব্ধি করার জন্য প্রয়োজন গভীর ও সূক্ষ্ম চিন্তা-ভাবনার, প্রয়োজন ব্যাপক গবেষণার।

রিদ্দতের আসল রহস্য

বাস্তব কথা হলো উনবিংশ শতাব্দীতে মুসলিম বিশ্ব জ্ঞান-বিজ্ঞান, চিন্তা-চেতনা, আকীদা-বিশ্বাস ও দাওয়াতের ক্ষেত্রে দুর্বলতার শিকার হয়ে পড়ে। ফলে তাদের সামনে ইসলামের অক্ষমতা ও বার্ধক্য প্রকাশ পায়। কিন্তু ইসলাম দুর্বলতা বা বার্ধক্যে বিশ্বাসী নয়। বার্ধক্য বা দুর্বলতা কি জিনিষ ইসলাম তা চেনে না। কারণ ইসলাম সূর্যের মত নতুন, সূর্যের মত পুরাতন এবং সূর্যের মতই উদ্দীপ্ত যুবক। কিন্তু মুসলিম সমাজ দুর্বলতা ও বার্ধক্যের শিকার হয়েছে। ফলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাদের নেই কোন প্রশস্ততা, চিন্তা-চেতনা আবিষ্কারের ক্ষেত্রে নেই কোন নতুনত্ব বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার ক্ষেত্রে নেই কোন প্রতিভা, দাওয়াতের ক্ষেত্রে নেই কোন দৃঢ়তা, ইসলামের পয়গাম ও বৈশিষ্ট্যসমূহকে সুন্দর ও প্রভাবিত করে উপস্থাপন করার শক্তি। এসব ময়দানে যা কিছু আছে তা নিতান্তই নগণ্য।

উদ্দেশ্য ও উপকরণের সমন্বয়হীন সুশীল সমাজ

দুঃখজনক হলেও সত্য, ইসলামের সাথে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত যুব সমাজের কোন সম্পর্ক নেই। তাদের চিন্তা-চেতনাকে প্রভাবিত করার মত কোন মাধ্যমও বিদ্যমান নেই, অথচ তারাই ভবিষৎ প্রজন্ম ও আশার কেন্দ্রবিন্দু। তাদেরকে ইসলামের ব্যাপারে আস্থাশীল করে তোলার জন্য কোন প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয় না যে, ইসলামই হলো বিশ্বমানবতার একমাত্র জীবন-বিধান, শাশ্বত পয়গাম এবং মহাগ্রন্থ আল-কুরআন এমন এক চিরন্তন কিতাব যার বিস্ময়কর জ্ঞানভাণ্ডার শেষ হবার নয় এবং তার নতুনত্ব কখনো পুরাতন হবার নয়। প্রিয় নবী (সা)-এর নবুওয়াত একটি বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ। তিনি সর্বকালের সকল জাতির জন্য নবী ও ইমাম। ইসলামী শরী'আত আইনের ক্ষেত্রে উত্তম নমুনা, জীবন পরিচালনার ক্ষেত্রে উত্তম পথ-নির্দেশক। ঈমান-আকীদা, আখলাক-চরিত্র ও রূহানিয়তই হলো সুন্দর সুশীল ও উন্নত সমাজ ব্যবস্থার মূল ভিত্তি। আর আধুনিক সভ্যতা হলো জীবন যাপনের মাধ্যম ও উপকরণ ছাড়া আর কিছুই নয়। পক্ষান্তরে আম্বিয়াদের শিক্ষা-দীক্ষা হলো আকীদা-বিশ্বাস, নীতি-নৈতিকতা, জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নির্ধারণের মূল উৎস। সুতরাং উদ্দেশ্য ও উপকরণের মাঝে সমন্বয় হওয়া ছাড়া সুন্দর, সুশীল ও ভারসাম্যময় কাজ গড়ে তোলা সম্ভব নয়।

এক সাংস্কৃতিক আগ্রাসন

মুসলিম বিশ্বের এমনি এক সংকটময় সময়ে ইউরোপ তার এমন সব দর্শন মতবাদ নিয়ে আক্রমণ করেছে, যে সব মতাদর্শকে সুন্দর ও সাবলীল করে উপস্থাপন করতে বড় বড় দার্শনিক ও যুগশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। তারা ঐ সকল দর্শনকে এমন গবেষণালব্ধ দর্শন দ্বারা সাজিয়েছেন যে, দেখলে মনে হয় এটাই হলো মানুষের চিন্তার শেষ সীমানা, গবেষণা, পরীক্ষা-নিরীক্ষার সর্বশেষ স্তর, মানুষের বুদ্ধি, প্রজ্ঞা ও চিন্তার শেষ ফসল। অথচ এগুলো এমন কিছু বিষয় যার ভিত্তি হয়ত গবেষণা, চাক্ষুষ প্রমাণ ও বাস্তব অভিজ্ঞতা অথবা যার ভিত্তি হয়ত ধারণা, খেয়াল ও কল্পনা। যার মাঝে আছে হক ও বাতিল, জ্ঞান ও অজ্ঞতা, চলমান বাস্তবতা ও কাব্যের খেয়ালীপনা। কেননা কাব্যের খেয়ালীপনা শুধু কবিতার ছন্দ ও ঝংকারের মাঝে সীমাবদ্ধ নয়, বরং ধৈর্যের খেয়ালীপনা ফালসাফা-দর্শন ও জ্ঞানবিজ্ঞানের মাঝেও রয়ে গেছে।

ইউরোপের এ সকল দর্শনের আগমন ঘটেছিল ইউরোপীয় দিগ্বিজয়ীদের সাথে। ফলে এ দর্শনের সামনে মানুষের দিল ও দেমাগ আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছে এবং প্রাচ্যের শিক্ষিত সমাজ এগুলোকে সানন্দে গ্রহণ করেছে। এদের খুব কম সংখ্যক লোকই এ দর্শনগুলোর তাৎপর্য উপলব্ধি করতে সক্ষম। আর বাকী

বিরাট একটা অংশ এর তাৎপর্য উপলব্ধি করতে সক্ষম নয়। কিন্তু প্রত্যেকে এর প্রতি আস্থাশীল ও তার যাদুতে মাতওয়ারা। তারা এর প্রতি আস্থাশীল হওয়াকে উদারতা, বিচক্ষণতা ও মুক্ত চিন্তা-চেতনার নিদর্শন বলে গণ্য করে।

আর এভাবে ধর্মনিরপেক্ষতা ও ধর্মহীনতা ইসলামী সমাজে বিস্তৃতি লাভ করল যে, তাদের পিতা-মাতা, পদস্থ ব্যক্তিবর্গ, শিক্ষকমণ্ডলী ও ধর্মীয় অনুভূতিশীল ব্যক্তিবর্গের খবর হলো না। কারণ এ দর্শনে আস্থাশীল ব্যক্তিরা কোন গীর্জাতে অবস্থান করে না, কোন মন্দিরে প্রবেশ করে না বা তারা কোন মূর্তির সামনে সিজদা অবনত হয় না বা তারা কোন তাগূতের জন্য কোন পশু কুরবানীও দেয় না যা ছিল পূর্বে পরিদ্দত, কুফরী ও ধর্মদ্রোহিতার দলীল, বরং তৎকালীন ধর্মদ্রোহীরা ইসলামী সমাজ ত্যাগ করে যে নতুন ধর্ম অবলম্বন করত, সে ধর্মীয় সমাজে যেয়ে মিলিত হতো এবং তারা প্রকাশ্যে হিম্মতের সাথে ধর্ম পরিবর্তন ও আকীদা-বিশ্বাসের কথা ঘোষণা দিত। তাদের নতুন ধর্ম বিশ্বাসের কারণে যে সব বাধা ও ক্ষতির সম্মুখীন হতে হতো, সব কিছুই তারা সহ্য করত। তারা আগের সমাজে যে সব সুযোগ-সুবিধা ভোগ করত তা লাভের আশায় পূর্বের সমাজে থাকতে বাধ্য ছিল না।

কিন্তু বর্তমানে যারা ইসলামের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে তারা ইসলামী সমাজের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে চায় না, অথচ ইসলামী সমাজ ব্যবস্থাই হলো একমাত্র সমাজ ব্যবস্থা যা আকীদা-বিশ্বাসের ওপর গড়ে ওঠে এবং ইসলামী মূল্যবোধে বিশ্বাসী হওয়া ছাড়া এ সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারে না। এ সত্ত্বেও তারা ইসলামী সমাজে আস্থাভাজন হয়ে এবং ইসলামের দেয়া অধিকার গ্রহণ করে ইসলামী কেন্দ্রসমূহে জীবন যাপন করতে বদ্ধপরিকর। নিঃসন্দেহে এ ঘটনা ইসলামী ইতিহাসের অজানা এক বিরল ঘটনা।

নব্য জাহেলিয়াতের আগ্রাসন

ঐ সকল দর্শনের সাথে আরো কিছু জাহেলীপনা ও জাহেলী মূলনীতি রয়ে গেছে যার বিরুদ্ধে ইসলাম প্রকাশ্যে যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং প্রিয় নবী (সা) যার বিরুদ্ধে পূর্ণ শক্তি ব্যয় করেছেন। যেমন জাহেলী জাতীয়তাবাদ, যার মূলভিত্তি হলো রক্ত, দেশ ও জাতিগত ঐক্য। এখানে এ জাতীয়তাবাদকে সমীহ করা হয় এবং অনেক ক্ষেত্রে সম্মান প্রদর্শনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করা হয়। ফলে এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে, এর পতাকাতলে যুদ্ধ করতে এবং এ মূলনীতির ভিত্তিতে সমাজকে বিভিক্ত করতে কুণ্ঠাবোধ করে না। আর তাই বলা যেতে পারে, এটি একটি নতুন ধর্মে ও আকীদা-বিশ্বাসে পরিণত হয়েছে যা মানুষের দিল ও দেমাগ, রূহ ও সাহিত্যকর্মের ওপর প্রভাব ফেলেছে। নিঃসন্দেহে এ জাহেলী মতবাদ তার গভীরতা, দৃঢ়তা, শক্তি ও ব্যাপকতার ক্ষেত্রে অন্য সকল ধর্মের ওপর বিজয় লাভ করতে এবং মানুষকে তার গোলাম বানাতে এবং আম্বিয়া কিরাম (আ)-এর সকল

মেহনতের বাতিল প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছে। এ জাহেলী মতাদর্শ ধর্মীয় ইবাদত-বন্দেগী ও নীতিমালার বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ ঘোষণা করেছে। মানব জগতকে মুখোমুখি বিভিন্ন শিবিরে বিভক্ত করে দিয়েছে, আর উম্মতে মুসলিমাকে করেছে খণ্ড-বিখণ্ড ও বিভিন্ন দলে বিভক্ত।

ان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاتقون -

অথচ এ ব্যাপারে আল্লাহ্‌র ফরমান হলো– "নিশ্চয় তোমরা একটি মাত্র জাতি আর আমিই তোমাদের রব। সুতরাং তোমরা আমাকেই ভয় কর।"

জাহেলিয়াতের বিরুদ্ধে রাসূল (সা)-এর অবস্থান

প্রিয় নবী (সা) এ জাতীয় জাহেলী জাতীয়তাবাদকে নির্মূল করতে পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করেন এবং এক্ষেত্রে কোন প্রকার নমনীয়তা প্রদর্শন করেন নি। এ বিষয়ে তিনি মানুষকে সতর্ক করেন এবং এর সকল পথ রোধ করেন। কেননা এ সকল জাতীয়তাবাদের সাথে সর্বজনীন ধর্ম ও একজাতিতন্ত্রে বিশ্বাসী মুসলিম উম্মাহ্‌র অস্তিত্ব সম্ভব নয়। ফলে ইসলামের মূল উৎসগুলো এসব দর্শনকে অবজ্ঞা ও নিন্দায় ভরপুর। সুতরাং যে ব্যক্তি ইসলামের স্বতঃস্ফূর্ততা ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অবগত, বরং ধর্মের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জ্ঞাত, সে অবশ্যই উপলব্ধি করতে সক্ষম যে, ধর্ম কখনোই এ ধরনের জাতীয়তাবাদ অনুমোদন করে না। আর যে ব্যক্তি কোন প্রকার প্রবণতামুক্ত হয়ে ইতিহাস চর্চা করে, নিঃসন্দেহে জানতে পারবে সে, এ ধরনের জাতীয়তাবাদ সর্বদাই মানুষ মানুষের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করতে, ধ্বংসাত্মক ও নাশকতামূলক কার্যকলাপ করতে বড় শক্তিশালী অস্ত্র। তাই যুক্তিসঙ্গত কথা হলো যে, মানুষ যারা বিশ্ব এক করতে, সমগ্র মানব জাতিকে এক পতাকাতলে একত্র করতে আগমন করেছে এবং যে মানুষ এমন এক নতুন সমাজ গড়তে চায় যার মূলভিত্তি হলো দীন ও রাব্বুল আলামীনের প্রতি ঈমান, যে মানুষ শান্তি ও নিরাপত্তা বিস্তার করতে চায় এবং মানব সমাজের প্রত্যেক সদস্যের মাঝে প্রেম-প্রীতি-ভালোবাসা উপহার দিতে চায়, যে মানুষ বিশ্বমানবতাকে এমন এক শরীরের ন্যায় গঠন করতে চায় যে, যদি কোন অঙ্গ অসুস্থ হয় তাহলে সারা শরীর জ্বর ও রাত্রি জাগরণে বাধ্য হয়, তাই এ মানুষের জন্য অধিক যুক্তিসঙ্গত যে, সে এ ধরনের জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য ও স্পষ্ট ভাষায় যুদ্ধ ঘোষণা করবে এবং তিনি এর বিরুদ্ধে এমন কথা বলবে যা তার অবর্তমানে কাজ করবে যাতে তারা জাহেলিয়াত থেকে ফিরে আসে।

মুসলিম উম্মাহ্‌র করুণ অবস্থা

কিন্তু ইউরোপের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের পর মুসলিম বিশ্ব রক্ত, বর্ণ ও জাতিগত জাতীয়তাবাদের সামনে মাথা নত করে ফেলেছে। এর প্রতি

এমনভাবে বিশ্বাস স্থাপন করেছে যেন এটি একটি গবেষণালব্ধ বাস্তবসম্মত সমস্যা যা থেকে পালাবার পথ নেই। ইসলাম যে সকল জাতীয়তাবাদকে ধ্বংস করে বিশ্বমানবতাকে মুক্ত করেছিল, আজ মুসলিম বিশ্বের জনসাধারণ আশ্চর্যজনকভাবে তা নিয়ে এগিয়ে চলেছে। সে সব জাতীয়তাবাদকে জীবিতকরণ, এর নিদর্শনাবলীকে পুনরুদ্ধার করতে যে যুগ ইসলামের ওপর বিজয় লাভ করে এবং ইসলামকে জাহেলী যুগ বলে আখ্যায়িত করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যা ইসলামের জন্য বড় ভয়ংকর অপবাদ, এমন যুগকে নিয়ে গর্ববোধ করতে আশ্চর্যজনকভাবে এগিয়ে চলেছে। অথচ পবিত্র কুরআন মজীদ মুসলিম জাতির ওপর এ ধরনের জাতীয়তাবাদ থেকে বের করে অনুগ্রহ করে তাদেরকে অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে উৎসাহ দান করেছে। কারণ এ থেকে বড় আর কোন অনুগ্রহ হতে পারে না। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاۤءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖۤ اِخْوَانًا ـ وَكُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِنْهَا ـ

"তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহকে স্মরণ কর, তোমরা ছিলে পরস্পর শত্রু, তিনি তোমাদের অন্তরে প্রীতি সঞ্চার করেছেন। ফলে তাঁর অনুগ্রহে তোমরা ভাই ভাই হয়ে গেলে।" [আর-ইমরান-১০৩ আয়াত]

অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে ঃ

بَلِ اللّٰهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ اَنْ هَدٰكُمْ لِلْاِيْمَانِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ـ

"আল্লাহ তা'আলা তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন তোমাদের ঈমানের পথে পরিচালিত করে যদি তোমরা সত্যবাদী হও।" [হুজরাত-১৭]

অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে ঃ

هُوَالَّذِىْ يُنَزِّلُ عَلٰى عَبْدِهٖۤ اٰيٰتٍ ۢبَيِّنٰتٍ لِّيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ـ

"তিনি তাঁর বান্দার প্রতি সুস্পষ্ট আয়াত অবতীর্ণ করেন তোমাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে আনার জন্য। আল্লাহ তো তোমাদের প্রতি পরম করুণাময় ও অতিশয় দয়ালু।" [আল হাদীদ–৯]

জাহেলিয়াতের আঘাত, মুসলিম উম্মার করণীয়

বাস্তব কথা হলো, মু'মিনের আদর্শ এমন হওয়া উচিত যে, জাহেলিয়াতের যুগ যতই অগ্রগতি লাভ করুক না কেন, সে এটাকে ঘৃণাভরে, অবজ্ঞার সাথে স্মরণ

করবে এবং এটাকে লোমহর্ষক বলে বিবেচনা করবে। কারণ যখনই কোন কারাদণ্ডপ্রাপ্ত মানুষ কারা নির্যাতন সহ্য করার পর মুক্তি লাভ করে, অতঃপর কারাগারের লোমহর্ষক অত্যাচারের কথা যদি তার স্মরণ হয়, তখন ভয়ে তার দেহের লোম খাড়া হয়ে যায়। অনুরূপ যদি কোন মৃতপ্রায় রুগ্ন ব্যক্তি আরোগ্য লাভ করার পর কখনো তার উক্ত রোগের কথা স্মরণ হয় তখন তার অবস্থা নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে এবং তার রং বিবর্ণ হয়ে যায়। যেমন কোন ব্যক্তি ভয়ানক কোন স্বপ্ন দেখে হঠাৎ জেগে ওঠে তাহলে সে আল্লাহ্র কৃতজ্ঞতা এজন্য প্রকাশ করে যে, এটা ক্ষণিক সময়ের দুঃস্বপ্ন মাত্র!

আর জাহেলিয়াত, যার মাঝে আছে অজ্ঞতা, ভ্রষ্টতা, বাস্তবতাহীন কার্যকলাপ এবং যা দুনিয়া-আখেরাতে মহাবিপদ ও ক্ষতির কারণ, ঐ সকল বিষয় থেকে অধিক ভয়ংকর। সুতরাং এর আলোচনা ও স্মরণ অধিক ঘৃণার জন্ম দেওয়া স্বাভাবিক। এর এ থেকে মুক্তি পাওয়া ও এর যুগ শেষ হবার কারণে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে উৎসাহিত হওয়াই অধিক বাঞ্ছনীয়। আর এ কারণে বিশুদ্ধ হাদীসে বর্ণিত আছে ঃ

ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الايمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مماسواهما وأن يحب المرء لايحبه الالله وأن يكره أن يعود الى الكفر كما يكره ان يقذف فى النار ـ

যার মাঝে তিনটি গুণ পাওয়া যাবে, সেই ঈমানের স্বাদ আস্বাদন করবে ঃ (১) আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.) অন্য সব কিছু থেকে তার কাছে অধিক প্রিয় হবে। (২) সে একমাত্র আল্লাহ্র জন্যই অন্যকে ভালবাসবে। (৩) তা সে কুফুরীর দিকে প্রত্যাবর্তন করা এমন অপছন্দ করবে যেমন তাকে আগুনে নিক্ষেপ করা অপছন্দ করে। [বুখারী]

জাহেলিয়াতের নিন্দায় কোরআনুল কারীম

এটাই স্বাভাবিক। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং জাহেলীপনা, তার রূপকার ও আত্মসাৎসর্গকারীদেরকে অত্যন্ত কঠিন ভাষায় নিন্দা জ্ঞাপন করেছেন। ইরশাদ হচ্ছেঃ

وَجَعَلْنٰهُمْ اَئِمَّةً يَّدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ ـ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ لَا يُنْصَرُوْنَ ـ وَاَتْبَعْنٰهُمْ فِىْ هٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ هُمْ مِّنَ الْمَقْبُوْحِيْنَ ـ

"আমি তাদেরকে (দোযখবাসীদের) নেতা বানিয়ে ছিলাম; তারা লোকদেরকে জাহান্নামের দিকে আহ্বান করত। কিয়ামতের দিন তাদেরকে সাহায্য করা হবে না। এ পৃথিবীতে আমি তাদের পশ্চাতে লাগিয়ে দিয়েছি অভিশম্পাত এবং কিয়ামতের দিন তারা হবে ঘৃণিত।" [সূরা কাসাস ঃ ৪১-৪২]

وَمَا اَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيْدٍ - يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَاَوْرَدَهُمُ النَّارَ - وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُوْدُ - وَاُتْبِعُوْا فِيْ هٰذِهٖ لَعْنَةً وَّيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُوْدُ -

"ফিরাউনের কার্যকলাপ ভাল ছিল না। সে কিয়ামতের দিনে তার সম্প্রদায়ের অগ্রভাগে থাকবে এবং সে তাদের নিয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। যেখানে তারা প্রবেশ করবে তা কত নিকৃষ্ট স্থান! এ দুনিয়ায় তাদের অভিসম্পাতগ্রস্ত করা হয়েছিল এবং অভিসম্পাত হবে কিয়ামতের দিনেও। কত নিকৃষ্ট সে পুরস্কার যা তারা লাভ করবে।" [সূরা হূদ ঃ ৯৭-৯৯]

মুসলিম বিশ্বে জাহেলিয়াতপ্রীতি

কিন্তু শুধু পাশ্চাত্য দর্শন ও পশ্চিমা ধ্যান-ধারণার কারণে অধিকাংশ মুসলিম দেশ ও জনগোষ্ঠী ইসলামপূর্ব জাহেলিয়াতের সনাতন যুগ ও সভ্যতা-সংস্কৃতিকে মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখে তার দিকে আনন্দের সাথে ধাবিত হচ্ছে এবং জাহেলীপনা ও তার রূপকার আত্মোৎসর্গকারী রাজা-বাদশাহ রথী-মহারথীদেরকে পুনরুদ্ধারে অধিক আগ্রহী যেন সেটি ছিল স্বর্ণযুগ এবং এমন এক নিয়ামত যা ইসলাম হারাম করে দিয়েছে! আর এর নামেই ফুটে উঠেছে ইসলামের মত নিয়ামতকে অবমূল্যায়ন, প্রিয় নবী মুহাম্মদ (সা)-এর অনুগ্রহকে অস্বীকার করার কথা। সেই সাথে এটাই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, তাদের কাছে কুফরীর ও মূর্তি পূজার বিপদ এবং জাহেলিয়াতের মাঝে যে সব কুসংস্কার, অজ্ঞতা, ভ্রষ্টতা, নির্বুদ্ধিতা ও হাসি-কান্নার যে সব ভয়ংকর দিক রয়েছে তা কতই না হালকা, যা একজন রক্ষণশীল মুসলমানের ক্ষেত্রে মেনে নেওয়া যায় না! সেই সাথে ইসলামের মত নিয়ামত হতে মাহ্‌রূম হওয়া, ঈমান চলে যাওয়া এবং আল্লাহর ক্রোধের আশংকা রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَلَا تَرْكَنُوْٓا اِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ - وَمَا لَكُمْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ اَوْلِيَاۤءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُوْنَ -

"যারা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছে তাদের প্রতি তোমরা ঝুঁকে পড়ো না। ঝুঁকলে তোমাদের অগ্নি স্পর্শ করবে এবং সে অবস্থায় তোমাদের জন্য আল্লাহ ব্যতীত কোন সাহায্যকারী থাকবে না এবং তোমাদেরকে কোন সাহায্য করা হবে না।" [সূরা হূদ–১১৩]

এর সাথে আরো সংযোজন করা যেতে পারে ঐ সকল ঘটনাপ্রবাহ যা আজ প্রতীক্ষা করা যাচ্ছে মুসলিম দেশগুলোতে, বিশেষত সম্পদশালী হওয়ার অধিক

প্রবণতা এবং এ ক্ষেত্রে ইসলামী মূল্যবোধ বিসর্জন দেওয়া ও আখেরাতের পরিবর্তে দুনিয়াকে অগ্রাধিকার দেওয়া, দুনিয়াতে চিরস্থায়ীভাবে বসবাসের সাজ-সরঞ্জাম তৈরি করা, প্রবৃত্তির পিছে লাগামহীনভাবে ছুটতে থাকা, হারাম কাজে লিপ্ত হওয়া, অভিজাত শ্রেণীতে মদ ও বেহায়াপনার সয়লাব যেন সমগ্র মুসলিম জগতে এক ব্যক্তি ও একই চেহারা তবে আল্লাহ যাকে হেফাজত করেছেন সে ছাড়া। আর এমন লোকের সংখ্যা খুবই নগণ্য। তাদের অবস্থা হলো এমন যে, তারা যেন ইসলামী রীতিনীতি ও ফরয কাজসমূহ থেকে পূর্ণ স্বাধীন। তাদের সাথে ইসলাম ও শরী'আতের সাথে কোন সম্পর্ক নেই। তাদের কাছে ইসলাম একটি বিলুপ্ত শরী'আত ও কল্পকাহিনীর নামান্তর।

সময়ের বড় দাবী বড় জিহাদ

এটাই হলো মুসলিম বিশ্বের মোটামুটি ধর্মীয় চিত্র। আর এটা এমন একটি জোয়ার যা মুসলিম বিশ্বের এক প্রান্ত হতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত সব কিছু পরিষ্কার করে দিয়েছে। এটা এমন এক মহাটর্নেডো যার সম্মুখীন ইসলাম তার দীর্ঘ ইতিহাসে আর কখনো হয়নি। এ টর্নেডো তার শক্তি, ব্যাপকতা ও সমাজে তার প্রভাবের দিক থেকে ইসলামের জানা অতীতের সকল টর্নেডোর ওপর জয়লাভ করেছে এবং এর বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, এর ক্ষতিকর দিকগুলো সম্পর্কে অবগত মানুষ খুবই অল্প। আর যে এর বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করবে এবং নিজের শক্তি-সামর্থ্য বিলীন করে দেবে এমন লোক নিতান্তই নগণ্য। কারণ ইতোপূর্বেও গ্রীক দর্শনের কারণে ধর্মবিমুখিতা ও ধর্মদ্রোহিতা প্রকাশ পেয়েছিল। কিন্তু তার বিরুদ্ধে নিজের গভীর প্রজ্ঞা, অতুলনীয় সেবা, পাণ্ডিত্যময় জ্ঞান-গরিমা, ব্যাপক পড়ালেখা ও তার শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব দিয়ে জিহাদ ঘোষণাকারী পাওয়া গিয়েছিল। যে সময় বাতিনী ফেরকা নাস্তিক্যবাদ জন্ম দিয়েছিল, তখন জ্ঞান-বিজ্ঞান ও যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা তার বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণাকারীর আবির্ভাব ঘটেছিল। ফলে ইসলাম তার মেধাগত শক্তি আর জ্ঞান-বিজ্ঞানের জ্যোতি নিয়ে এমনভাবে সংরক্ষিত হয়েছিল যে, প্রতিটি আঘাতকারী ঢেউ, জোয়ার ও প্লাবন ব্যর্থ হয়ে ফিরে গিয়েছিল।

বর্তমান মুসলিম জাতির সমস্যা শুধু নৈতিক অবক্ষয়, ইবাদতে দুর্বলতা, ইসলামী ঐতিহ্যকে বিসর্জন দেওয়া এবং বিজাতীয় সভ্যতা গ্রহণ করাই নয়। নিঃসন্দেহে এটা একটা সমস্যা এবং এর প্রতিকার করার জন্য চেষ্টা-প্রচেষ্টা হওয়া প্রয়োজন। তবে বর্তমান মুসলিম বিশ্বের অতি নাযুকও বৃহৎ সমস্যা হলো কুফরী ও ঈমানের সমস্যা। ইসলামের ওপর টিকে থাকা অথবা ইসলাম ত্যাগ করার সমস্যা। এখন দ্বন্দ্ব হলো পাশ্চাত্যের ধর্মহীন দর্শন ও আখেরী রিসালত ইসলামের মাঝে এবং বস্তুবাদ ও আসমানী শরী'আতের মাঝে। হয়ত এটা ধর্ম ও ধর্মহীনতার মাঝে শেষ যুদ্ধ যা দুনিয়ার স্থিতিশীলতার জন্য চ্যালেঞ্জ।

সুতরাং আজকের বড় জিহাদ ও নবুওয়তী দায়িত্ব, বড় নেকীর কাজ এবং উত্তম ইবাদত হলো এ ধর্মহীন টর্নেডোর মুকাবিলা করা যা মুসলিম বিশ্বকে উজাড় করে দিয়েছে এবং তার দিল, দেমাগ ও প্রাণকেন্দ্রে আঘাত হেনেছে। মুসলিম যুব সমাজ ও শিক্ষিত শ্রেণীর কাছে ইসলামের মূলনীতি, আকীদা-বিশ্বাস, ইসলামের শাশ্বত পয়গাম ও রিসালতে মুহাম্মদীয়ার প্রতি হারানো আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে দেওয়া এবং ইসলাম সম্পর্কে তাদের মন-মস্তিষ্কে যে সব সংশয়-সন্দেহের ধূম্রজাল রয়েছে, মননশীল সুন্দর ও প্রজ্ঞাপূর্ণ যুক্তিতর্কের মাধ্যমে তা দূর করা এবং জাহেলী সভ্যতাকে যা তাদের দিল–দেমাগে গভীর প্রভাব ফেলেছে এবং তাদের চিন্তা-চেতনার ওপর জয় লাভ করেছে, গবেষণার মাধ্যমে প্রতিহত করা, ইসলামের সৌন্দর্য এমনভাবে তুলে ধরা যাতে তাদের দিল ও দেমাগ, চিন্তা-চেতনা এ দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং সেখানেও ইসলামপ্রীতি স্থান করে নেয় ঈমান ও উদ্দীপনার সাথে।

একটি নাযুক মুহূর্ত

আমাদের ওপর দিয়ে এমন এক শতাব্দী অতিবাহিত হয়েছে যে, ইউরোপ আমাদের মেধা ও যুব সমাজকে অপহরণ করে নিয়ে গিয়েছে এবং আমাদের দিল ও দেমাগে সন্দেহ, নাস্তিকতা, বিশ্বাসঘাতকতা, ঈমান ও গায়েবী শক্তির প্রতি অনাস্থার বীজ বপন করে দিয়েছে। তদস্থলে নতুন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দর্শনের প্রতি পূর্ণ আস্থা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। অন্যদিকে আমরা তাদের মুকাবিলা করা হতে গাফেল হয়ে আমাদের কাছে যা কিছু আছে তাতে আত্মতৃপ্তি বোধ করি এবং নতুন নতুন আবিষ্কারের ক্ষেত্রে অকেজো হয়ে পড়েছি। তাদের দর্শন, মতবাদ, ব্যবস্থাপনাকে বোঝা এবং বুঝে তাত্ত্বিক পর্যালোচনা করে দক্ষ ডাক্তারের মত অপারেশন করা প্রয়োজন মনে করিনি, বরং যা কিছু হয়েছে তা হলো তাড়াহুড়া করা কিছু অসার ও আমাদের পুরাতন গবেষণার ওপর। ফলে শতাব্দীর এ দ্বার প্রান্তে এসে আমরা এক ভয়ানক পরিস্থিতির সম্মুখীন হলাম যে, মুসলিম বিশ্ব আজ ঈমান-আকীদার ক্ষেত্রে নড়বড়ে। আর মুসলিম বিশ্বের রাষ্ট্র ক্ষমতায় এমন এক প্রজন্ম অধিষ্ঠিত যারা ইসলামের মৌলিক আকীদা-বিশ্বাসের ওপর আস্থা রাখে না। তার জন্য কোন উৎসাহ-উদ্দীপনা নেই। দীনদার মুসলমানদের সাথে তার সম্পর্ক হলো মুসলিম জাতি হিসাবে বা কোন রাজনৈতিক স্বার্থের কারণে। ধর্মহীন আর এ ধ্যান-ধারণা ও মানসিক অবস্থা সর্বস্তরের জনগণের কাছে পৌঁছে গেছে সাহিত্য-সংস্কৃতি, সাংবাদিকতা ও রাজনীতির মাধ্যমে। ফলে এ মুসলিম সমাজ যার মাঝে আছে সব ধরনের কল্যাণ ও যোগ্যতা, বরং মুসলিম জাতিই হলো বিশ্ব জনগোষ্ঠীর মাঝে অধিকতর যোগ্যতাসম্পন্ন জাতি, ঐ শ্রেণীর মানুষের গোলামে পরিণত হয়েছে তাদের সভ্যতা-সংস্কৃতি, মেধা ও প্রভাব- প্রতিপত্তির কারণে।

সুতরাং যদি এ অবস্থা দীর্ঘস্থায়ী হয় তাহলে ধর্মহীনতা ও ফাসাদ এ উম্মতের প্রতিটি ঘরে ঘরে পৌঁছে যাবে। পৌঁছে যাবে ঐ সকল মানুষের কাছেও যারা কল-কারখানা, ক্ষেত-খামার করে বা গ্রাম-পল্লীতে বসবাস করে। ফলে তারাও ধর্মহীনতা ও নাস্তিকতার পথে পা বাড়াবে। ফলে ইউরোপে যা ঘটেছে এশিয়ার দেশগুলোতে তার পুনরাবৃত্তি ঘটবে, যদি এ অবস্থা চলতে থাকে এবং আল্লাহ্‌র অন্য কোন এরাদা না থাকে।

প্রয়োজন ইসলামী দাওয়াত

আর এ কারণে ইসলামী জগত এক নতুন ইসলামী দাওয়াতের প্রয়োজন অনুভব করছে। আর এ দাওয়াত ও কর্মীদের স্লোগান হবে "এসো! ইসলামের দিকে নতুনভাবে।" এ ক্ষেত্রে শুধু স্লোগানই যথেষ্ট নয়, বরং কাজের পূর্ব শর্ত হলো দৃঢ় সংকল্প ও স্থির গভীর ভাবনা যে, কিভাবে আমরা এ শিক্ষিত শ্রেণীর কাছে নতুন উদ্দীপনা নিয়ে পৌঁছতে পারি। তাদের মাঝে প্রজ্জ্বলিত করা যায় ঈমানের স্ফুলিঙ্গ, ইসলামের প্রতি আত্মবিশ্বাস। কিভাবে আমরা তাদেরকে মুক্ত করতে পারব পাশ্চাত্য দর্শন, বর্তমান সভ্যতা ও তাদের ধর্মহীন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে যাদের হাতে আছে বর্তমান রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও জীবনের চালনা শক্তি।

এ দাওয়াতের জন্য এমন সব লোকের প্রয়োজন যারা এর জন্য তাদের জ্ঞানগত যোগ্যতা, শক্তি-সামর্থ্য সব কিছুকে বিসর্জন দিতে সক্ষম এবং এর বিনিময়ে পদমর্যাদা, ইজ্জত বা সম্মান, চাকুরি, রাষ্ট্র ক্ষমতার আশা করে না। কারোর হিংসা পোষণ করে না, বরং তারা মানুষের কল্যাণকামী, কিন্তু মানুষের থেকে কোন কল্যাণ কামনা করে না। তারা দান করতে জানে, গ্রহণ করতে জানে না। যে জিনিষের প্রতি মানুষ লোভনীয় এবং জীবন বাজি রাখে তার পাওয়ার জন্য প্রতিযোগিতা করে না যাতে তাদের বিরুদ্ধে কোন দলীল-প্রমাণ না থাকে এবং শয়তানের কোন পথ না থাকে। ইখলাস হলো তাদের সম্বল; প্রবৃত্তি পূজা, আত্মপছন্দ এবং সব ধরনের জাতীয়তা প্রতি হতে তারা হবে মুক্ত।

প্রয়োজনে নতুন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের

বর্তমান মুসলিম বিশ্বের প্রয়োজন এমন এক গবেষণা প্রতিষ্ঠান যার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হলো শক্তিশালী ইসলামী সাহিত্য উপহার দেওয়া যার মাধ্যমে শিক্ষিত যুব সমাজকে নতুনভাবে সার্বজনীন ইসলামের দিকে ফিরিয়ে আনা যাবে, যা তাদেরকে মুক্ত করবে পাশ্চাত্যের গোলামী থেকে যার প্রতি অনেকে জেনে বুঝে আত্মসমর্পণ করেছে। আর অধিকাংশ কালের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েছে যা তাদের চিন্তা-চেতনায় নতুনভাবে ইসলামের বুনিয়াদকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবে এবং তাদের হৃদয়-আত্মার খোরাক হবে। এ কাজের জন্য মুসলিম দুনিয়ার প্রান্তে প্রান্তে এমন

সব দৃঢ় চেতনা এ ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন যারা এ লড়াই-এর ময়দানে আত্মোৎসর্গ করতে প্রস্তুত।

আমার দৃষ্টিভঙ্গি

আমি আমার ব্যাপারে স্পষ্ট করে বলতে চাই যে, আমি আমার জীবনের কোন সময়ে ঐ সকল লোকের দলভুক্ত নই যারা দীন ও রাজনীতির মাঝে বিভাজন সৃষ্টি করে। আর না তাদের দলভুক্ত যারা পূর্বেকার সকল ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ থেকে সরে যেয়ে ইসলামের এমন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে যার কারণে ইসলাম যে কোন সমাজ ব্যবস্থায় এবং যে কোন অবস্থার সাথে, চাই তা ইসলাম থেকে যত দূরে সরে গিয়েই হোক না কেন, সংঘাতময় নয় এবং সব ধরনের সমাজ ব্যবস্থার সাথে খাপ খায়। তাদের সাথেও কোন সম্পর্ক নেই যারা রাজনীতিকে কুরআনে উল্লিখিত "অভিশপ্ত বৃক্ষ" الشجرة الملعونة فى القران মনে করেন, বরং আমি ঐ সকল লোকের প্রথম কাতারে যারা মুসলিম জাতির মাঝে বিশুদ্ধ রাজনৈতিক চেতনা উজ্জীবিত করার প্রত্যাশী এবং প্রতিটি রাষ্ট্রের শাসন ক্ষমতায় যোগ্য নেতৃত্ব সৃষ্টি করার অভিলাষী। আমি তাদের দলভুক্ত যারা বিশ্বাস করে যে, ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা ততক্ষণ কায়েম হতে পারে না যতক্ষণ না ইসলামী নেতৃত প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ইসলামী আইনই রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থার বুনিয়াদ হয়। আমি আমরণ এর একজন একনিষ্ঠ প্রবক্তা। মূলত সমস্যা হলো আগে-পিছে করা ও তরতীব দেওয়া এবং অবস্থা, পরিবেশ ও দীনী হেকমতের চাহিদা ও দাবি উপলব্ধি করা।

একটি অভিজ্ঞতা

বরং বাস্তব অবস্থা হলো, আমাদের সকল চেষ্টা-প্রচেষ্টা, আমাদের সকল যোগ্যতা, সমস্ত উপায়-উপকরণ ও মূল্যবান সময় রাজনৈতিক আন্দোলনের লক্ষ্যেই পরিচালিত হয়। আন্দোলন ও নির্বাচনের সময় আমরা একথা মনে করি, আমরা জাতিগতভাবে মুসলমান এবং আমাদের যারা নেতৃত্ব দিচ্ছে এবং যাদের হাতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা– নিঃসন্দেহে যারা শিক্ষিত সমাজ–তারা পূর্ণ মুসলমান, ইসলামের মহত্তম মর্যাদা, তারা আকীদা-বিশ্বাস ও তার নেতৃত্বের প্রতি পূর্ণ আস্থাশীল এবং ইসলামের মর্যাদা বৃদ্ধি ও তার দণ্ডবিধি প্রয়োগ করতে তারা দৃঢ় প্রত্যয়শীল। অথচ বাস্তবতা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। সামগ্রিকভাবে আজ তাদের মাঝে ঈমানী দুর্বলতা ও আমলের ত্রুটিতে ছেয়ে গেছে। কিন্তু এ ব্যাপারে আমরা কোন খোঁজ-খবর রাখি না এবং জনসাধারণের মাঝে কোন চেতনা নেই। অন্য দিকে শিক্ষিত সমাজের অধিকাংশই এমন যাদের থেকে পাশ্চাত্য সভ্যতা-সংস্কৃতি, জীবনধারা ও রাজনীতির প্রভাবে ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস হারিয়ে গেছে, বরং তাদের অনেকেই এমন যারা প্রকাশ্যেই ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং পাশ্চাত্য জীবন দর্শন, তাদের

চিন্তাধারা, আকীদা-বিশ্বাস প্রাণ দিয়ে ভালবাসে! তার সাহায্য-সহযোগিতা ও প্রচার-প্রসারের ক্ষেত্রে উন্মাদ, উৎসর্গকারী। তারা চাই পাশ্চাত্যের জীবন দর্শনের ভিত্তিতে ও তার আলোতে জীবন যাপন করবে এবং জনগণের সাথে মেলামেশা করবে। অতঃপর তাদের কেউ এ ক্ষেত্রে দ্রুত গতির পক্ষপাতিত্ব, আবার কেউ অভিজ্ঞ ধীরস্থির। আবার কেউ শক্তি ও ক্ষমতা দিয়ে সমাজের ওপর এ ব্যবস্থাকে চাপিয়ে দিতে চায়। আবার কেউ চিত্তাকর্ষক মনমাতানো পদ্ধতিতে একে মানুষের সামনে উপস্থাপন করতে চায়। বস্তুত তাদের সকলের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন।

ধর্মীয় ব্যক্তিবর্গ দু'দলে বিভক্ত

অন্যদিকে আমাদের ধর্মীয় ব্যক্তিবর্গ, যদি ধর্মীয় ব্যক্তিবর্গ বলা বৈধ হয়, কারণ ইসলামে ধর্মযাজক বা ধর্মীয় ব্যক্তি বলে কোন দল নেই, দু'দলে বিভক্ত হয়ে আছে। একদল যারা পাশ্চাত্য সভ্যতার সামনে আত্মসমর্পণ করেছে। আরেক দল আছে, তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে, তাদেরকে কাফের মনে করে, তাদের সাথে দূরত্ব বজায় রাখে এবং এ ধর্মহীন মনোভাব ও সভ্যতা-সংস্কৃতির কারণ খতিয়ে দেখতেও চায় না। তাদের সংশোধন করা ও ইসলামের সাথে এ সংঘাতময় অবস্থার পরিবর্তন করার চেষ্টা করে না। তাদের সাথে মেলামেশার মাধ্যমে ইসলাম ও দীনী ব্যক্তিবর্গের প্রতি ভীতি ও অশ্রদ্ধাবোধ দূর করে তাদের কাছে যা কিছু ঈমান ও আমল আছে তাকে চাঙ্গা করা এবং শক্তিশালী আবেদনশীল ইসলামী সাহিত্য প্রণয়ন করে তাদের মানসিক খোরাক দেওয়া, দীনী চেতনা জাগরিত করা, তাদের ধন-সম্পদ শক্তি-সামর্থ্য, ক্ষমতা-পদমর্যাদা ও জীবনোকরণের প্রতি বিমুখতা প্রদর্শন করে তাদের ইসলামের মূল্যবোধ ও ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তোলা, দরদ ও ব্যথা নিয়ে তাকে প্রজ্ঞাপূর্ণ নসীহত করার প্রয়োজন মনে করে না।

আর অন্য দল তাদের সহযোগিতা করে, তাদের ধন-সম্পত্তিতে শরীক হয়, তাদের দুনিয়া থেকে উপকৃত হয়, এ নৈকট্য ও সহযোগিতার ওপর ভিত্তি করে তাদেরকে দীনী কোন কল্যাণ দেওয়ার ফিকির নেই। ফলে এদের মধ্যে না আছে কোন দাওয়াত, না আছে কোন আকীদা, না আছে ধর্মীয় অনুভূতি, না আছে ইসলামের কোন ফিকির, কোন দীনী পয়গাম।

প্রয়োজন দিলে দরদেমন্দ

এ প্রেক্ষিতে প্রয়োজন এমন এক জামাত যারা এ অবস্থার ওপর ব্যথিত হবে, কষ্ট বোধ করবে এবং এ কথা মনে করবে যে, আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত শ্রেণী অসুস্থ, চিকিৎসার মাধ্যমে ভাল হতে পারে এবং তারা সুস্থ হতে প্রস্তুত। সুতরাং

তারা তাদের কাছে হিকমত ও কোমল ব্যবহারের মাধ্যমে দাওয়াত পৌঁছায়, নিঃস্বার্থ নসীহত করে যা ছিল তাদের হারানো সম্পত্তি। কারণ এ শ্রেণীর মানুষ দীন ও দীনী পরিবেশ হতে ছিল বিচ্ছিন্ন। তারা জীবন যাপন করত দীন থেকে দূরে সরে এবং দীনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে। ফলে তাদের দীন ও দীনী পরিবেশের সাথে দূরত্ব বেড়ে গেছে। তাদের এ অবস্থা আরো বাড়িয়ে দেয় এক শ্রেণীর দীনদার মানুষ যারা তাদের বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান নেয়। তাদের থেকে নেতৃত্ব কেড়ে নিতে চায় এবং তাদের পদমর্যাদা ও সম্মান অধিকার করতে প্রতিযোগিতা করে। ফলে এ অবস্থা দীনের প্রতি ভয় ও হিংসার সৃষ্টি করে। কারণ মানুষের স্বভাব হলো, যদি সব দুনিয়াদার হয় তাহলে যে তার দুনিয়া অধিকার করতে চায় তাকে ঘৃণা করা। যদি ক্ষমতা ও নেতৃত্বের লোভী হয়, তাহলে যে তার এ ময়দানে তার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে তাকে সে বাঁকা চোখে দেখবে। আর যদি সে ভোগ বিলাসী ও প্রবৃত্তির গোলাম হয়, তাহলে যে তার প্রতি চ্যালেঞ্জ করবে তার প্রতি সে ক্ষিপ্ত হবে।

আজ মুসলিম বিশ্বের প্রয়োজন এমন এক জামাত যারা হবে সকল প্রকার লোভ-লালসার উর্ধ্বে, নিঃস্বার্থ ধর্ম প্রচারক। তারা এমন ধারণার উর্ধ্বে যে, তাদের উদ্দেশ্য হলো নিজের জন্য বা আত্মীয়-স্বজনের জন্য বা নিজ দলের জন্য সম্পদ হাসিল করা বা রাষ্ট্রক্ষমতা কুক্ষিগত করা নয়, বরং তারা মানসিক ও চিন্তাগত ঐ সকল জটিলতা সংশয় সন্দেহ দূর করে দেবে যা পাশ্চাত্য দর্শন, সভ্যতা-সংস্কৃতি বা ধর্মীয় ব্যক্তিদের ভুলের কারণে বা ভুল বোঝাবুঝির কারণে সৃষ্টি হয়েছিল অথবা ইসলাম ও ইসলামী পরিবেশ থেকে দূরে থাকার কারণে জন্ম নিয়েছিল। আর এ সংশয় ও জটিলতা নিরসনের মাধ্যম হলো শক্তিশালী কল্যাণকর ইসলামী সাহিত্য রচনা, ব্যক্তিগত সুসম্পর্ক, পরিচ্ছন্ন ও মননশীল আখলাক-চরিত্র, ব্যক্তিত্বের প্রভাব, দুনিয়াবিমুখিতা ও নির্লোভ মানসিকতা এবং পয়গম্বর ও তাঁদের উত্তরসুরিদের চরিত্র মাধুর্য।

এরাই হলো সফল জামা'আত

বস্তুত এই হলো এমন এক জামা'আত যারা প্রতিটি যুগে ইসলামের সঠিকভাবে খেদমত করেছে। উমাইয়া শাসনের গতিধারা পাল্টে দেওয়া এবং খলীফারূপে হযরত ওমর ইবন আবদুল 'আযীয (র)-এর আত্মপ্রকাশ ও তাঁর সফলতার পেছনে এ জামাতেরই অবদান। আবারও এই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটে মহান মোগল বাদশাহ জালালুদ্দীন আকবরের শাসনামলে। যে আকবর বাদশাহ ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল এবং দৃঢ় সংকল্প নিয়েছিল চার শত বছর ইসলামী শাসনে লালিত-পালিত ইসলামী রাষ্ট্র ভারতকে ব্রাহ্মণ্যবাদী জাহিলিয়তের দিকে নিয়ে যেতে। কিন্তু প্রজ্ঞাময় এ জামাতের কারণে ও মহান ইসলামী সংস্কারক

মুজাদ্দিদে আলফেছানী ও তাঁর ছাত্রদের প্রভাব, হেকমত, দক্ষতা, বিচক্ষণতা ও দাওয়াতের কারণে সেদিন ইসলাম আকবরের হাত হতে মুক্তি পেয়েছিল, বরং ভারতে আগের থেকে অধিক শক্তিশালী ও সুন্দরভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আর আকবরের রাজসিংহাসনে তার এমন সব উত্তরসুরি অধিষ্ঠিত হয়েছিল যাঁরা পূর্বসুরিদের তুলনায় অধিকতর ভাল ও ইসলাম পছন্দ ছিলেন। অবশেষে তার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হলেন আওরঙ্গযেবের মত এমন এক মহান ব্যক্তি যাঁর আলোচনা ইসলাম ও ইসলামী ইতিহাসের জন্য গর্ব ও সৌন্দর্যের প্রতীক।

আর দেরী নয়

সুতরাং দাওয়াতের এ দায়িত্ব এমন এক অপরিহার্য দায়িত্ব যা পালনে একদিন দেরী করাও সম্ভব নয়। কারণ ইসলামী জগৎ প্রতিনিয়ত এমন মারাত্মক বিভীষিকাময় রিদ্দতের (ধর্মত্যাগের) মুখোমুখি হচ্ছে যা ভাইরাসের মত ছড়িয়ে পড়েছে মুসলিম উম্মাহের প্রিয় সন্তান ও শক্তিশালী অংশের মাঝে। নিঃসন্দেহে রিদ্দতের এ ঘটনা ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস ও নীতি-নৈতিকতার বিরুদ্ধে একটি বিদ্রোহ। সুতরাং রসূল (সা)-এর মীরাছ, প্রজন্ম-পরম্পরায় পাওয়া এ মূলধন-আকীদা-বিশ্বাস ও নীতি-নৈতিকতা যা হেফাজতের জন্য ইসলামের বীর সৈনিকেরা মরণপণ সংগ্রাম করেছে, যদি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে মুসলিম বিশ্বের অস্তিত্বও বিলীন হয়ে যাবে।

অতঃপর যাদেরকে ইসলামের এ নাযুক পরিস্থিতি ভাবিয়ে তুলেছে তারা যেন এ বাস্তব বিষয়টি গুরুত্ব ও অধ্যবসায়ের সাথে গ্রহণ করেন।

চারিত্রিক মূল্যবোধ হৃদয়ে না থাকলে বাইরের অনুসন্ধান নিষ্ফল

[ভারতের গোরখপুর টাউন হলে ১৯৫৪ ইং সনের ২৭ জানুয়ারী রাতে ভাষণটি প্রদান করা হয়। ভাষণটির শ্রোতা ছিলেন শহরের শিক্ষিত মুসলমানসহ বিভিন্ন ধর্মের মানুষ।]

একটি গল্প

শৈশবে একটি গল্প শুনেছিলাম। গল্পটি হলো, একবার এক ভদ্রলোক রাস্তায় কিছু একটা খুঁজছিলেন। লোকজন তাকে জিজ্ঞেস করল, "জনাব! আপনি কি কিছু তালাশ করছেন?" তিনি উত্তর দিলেন, "পকেট থেকে কিছু আশরাফী (স্বর্ণ মুদ্রা) পড়ে গেছে, সেগুলোই তালাশ করছি।" কয়েকজন সুহৃদয় ব্যক্তি তাকে সহযোগিতা করার ইচ্ছা নিয়ে তার সঙ্গে আশরাফী অনুসন্ধানে লেগে গেল। কিছুক্ষণ পর একজন জিজ্ঞেস করল, "জনাব! আশরাফীগুলো কোথায় পড়েছিল?" তখন ভদ্রলোক উত্তরে বললেন, "সেগুলো তো পড়েছিল ঘরের ভেতরেই, কিন্তু মুশকিল হলো যে, ঘরে আলো নেই। রাস্তায় আলো আছে তো, তাই ঘরের পরিবর্তে রাস্তায় খুঁজছি।"

মানুষের আরামপ্রিয়তা

বাহ্যত এ কাহিনীটাকে একটি কাহিনী কিংবা কৌতুক মনে হতে পারে। কিন্তু ঘটনাবহুল পৃথিবীর দিকে তাকালে এমনটিই দৃষ্টিগোচর হয়ে থাকে, যে বস্তু ঘরে হারিয়েছে তার সন্ধান চলছে বাইরে। গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলোতে আজ এমনটিই হচ্ছে। ঘরের জিনিস খোঁজা হচ্ছে বাইরে। কোন বস্তু হারিয়েছে নিজের অভ্যন্তরে, কিন্তু তালাশ হচ্ছে তার বাইরে। যুক্তি হলো, বাইরে আলো আছে, ঘরে আলো নেই; ভেতরে অন্ধকার। তাই বাইরে খোঁজ করা সহজসাধ্য। বিপরীত পন্থায় এ রকম বহু কিছুর অনুসন্ধান আজ হচ্ছে বিভিন্ন কমিটি ও জলসায়। প্রশান্তি, নিরাপত্তা, প্রসন্নতা ভেতরের বস্তু। কিন্তু এগুলোর অনুসন্ধান চলছে বাইরে। মানবতার ভাগ্য অভ্যন্তরীণভাবেই বিড়ম্বনার শিকার। কিন্তু তা পুনর্গঠনের প্রচেষ্টা চলছে বাইরে। যেই নিরাপত্তাবোধ, প্রশান্তি ও চিত্তে প্রসন্নতার প্রয়োজন আমাদের, যে ভালোবাসা, সহানুভূতি ও নৈতিকতার প্রয়োজন আমাদের ও আপনাদের এবং জীবনের যেই মূল্যবান পুঁজি আজ নিখোঁজ হয়ে আছে, এর সব কিছুই হারিয়েছে আমাদের হৃদয়ের রাজ্যে। হৃদয়ের ভেতরে আজ অন্ধকার। সেখানে আমাদের পদচারণা নেই। এ কারণেই এগুলোর অনুসন্ধান করছি আমরা বাইরে। আমরা নিজেদের ওপর যে

বড় অবিচারটি করেছি সেটি হচ্ছে এই, প্রথমে আমরা হৃদয়ে প্রবেশের পথ হারিয়ে ফেলেছি এবং আজ সেই হৃদয়ের জিনিসগুলোও খোঁজ করছি বাইরে। আজকের পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে এ নাটকই মঞ্চস্থ হচ্ছে। অন্তররাজ্যে অন্ধকার; বহুকাল যাবৎ সেখানে ঘোর অমানিশা। হাতে হাতে এই অমানিশা দূর হয় না। মানবীয় স্বভাব হলো আরামপ্রিয়তা। মানুষ কখনো অন্তরের ভেতরে ডুব দিয়ে হারিয়ে যাওয়া মূল্যবান বস্তুটি তালাশ করে বের করে আনার মত যাতনা সহ্য করতে চায়নি। বাইরের আলোয় নিজের হারানো বস্তুটির অনুসন্ধানকে মানুষ সহজ মনে করে থাকে। আজ জাতি-গোষ্ঠী ও গোত্রগুলো অস্থির। বড় বড় দার্শনিক ও বুদ্ধিজীবী মাথা কাৎ করে দিয়েছেন। কিন্তু তাদের সন্ধানে মিলছে না, আমাদের হারানো সম্পদটা কোথায়? লোকজন যখন দেখল, হৃদয়ের দরজা পাওয়া যাবে না, তাতে প্রবেশও সম্ভব নয় এবং সে হৃদয়ের আলোকিত ও উত্তপ্ত করার উপাদানও আমাদের কাছে নেই, তখনই তারা মস্তিষ্কের দিকে মনোযোগ দিল। মানুষের বিদ্যা বাড়তে শুরু করল। যে বিষয়টি সহজবোধ্য ছিল, সেটিই করতে লাগল। মস্তিষ্ক পর্যন্ত পৌছা সহজ ছিল, তাই অন্তর ছেড়ে দিয়ে মানুষ মস্তিষ্কের পথ অবলম্বন করে চলেছে।

আজ সকলেই সে কাফেলার অংশীদার। যে-ই আসছে, সেখানেই যাচ্ছে; অন্তরের ভেতরে পৌছার কোন প্রচেষ্টা নেই। দুনিয়ার অবস্থান যতক্ষণ পর্যন্ত স্বস্থানে না ফিরে আসবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সংশোধন অসম্ভব। ঘরে অন্ধকার থাকলে বাইরে থেকে আলো সংগ্রহ করতে হবে এবং ঘরের হারানো পুঁজি ও মনের লুণ্ঠিত সম্পদ ঘরে আর মনেই তালাশ করতে হবে। যদি এমনটি করা না হয়, তবে জীবন ফুরিয়ে যাবে, তথাপি হারিয়ে যাওয়া বস্তুর কোনই খোঁজ পাওয়া যাবে না।

বাস্তবতা থেকে কিশতী নড়ানো যায় না

আজ তাই প্রয়োজন ছিল বাস্তববোধ জাগিয়ে তোলার, এই বাস্তবতার অনুসন্ধান মানব জীবনের লক্ষ্য হিসাবে ঘোষণা করার। এর ফলে পারস্পরিক সম্পর্ক সঠিক হতো, পশুর স্তর থেকে মানুষ হতো উন্নত, জন্ম হতো একজনের প্রতি অন্যজনের ভালোবাসা, একের জন্য অন্যের আত্মোৎসর্গের প্রেরণা বিবেচনা করত একজন অন্যজনকে ভাইরূপে; বন্ধ হতো প্রতিদ্বন্দ্বিতার দৃষ্টি, নির্ভরতা ও ভালোবাসার চোখ সৃষ্টি হতো। কিন্তু এ বাস্তবতা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। সবচেয়ে বড় বাস্তবতা ও যাবতীয় বাস্তবতার প্রাণ এই ছিল, এই দুনিয়া নামক কারখানাটি কে বানিয়েছেন, সে প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান। এই কারখানাটি যথার্থভাবে চলতে পারে একমাত্র তাঁর মর্জি ও নির্দেশনা অনুযায়ী। যদি তাঁর সাথে লড়াই করার প্রচেষ্টা চালানো হয় এবং তাঁর নির্দেশনা অনুযায়ী কর্মকাণ্ড পরিচালিত না হয়, তাহলে কারখানাটি বন্ধ হয়ে যাবে।

ঘড়িকে উদাহরণরূপে গ্রহণ করা যেতে পারে। যিনি এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ তিনিই তার গঠন ও কাঠামো সম্পর্কে সচেতন। তিনিই ঘড়ির সব কিছু ঠিক করতে পারেন। কোন মানুষ যত বড় আলেম, প্রাজ্ঞ, মেধাবী ও দার্শনিকই হোন না কেন, ঘড়ি কিন্তু তার প্রজ্ঞা ও মেধার সাহায্যে ঠিক হবে না। সে চলবে তার বিশেষজ্ঞের পরিচালনায়। এ দুনিয়া যিনি বানিয়েছেন, দুনিয়াটাকে তাঁরই হিদায়াত ও নির্দেশনায় ঠিক ঠিক মতো চলবে। বাস্তবতা থেকে নৌকাকে নড়ানো যায় না। কিশ্‌তী তার গতিপথেই এগিয়ে যেতে থাকবে। তার সামনে মাথা নোয়াতেই হবে।

মানুষ পৃথিবীর ট্রাস্টি

এখন আমি আপনাদের উদ্দেশে নিঃস্বার্থ কিছু কথাবার্তা বলতে চাই। অভিশাপ সেই জীবনের প্রতি, যে জীবনে কখনো সত্য কথা বলা যায়নি। আজ সব মানুষই লাভালাভ লক্ষ্য করে চলে। লাভালাভ সামনে রেখে সত্য-মিথ্যা বলতে সামান্যতম দ্বিধা করে না, পৃথিবীতে এমন মানুষের সংশোধন অসম্ভব। পক্ষান্তরে অল্প সংখ্যক এমন কিছু মানুষ আছেন, যারা জীবনের ওপর ঝুঁকি আসলেও সর্বদাই সত্য উচ্চারণ করে যান। মুষ্টিমেয় এমন ক'জনার জন্যই দুনিয়াটা এখনো টিকে আছে।

আজ পৃথিবীর চেহারায় যে সামান্য আলোকচ্ছটা আর দ্যুতি ঝিলিক দিচ্ছে, তা সেই সত্যকণ্ঠ পয়গম্বর, আল্লাহর প্রেরিত মনীষিগণের কলিজাসেচা খুনের ফসল, যাঁরা মানবতার কল্যাণ ও মানবতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নিজেদের জীবন বিসর্জন দিয়েছেন। এ পবিত্র উত্তরাধিকার ও অমূল্য সম্পদের অধিকারী হয়েছি এখন আমরা। মানবতার মুক্তি সেই আলোকোজ্জ্বল পথেই আসতে পারে যে পথ প্রদর্শন করে গেছেন তাঁরা। আজও যখন আমরা এ সত্য উপলব্ধি করি না যে, দুনিয়া আমাদের জন্য ও আমরা আল্লাহর জন্য, দুনিয়াতে আমরা তাঁর প্রতিনিধি ও আমানতদার; তাঁর সামনে দায়িত্ব সম্পর্কে আমাদের জবাবদিহি করতে হবে, তখন মানবতার সমস্যাগুলোর সমাধান আর সম্ভব নয়। এ পথটি বিপদসংকুল ও কণ্টকাকীর্ণ, কিন্তু এটাই মানবতার পথ। এটি একটি মহান দায়িত্বের বিষয় ছিল। লোকজন তা ভুলে গেছে এবং উদ্ভট সব কালচার ও সভ্যতার নাম আওড়ানো শুরু করে দিয়েছে।

প্রাচীন সভ্যতা ব্যর্থ

পৃথিবীর সকল সভ্যতাই সম্মানযোগ্য, বিশেষত আমাদের দেশের সভ্যতা আমাদের খুবই প্রিয়। এই সভ্যতা আমাদের উত্তরাধিকার এবং আমরা এর মর্যাদা দিয়ে থাকি। কিন্তু মানবতার যথার্থ উন্নয়ন প্রাচীন সভ্যতা দ্বারা হতে পারে না। এগুলোর মাঝে এখন আর প্রাণ নেই। এগুলোর উপযোগিতা শেষ হয়ে গেছে। এগুলো স্ব স্ব মিশন পালন করে ফেলেছে, সমাপ্ত করে গেছে নিজেদের ভূমিকা।

এগুলোর বিভিন্ন অংশ এখনও খুব সুন্দর ও আকর্ষণীয়। কিন্তু আজ মানবতার উন্নয়ন ও ব্যাপক চারিত্রিক ধ্বস ঠেকানোর জন্য এগুলোর মাঝে কোন প্রাণ অবশিষ্ট নেই। এগুলোর কাছে এখন আর কোন দাওয়াত নেই। এক জায়গার বস্তু অন্য জায়গায় প্রয়োগ করা যায় না, তেমনি দু'হাজার বছর আগের নিষ্প্রাণ বিষয় আজকের পরিবেশে কোন প্রভাব রাখতে পারে না। আরবদের প্রাচীন সভ্যতা, রোমান ও গ্রীকদের নিজস্ব সভ্যতা স্ব স্ব কাল ও স্থানে জীবন্ত ও প্রগতিশীলই ছিল কোন কোন বিবেচনায়, কিন্তু এখন সেগুলো তার প্রাচুর্য ও চমক হারিয়ে ফেলেছে। এগুলোর স্থান এখন শুধু প্রাচীন কীর্তির যাদুঘর ও সংগ্রহশালাতেই বিদ্যমান।

সভ্যতা মানবতার পোশাক

মানবতা সভ্যতা উর্ধ্বের বিষয়। এই সকল সভ্যতা একত্র হয়েও মানবতা ও মনুষ্যত্বের জন্ম দিতে পারে না; মনুষ্যত্বই জন্ম দেয় সভ্যতার। মনুষ্যত্ব কোন নির্দিষ্ট সময় ও স্থানের সাথে নির্ধারিত নয়; সভ্যতা তার পোশাক মাত্র। মানুষ তার পোশাক পাল্টাতে থাকে; নিজের বয়স ও রুচির উপযোগী করে সে নিজেকে ক্রমাগতভাবে উপস্থাপন করে যেতে থাকে। বলাই বাহুল্য, এটি নিতান্তই প্রাকৃতিক ও প্রয়োজনীয় একটি বিষয়। শিশুর পোশাক শিশু পরবে এবং যুবকের পোশাক যুবক। শিশুর পোশাক যুবককে পরানো যাবে না। মানবতা ও মনুষ্যত্বকে কোন বিশেষ কাল ও রাষ্ট্রের কালচারের অনুগত করে ফেলবেন না। মানবতাকে এগিয়ে যেতে দিন। আবে হায়াতের প্রস্রবণ হচ্ছে, মানবতা দৌড়ে চলতে চায়, তাকে বাড়তে ও ছড়িয়ে পড়তে দিন। ধর্মের বিশ্বজনীন জীবন্ত নিয়মাবলী, নিজস্ব মেধা ও রুচির সাহায্যে মানবতার একটি নমুনা ও একটি নতুন চিত্র আঁকুন। চারিত্রিক সৌন্দর্যের নতুন একটি পুষ্পস্তবকের জন্ম দিন। সেই পুষ্পস্তবকটিই হবে শ্যামল-সতেজ। যে ফুল শুকিয়ে গেছে, নেতিয়ে গেছে, সেটাকে গলার হার বানাবার চেষ্টা বারবার করবেন না।

ধর্মই দেয় প্রাণ

ধর্ম ও সভ্যতার পথ ভিন্ন । ধর্ম আত্মা দান করে এবং কালচার দেয় একটি ছক (Model)। ধর্ম দেয় জীবন-পদ্ধতি ও একটি মূলনীতি। কিছু নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে, অতঃপর স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেয়। উদাহরণস্বরূপ, কোন কোন সভ্যতার বিবেচনায় কলম হলো পবিত্র, অথচ লেখার কর্মটি লোহার কলমে হবে, নাকি ফাউন্টেন পেনে হবে- এ বিষয়ে ধর্মের কোন আলোচনা নেই। ধর্মের দাবি শুধু এতটুকুই যে, যা লেখা হবে তা যেন সত্য ও কল্যাণকর হয়। ধর্ম জীবনের লক্ষ্য উপহার দেয় এবং উৎসাহিত করে। কালচারের পুনরুজ্জীবন মানুষের মুক্তি নেই, সে পুনরুজ্জীবন কোন হিন্দু কিংবা মুসলিম কিংবা খ্রিস্টান দ্বারাই হোক না কেন।

আজ এ বিষয় নিয়ে ভীষণ বিতর্ক উঠেছে, রাষ্ট্রের ভাষা কি হবে এবং লিপিপদ্ধতি কোন্‌টি অনুসৃত হবে? মনে হচ্ছে, মানবতার সমবেদনার ভিত্তি এগুলোর ওপরই গড়ে উঠেছে! আর রাষ্ট্রের সংশোধনও এ বিতর্ক নিষ্পত্তির মাধ্যমেই সম্ভব। আম্বিয়াগণের চিন্তার পন্থা এ রকম ছিল না। লেখা কোত্থেকে শুরু করা হবে এবং কোথায় শেষ করা হবে, ডান দিকে থেকে শুরু করে বাম দিকে, নাকি বাম দিকে থেকে শুরু করে ডান দিকে, এক্ষেত্রে তাঁদের কোন উৎসাহ ছিল না। তাঁদের উৎসাহ ছিল এই বিষয়ে যে, লেখক যেন সত্যবাদী, আল্লাহভীরু, আমানতদার ও দায়িত্ববান হন। এরপর সে যেভাবেই লিখুক, তা মঙ্গলজনক হবে। বানারসে আমি বলেছিলাম, যদি পাণ্ডুলিপি মিথ্যাচারসম্বলিত হয়, তবে কি ডান দিকে থেকে শুরু করে উর্দূ-ফারসীতে লেখা দ্বারা কিংবা বাম দিকে থেকে শুরু করে হিন্দী-ইংরেজীতে লেখা দ্বারা তা সত্য হয়ে যাবে? মিথ্যা, কৃত্রিম রচনা যে পদ্ধতি ও যেদিক থেকেই লেখা হোক না কেন, তা মিথ্যা, কৃত্রিম ও পাপ হয়েই থাকবে। সত্য রচনা যে পদ্ধতি ও যেদিক থেকেই লেখা হোক, তা সত্যই থাকবে। আম্বিয়াগণ লিপি-পদ্ধতির পেছনে সময় নষ্ট করতেন না। তাঁরা সেই হাত সঠিক বানাতে চাইতেন, যে হাত কলমের সাহায্য গ্রহণ করে, বরং তাঁরা সেই হৃদয়কেই ঠিক করতেন যা সেই হাতকে নির্দেশ করে থাকে।

উপকরণ লক্ষ্য নয়

নিজ নিজ যুগে নতুন নতুন আবিষ্কার যন্ত্র ও মেশিন তৈরি করা আম্বিয়াগণের কাজ ছিল না। তাঁরা মূলত এমন সব মানুষের জন্ম দিতেন যারা এই সব যন্ত্র ও উপাদানকে সঠিক উদ্দেশে সঠিক পথে ব্যবহার করতে সক্ষম হতো। ইউরোপ জন্ম দেয় উপাদান, আম্বিয়াগণ উপহার দিয়েছেন লক্ষ্য ও গন্তব্য। তাঁরা মেশিন গড়েন নি, মানুষ গড়েছিলেন। ইউরোপ তো মেশিন তৈরি করেছে। কিন্তু সেই মেশিনগুলো ব্যবহার করবে কে? পশু স্বভাবের মানুষ? আজ মস্ত বড় বিপদ হলো এই, উপাদান বহু, আবিষ্কার বহু ও সম্পদও বহু; কিন্তু সঠিক পথে ব্যবহাকারী মানুষ আজ দুষ্প্রাপ্য।

সমব্যথী মানুষের প্রয়োজন

মানবতার জন্য আজ বিশ্বাস, আস্থা, সততা, পবিত্রতা, ভালোবাসা, মনুষ্যত্ব, সহানুভূতি ও সমবেদনার ভীষণ প্রয়োজন। এসবের ভিত্তি সভ্যতা কিংবা লিপিপদ্ধতি নয়। এর জন্য প্রয়োজন সমব্যথী, সহানুভূতিশীল মানুষের যারা অন্যের জন্য আত্মবিসর্জন দেয়, নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে আরেকজনকে গড়ে তোলে। লেখা ও সভ্যতায় মানুষের জন্ম হয় না। ইউরোপ আমাদের কাছে থেকে চরিত্র ও আত্মিক মূল্যবোধ ছিনিয়ে নিয়েছে, অথচ এক্ষেত্রে স্বয়ং তারা ছিল শূন্যহস্ত। এখন

আমাদেরও তারা দেউলিয়া বানিয়ে দিয়েছে। তারা তথ্যজ্ঞান ও শিল্প দিয়ে আমাদের পূর্ণ করে দিয়েছে। আমাদের রাত্রিগুলো তারা প্রদীপ দিয়ে আলোকোজ্জ্বল করে দিয়েছে, বিদ্যুতের চমক দিয়ে উজ্জ্বলা করে দিয়েছে। আমাদের কিন্তু প্রয়োজন ছিল হৃদয়ের প্রদীপ। তারা হৃদয়ের প্রদীপ নিভিয়ে দিয়ে গেছে। মুবারক ছিল সেই সময়, যখন হৃদয়ে আলো ছিল, বিদ্যুতের আলো ছিল না। আপনি নিজেই ভাবুন, কোন্ যুগটা আপনার পছন্দ হয়? যে যুগের মনুষ্যত্বের মর্যাদা ও সহানুভূতি ছিল, সেই মানবতার সহানুভূতি ও সমবেদনার যুগ? নাকি সেই যুগ, যে যুগে মানবতার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নেই, আছে প্রেস, মেশিন, বিদ্যুতের পাখা? আজ হৃদয়ের স্থিতি ও প্রশান্তি সহজপ্রাপ্য নয়। কিন্তু অর্থবিত্ত প্রচুর। আজ সব কিছুই আছে, কিন্তু আত্মিক মূল্যবোধ বিলুপ্ত। সব কিছু আছে, উদ্দেশ্য নেই। যার গলায় কাঁটা আটকে আছে, পিপাসায় যে কষ্ট পাচ্ছে, তারতো চাই আজলা ভর্তি পানি। তার জন্য সব কিছু কিছুই না। মুদ্রার স্তূপ জমা হয়ে থাকলেই তার লাভ কি? তাই আজকের সংস্কৃতিতে বিন্দুমাত্র ভালোবাসা নেই, নামটিও নেই আত্মত্যাগ ও সহানুভূতির। যাকেই দেখবেন, সে স্বার্থের দাস। সেই সংস্কৃতি নিয়ে আমরা কী করব? কী করতে পারি?

আমরা হারিয়েছি হৃদয়ের পথ

সমস্ত ভুল এভাবেই হচ্ছে, সঠিক দরজা দিয়ে প্রবেশের চেষ্টা করা হচ্ছে না, খিড়কি দিয়ে সকলেই ঘরে প্রবেশ করছে। হৃদয়ের দরজা বন্ধ। ভেতরে প্রবেশের পথ সেটিই ছিল। হৃদয়ের পথ আমরা হারিয়ে ফেলেছি। আত্মস্বার্থ নিয়ে আমরা সেখানে পৌছতেও পারব না। পৃথিবীর বিপথগামিতা, নিষ্ফল অহংকার, প্রবৃত্তির কর্তৃত্ব- এসব কিছুরই উৎসমুখ হলো হৃদয়। এই হৃদয়ে যখন এক আল্লাহর কর্তৃত্ব নেই, তাঁর প্রাবল্যের বরণ নেই, নেই তাঁর সামনে জবাবদিহির উপলব্ধি, তখন আর হৃদয়ের কী অভিযোগ থাকতে পারে? কার কী স্বার্থ আছে, সে অন্যের সাহায্য করবে এবং অন্যের জন্য নিজেকে ফেলবে ঝুঁকির মুখে? আজকের পৃথিবীতে ভাই ভাইকে বেনিয়াসুলভ দৃষ্টিতে দেখছে। প্রত্যেকেই অন্য আরেকজনের গ্রাহক ও প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করছে। সব দিকেই লুট-পাটের (Exploitation) বাজার উত্তপ্ত। মানবীয় স্বভাব বা ফিতরাতে ইনসানী বিলুপ্ত হয়ে গেছে। বাপ-সন্তানের প্রতি ক্রুদ্ধ, উস্তাদ শাগরেদের প্রতি নাখোশ।

শিক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটি

আজ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বিলাপ উঠেছে– ছাত্ররা শ্রদ্ধা করে না, শিক্ষকরা করেন না স্নেহ ও সহানুভূতির আচরণ। সবাই এ বিষয়টি নিয়ে চিন্তিত। এর সংশোধনের লক্ষ্যে বহু ধরনের প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে, কিন্তু এর শিকড় ও মূলের দিকে গভীর চিন্তা নিয়ে লক্ষ্য করা হচ্ছে না। যে শিক্ষা ব্যবস্থার সম্পূর্ণ গঠনটিই

বস্তুকেন্দ্রিক, শেষ পর্যন্ত তা দ্বারা ফলাফল কি-ই আর আসতে পারে? শিক্ষার কোন্ স্তরটি আছে যেখানে নৈতিকতা ও চরিত্র নির্মাণের প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে? এ সমস্ত অবক্ষয় তো এই শিক্ষা ব্যবস্থার অনিবার্য ফল। আপনাদের সাহিত্য-শিল্প তো প্রবৃত্তিজাত রিপুগুলোর জন্ম দিচ্ছে এবং মানুষকে বানাচ্ছে সুবিধাবাদী। আপনাদের পরিবেশ ও সুবিধা যৌথভাবে এমন স্থানে আপনাদের উপনীত করে থাকে, যেখানে প্রবৃত্তি ও স্বার্থের সন্তুষ্টি এসে যায়, সেগুলো আপনাদেরকে বিত্তবান ও মহাজন হওয়ার জন্য প্রেরণা দেয়। তাই এখন প্রয়োজন হৃদয় ও মানুষের পরিবর্তন। এ দু'টির পরিবর্তন ব্যতীত কোন পরিবর্তনই সম্ভব নয়।

মানসিকতার পরিবর্তন প্রয়োজন

আজ আমাদের দেশে কতগুলো সংস্কারধর্মী ও সামাজিক আন্দোলন চলছে। আমরা সব ক'টিকে গুরুত্ব দিয়ে থাকি। সাধ্য থাকলে সহযোগিতাও করি, বিশেষত 'ভূদান আন্দোলন', কিন্তু জমি গ্রহণের পূর্বে হৃদয়-মনে এ অনুভূতি জন্মানোর প্রয়োজন অধিক যে, প্রয়োজনাতিরিক্ত জমি কেউ রাখতেই পারবে না, তাহলে মানুষ স্বেচ্ছায় জমি দানে প্রস্তুত হয়ে যাবে। এমন মানসিকতা গঠিত হয়ে যাবে, লোকজন অভাবী মানুষকে নিজেদের জিনিস বিতরণ করে আনন্দ পাবে।

আমরা ইতিহাসে পড়েছি, মক্কা-মদীনার মাঝে ছিল বংশপরম্পরার দ্বন্দ্ব। তাদের মাঝে বৈপরীত্য ছিল, সংস্কৃতি ও সামাজিক জীবনেও। কিন্তু যখন মক্কা থেকে কিছু মানুষ মদীনায় চলে আসতে বাধ্য হলেন এবং নিজেদের সকল ধন-সম্পদ ও প্রাচুর্য ছেড়ে শূন্য হাতে মদীনায় চলে আসতে হলো, তখন বিত্তশালী ও সামর্থ্যবানদের সঙ্গী বানিয়ে দেওয়া হলো তাদেরকেই, যাদের সে মুহূর্তে কিছুই ছিল না। মদীনার সামর্থ্যবান লোকেরা মক্কাফেরত নিঃস্ব ভাইদেরকে বুকের সাথে মিলিয়ে নিলেন। বিত্তবান আনসারগণ মুহাজিরদের সামনে এনে রেখে দিলেন তাদের সম্পদের অর্ধেক। এদিকে হিজরত করে চলে আসা মুহাজিরদের মনটাও এমন বানানো হয়েছিল যে, তারা আনন্দে মদীনার ভাইদেরকে দু'আ জানালেন, শুকরিয়া জ্ঞাপন করলেন এবং বললেন ঃ এত সব কিছুর কোন প্রয়োজন আমাদের নেই। এখন সম্ভব হলে আমাদের সামান্য কিছু ঋণ দিন আর বাজারের পথটা দেখিয়ে দিন। আমরা মক্কাতেও ব্যবসা করেছি, এখানেও ব্যবসা করতে পারব। এভাবেই ইসলামের নবী মদীনাবাসীর মাঝে আত্মত্যাগ ও সহানুভূতির প্রেরণা জাগ্রত করেছেন। অন্যদিকে মক্কাফেরত মুহাজিরদের মাঝে জাগিয়ে তুলেছেন আত্মনির্ভরতা ও আত্মমর্যাদাবোধ। একদল ঘরের সম্পদ আগন্তুকদের পায়ের কাছে লুটিয়ে দিয়েছিলেন, আর অন্যদল সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে নিজেদের হাত-পা ও পরিশ্রমের মাধ্যমে উপার্জনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন।

আমাদের মাথা নিচু হয়ে আসে যখন আজকের উদ্বাস্তু মুহাজিরদের দিকে তাকাই। একদিকে আত্মত্যাগ ও সহানুভূতির অভাব, অন্যদিকে অভাব আত্মনির্ভরতা ও আত্মমর্যাদার।

আমরা বলছি, এই মানসিকতা বদলে ফেলুন। হৃদয়ে ভালোবাসার জন্ম দিন, এমন হৃদয়ের জন্ম দিন, যা অন্যের দুঃখে বিচলিত হয়ে যায়। দেশ ভাগের পূর্বে মানুষের হৃদয়ে এই আগুন জ্বালানোর প্রয়োজন ছিল যা থাকলে অন্যের বেদনা সহ্য করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। কমিউনিজম প্রশাসন ও রাষ্ট্রের সাহায্যে কার্যোদ্ধার করে। পক্ষান্তরে ধর্ম হৃদয়ের অবস্থাই এমন করে দেয় যে, মুদ্রা-সম্পদকে হিংস্র সাপ-বিচ্ছু মনে হতে থাকে। মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা) সালাতের জন্য দাঁড়ালেন; সেই সালাত, যে সালাত প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আমার চোখের শীতলতা হলো সালাত, যার জন্য তিনি উতলা হয়ে উঠতেন। মুআযযিন বিলাল (রা)-কে বলতেন, "সালাতের ইহতিমাম করো এবং আমার চিত্ত প্রশান্তির আয়োজন করো।" সেই সালাতের জন্য দাঁড়িয়ে হঠাৎ ঘরের ভেতরে গেলেন এবং কয়েকটি মুহূর্ত কাটিয়ে ফিরে এলেন। জিজ্ঞাসা করা হলো, "কোন্ জরুরী কাজের কথা স্মরণ হলো, সালাত ছেড়ে আপনাকে ভেতরে থেকে ঘুরে আসতে হলো?" উত্তর দিলেন, "ঘরে সামান্য স্বর্ণ জমা হয়েছিল, আমি তা দরিদ্র লোকের মাঝে বিলি করে দিতে বলে এলাম।"

কোন ভাষাই অন্যের নয়

আমি মুসলমানদের বলব, সাহস বাড়ান। কোন ভাষার সাথে আপনাদের বৈরিতা নেই। কোন ভাষার সাথে আপনাদের দূরত্ব ও শত্রুতার সম্পর্ক থাকা উচিত নয়। আপনারা ফার্সীকে আপন করেছেন, হিন্দীকে কেন আপন করতে পারছেন না? আমাদের দেশের ভাষা কত চমৎকার ভাষা! কিন্তু আমি আমার হিন্দু ভাইদেরও বলব, প্রশান্ত মনে ভেবে দেখুন! মানবতার মুক্তি এই ভাষা কিংবা ঐ ভাষায় নেই। মুক্তি নেই স্বতন্ত্র সংস্কৃতি ও কালচার আত্মস্থ করার মাঝে। আপনারা সকলেই মানুষের মাঝে আত্মত্যাগের প্রেরণা, সততার উদ্দীপনা সৃষ্টি করুন। মানুষকে মানুষ বানান, তাকে শেখান মানবতার মর্যাদা দানের পাঠ। আজ মানুষের অভ্যন্তর পচে গেছে। সে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে শুধু তার দেশ ও জাতিকে গ্রহণ করতে। শ্বেতাঙ্গদের দাবী আটলান্টিকের ওপারে মানুষ নেই। প্রতিটি দেশের অধিবাসীরাই নিজের ছাড়া অন্য কাউকে মানুষ ভাবতে চায় না। সকল পর্যায়ে বিভক্তির জন্য জোটবদ্ধতা ও স্বার্থপরতা সৃষ্টি হয়ে গেছে। কমিউনিস্টদের চোখে এক শ্রেণীর স্বার্থ, আমেরিকা ও পুঁজিবাদীদের চোখে অন্য শ্রেণীর স্বার্থ প্রধান হয়ে উঠেছে। একজনের চোখে পুঁজিপতি বলতে কিছুই নেই। অন্য জনের চোখে শুধু কৃষক-মজদুরদের অস্তিত্বই মুখ্য। কেউ কাউকে দেখতে নারাজ। এই গোষ্ঠীপ্রীতি ও সংকীর্ণ দৃষ্টি বড়ই ভয়াবহ।

আল্লাহর উপাসনার আন্দোলন প্রয়োজন

আজ আল্লাহর উপাসনা ও মানবতা প্রেমের আন্দোলনের প্রয়োজন। এর জন্য আজ মহা কোন এক উদ্যোগের প্রয়োজন, প্রয়োজন একটি ভূমিকম্পের। আল্লাহ্-উপাসনার একটি ঝড়ের প্রয়োজন যে ঝড় আত্মস্বার্থের বিশাল পাহাড়গুলোকে ধ্বসিয়ে দিতে পারে, উড়িয়ে দিতে পারে প্রবৃত্তির পর্বতচূড়া। নগরীর পর নগরী, গ্রামের পর গ্রাম যেন চিৎকার করে বলছে, "পশুসুলভ জীবন বাঁচিয়ে রাখার যোগ্য নয়। বস্তুবাদের বৃক্ষ অন্তঃসারশূন্য হয়ে পড়েছে। দুনিয়ার ওপর ছেয়ে থাকা স্বার্থপূজার শিকড়-বাকল উপড়ে গেছে। মানুষ! নিজের মর্যাদা উপলব্ধি করো। জীবন্ত বাস্তবতার সাথে নিজের ভাগ্যকে বাঁধো। আল্লাহর অপরিসীম শক্তির প্রতি ধাবিত হও।"

জ্ঞান ও নৈতিকতার সহযোগিতা

সেই বৈরাগ্য ও যোগীতন্ত্র আমাদের উদ্দেশ্য নয়। যা দুনিয়াকে পাশ কেটে চলার শিক্ষা দেয় এবং গুহা ও পাহাড়ে নিজের আবাস সন্ধান করে। আমরা সেই আধ্যাত্মিকতার দাওয়াত দিচ্ছি সমান্তরালভাবে যা জীবনের সাথে সাথে চলে, বরং জীবনের পথ প্রদর্শন করে। প্রাচীনপন্থী কিংবা অগ্রসরতার বিরোধী আমি নই। মানবতার স্বার্থেই প্রয়োজন এবং মানবতার চাহিদা ও আবেদন এই যে, নৈতিকতা, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও আল্লাহ-প্রেম পাশাপাশি চলুক। এ বিষয়ে আজ ভারসাম্য নষ্ট হয়ে গেছে। এসবের মাঝে পরস্পর সহযোগিতা ও নির্ভরতা নেই। বিজ্ঞান একদিকে যাচ্ছে তো নৈতিকতা অন্যদিকে। উভয়েই ভিন্নমুখী কট্টর চরমপন্থী (Extremist) হয়ে উঠেছে।

বস্তুবাদ ও আধ্যাত্মিকতা

বস্তুবাদ ও আধ্যাত্মিকতার মাঝে ব্যবধানটি এমনই। একটি দুনিয়াকে পূজা করতে করতে একদম গিলে ফেলতে চায়। অন্যটি দুনিয়াকে ঘৃণা করে এবং দুনিয়ার প্রতি থাকে বিতৃষ্ণ। আমরা বলি, বস্তু-উপাদান ও প্রযুক্তিকে আল্লাহ্প্রদত্ত নেয়ামত মনে করে তার বিধান অনুযায়ী ব্যবহার করুন। সেগুলোকে নিজের দাস মনে করুন। নিজে সেগুলোর দাস বনে যাবেন না। সেই জীবনের পূজাও করবেন না এবং তার প্রতি ঘৃণাও পোষণ করবেন না। আল্লাহর সামনে যে নিজেকে জবাবদিহি করতে হবে, তা অনুভব করুন এবং তাঁর আদালতের সামনে হাজির হয়ে পুরস্কার কিংবা শাস্তি লাভের বিশ্বাস জন্মান। তাঁর প্রেরিত নিঃস্বার্থ ও নিষ্ঠাবান আম্বিয়াগণের ওপর আস্থা স্থাপন করুন এবং তাঁদের থেকেই এ জীবন পরিচালনার বিধি-বিধান শিক্ষা নিন। নিজেকে আল্লাহর জন্য গড়ে তুলুন, দুনিয়া আপনার জন্য হয়ে যাবে।

•

মাজহাব না তাহ্যীব

(ধর্ম বনাম সংস্কৃতি)

আজকাল সনাতন সভ্যতা-সংস্কৃতির পুনর্জাগরণ তথা পুনরুদ্ধারের প্রবণতা সকল দেশের সর্বস্তরের জনগণের মাঝে ব্যাপক হারে দেখা যাচ্ছে। কেউ দু'হাজার বছর পুরাতন সভ্যতাকে পুনর্জাগরণ করতে চায়। আবার কেউ খৃস্টপূর্ব চার হাজার বছর সনাতন যুগকে ফিরিয়ে আনতে বদ্ধপরিকর। যে সকল দেশ নতুন নতুন স্বাধীনতা লাভ করেছে, সেখানে সর্বদিক হতে এ স্লোগান ধ্বনিত হচ্ছে– এখন আমাদের দেশে হাজার বছর পুরাতন সভ্যতা সংস্কৃতি নবরূপ দানে ও বাস্তবায়নে কিসের অসুবিধা–কোথাও এ বলে গর্ব করা হয়। আমাদের সভ্যতা-সংস্কৃতি সব থেকে সনাতন কোথাও বলা হয়, আমাদের ভাষা-সভ্যতার বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে হাজারও বছর পর্যন্ত কোন বহিরাগত সভ্যতা-সংস্কৃতির সামনে মাথা নত না করে এখনো পযর্ন্ত তার আসল রূপরেখায় বিদ্যমান। সুতরাং এ সকল ক্ষেত্রে আমাদের দেখা উচিত, এ মনোভাব ও আন্দোলনের পেছনে মৌলিক কারণ কি? বাস্তবেই কি এর উদ্দেশ্য, আদর্শময় নবজীবনের সন্ধান, হারিয়ে যাওয়া অনুপম নৈতিকতা ও এক কল্যাণময় জীবন পদ্ধতি ও উত্তম সমাজ ব্যবস্থার জীবন দান ও পুনরুদ্ধার? যে জীবন পদ্ধতি ও সামাজিক ব্যবস্থায় বেশি থেকে বেশি নীতি— নৈতিকতা, শান্তি-শৃঙ্খলা, আত্মিক প্রশান্তি, মায়া-মমতা, আত্মসচেতনতা, দায়িত্ববোধ ও আল্লাহ্ভীতি ও একে অপরের অধিকার আদায়ের প্রতি যত্নবান এবং সেই সাথে তার মাঝে আছে সর্বাপেক্ষা কম স্বার্থপরতা, বস্তুবাদী চিন্তা-ভাবনা ও আল্লাহ্বিমুখি নৈতিক ভ্রষ্টতা।

আমরা যখনই পুরাতন সভ্যতার পুনরুদ্ধার ও নবায়নের যে সকল আবেদন ও আন্দোলন রয়েছে সেগুলোকে একটু গবেষণামূলক পর্যালোচনা করি এবং এর প্রবক্তা ও একনিষ্ঠ কর্মীদের জীবন চরিত্রকে এ স্লোগানের সাথে একটু মিলিয়ে দেখি, তখন আমাদের বাস্তবেই ভীষণ হতাশ হতে হয়। কারণ তাদের কোন বক্তৃতা বা লেখায় কোথাও কোন নীতি-নৈতিকতার বা মৌলিক আদর্শ, ঈমান ও আত্মশুদ্ধির কোন আলোচনা বা গুরুত্ব দেখা যায় না— নেই, আছে শুধু সভ্যতার অসার জৌলুশ, সূক্ষ্ম কারুকার্য ও ভাষা-কৃষ্টি-কালচারের আলোচনা, নীতি-নৈতিকতার সাথে যার কোনই সম্পর্ক নেই। তাদের সাহিত্য-সংস্কৃতির মধ্যে বর্তমান বস্তুবাদী সভ্যতার কোন তাত্ত্বিক সমালোচনা বা নারাজির লেশমাত্র নেই, আর নাই বা আছে জীবনের ঐ সকল মূল ভিত্তি নিয়ে তাদের মাথা ব্যথা, যার ওপর গড়ে ওঠে জীবনের

সৌধ। আমরা দেখি, তাঁরা ঐ সকল সনাতন তাহজীব-তামাদ্দুন ও সভ্যতা-সংস্কৃতি পুনরুদ্ধারের দাওয়াতের সাথে সাথে ঐ ভ্রান্ত জীবন বিধানের সাথে প্রায়শ আঁতাত করে নিয়েছে এবং পদে পদে এর পদস্খলন হওয়া সত্ত্বেও কোথাও এর বিরুদ্ধে কোন বিমুখ ভাব বা বিরুদ্ধাচারণ ভাব পরিলক্ষিত হয় না, বরং তারা ধর্মহীন রাষ্ট্রের নীতিমালা অনুপাতে আইন-কানুন প্রণয়ন করেছে এবং সে দেশেরে সর্বস্তরের নীতিমালা নিয়ম-কানুন ও আচার-আচরণ ও শিক্ষা ব্যবস্থাকে নৈতিকতাবিবর্জিত শিক্ষা ব্যবস্থা ও ধর্মহীন ভ্রষ্ট নীতির সাথেই গ্রহণ করেছে, তারা ধর্মহীন রাষ্ট্র ব্যবস্থার ঘোষণা দান করেছে এবং তারা জীবনের সমস্যা ও তার নিরসনের ক্ষেত্রে, অনিয়ম প্রান্তিকতা, কারচুপি, ঘুষ, আত্মসাৎ, মুনাফিকী তথা অন্যান্য সকল অকল্যাণকর কার্যকিলাপ নিরসনের ক্ষেত্রে বর্তমান একবিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য বস্তুবাদী চিন্তা-চেতনা থেকে ভিন্ন ও সুন্দরভাবে চিন্তা-ভাবনা করতে প্রস্তুত নয়, কোথাও একটু গাম্ভীর্যপূর্ণ চিন্তার ফসলও পরিলক্ষিত হয় না, যা ছিল প্রাচ্যের সনাতন ধর্মাবলম্বীদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। তৎকালীন ও বর্তমান সৃষ্ট সমস্যাগুলোর ঐ নামেই নামকরণ এবং ঐভাবেই নিরসনের চেষ্টা-তদবির করা হয়, যেমন ইউরোপ ও আমেরিকাতে করা হয়। নতুন কমিটি গঠন, ইনকোয়ারী কমিশন, ঘুষ বন্ধের জন্য নতুন অফিসার নিয়োগ, খাদ্যশস্য দুর্লভ হওয়ার কারণে রেশনের ব্যবস্থা, মূল্য স্থিতিশীলতার জন্য কমিটি গঠন ইত্যাদি, ইত্যাদি; কিন্তু কখনও শুনতে পাওয়া যায় না যে, সনাতন সভ্যতার বাস্তবায়নকারী বেদ সভ্যতা ও প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির প্রবক্তাদের পক্ষ থেকে এ দাবি করা, সর্বস্তরের জনসাধারণের মাঝে নীতি-নৈতিকতা ও ধর্মীয় অনুভূতি সৃষ্টি করার প্রচেষ্টা করা হবে এবং এদের মাঝে পুরাতন যুগের ঈমান ও বিশ্বাস সৃষ্টি করা হোক, শাস্তি ও প্রতিদানের ব্যাপারে ধর্মীয় বিশ্বাস ও অনুভূতির পুনর্জাগরণ করা হোক। কারণ এ ছাড়া মানুষ অপরাধ ও নৈতিক ভ্রষ্টতা থেকে বাঁচতে সক্ষম নয়। ইউরোপের বস্তুবাদী জীবন দর্শনকে প্রতিহত করা হোক, দৌলত পরস্তীর যে প্লাবনে সমগ্র দেশ ও জাতি ভেসে চলেছে তা কম করার চেষ্টা করা হোক এবং নীতি-নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিক দিকগুলো জাগরণে সক্ষম এমন পথ ও পদ্ধতি অবলম্বন করা হোক, এ ধরনের কথাবার্তা চিন্তা-চেতনা কোথাও শুনতে পাই না। সারা দিকে শুধু আদি সভ্যতা-সংস্কৃতির নামে কিছু গোলকধাঁধার মত শব্দ ধ্বনিত হয়, যার পেছনে না আছে কোন আধ্যাত্মিক খাহেশ আর না আছে নৈতিক আদর্শ। এ মূলনীতির ভিত্তিতে আমরা যখনই কোন সনাতন সভ্যতা-সংস্কৃতিকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখি এবং তার দিল ও দেমাগের এ অনুভূতির কারণসমূহ তালাশ করি তখন এমন মনে হয় যে, এর পেছনে জাতীয়তাবাদ ও বংশীয় মিথ্যা অহংকার-অহমিকা কাজ করে যাচ্ছে, এছাড়া আর কিছুই নয়, অথচ এর বাস্তবতা বলতে কিছুই নেই। এ শুধু শিশুসুলভ অনুভূতি ও

মূর্খ আচরণের নামান্তর। কারণ জাতীয়তাবাদ ও বংশীয় মিথ্যা অহংকার-অহমিকা দুনিয়ার সর্বাপেক্ষা ক্ষতিকর বিধ্বংসী অস্ত্র যারা চেঙ্গিস ও সেকেন্দারের রূপে দুনিয়াকে ধ্বংসের অতল-গহ্বরে ডুবিয়েছে, কোন সভ্যতার হারিয়ে যাওয়া নিদর্শনাবলী গঠনমূলক ভূমিকা পালন করতে পারে না। দেশ ও জাতির তথা পুরা মানব জাতির জন্য কল্যাণকর ও গঠনমূলক ভূমিকা পালন করতে পারলে তা পারবে মাত্র সঠিক ধর্মীয় অনুভূতি ও ধর্মীয় মূলনীতি, যা জীবনের সঠিক সীমারেখা নির্ধারণ করে, জীবনের ব্যাপক পরিধির মাঝে চাঞ্চল্য ও তার উন্নতিকে সমর্থন করে এবং তার নির্ধারিত পরিমণ্ডলে ফুলে-ফলে সুশভিত হয়ে বিকাশ লাভের সুযোগ করে দেয়। চাই সে সভ্যতা দশ হাজার বছরের সনাতন সভ্যতা হোক আর দু'হাজার বছরের পুরাতন সংস্কৃতি হোক। কারণ এগুলোতো এক ধরনের ইউনিফর্ম যা আধুনিক যুগে সর্বস্তরের জনগণের জন্য ফিট নয়। পুরাতন সভ্যতা-সংস্কৃতি আমাদেরকে বিভিন্ন ধরনের রেডিমেইড পোশাক দান করে, সুতরাং খৃষ্টপূর্ব দু'হাজার সাল পুরাতন পোশাক হোক আর এক হাজার খৃষ্টাব্দ পুরান লেবাসই হোক না কেন, এ বিংশ শতাব্দীর আধুনিক যুগে কি করে চলতে পারে? আর রুচিশীল মানুষ কিভাবেই তা গ্রহণ করতে পারে?

মাযহাব ধর্ম আমাদেরকে নীতি-নৈতিকতা, নিয়ম-পদ্ধতি দান করে এবং জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় আসবাব তৈরির নৈতিক দায়িত্ববোধ শিক্ষা দেয়। মাযহাব এক খাস ধরনের পোশাকের ধ্যান-ধারণার পরিবর্তে এ কথার শিক্ষা দেয় যে, পোশাকের মূল লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হলো মানব দেহের অবকাঠামোগুলো শালীন ও সৃজনশীলভাবে আবৃত, উলঙ্গপনা বা বেহায়াপনার প্রকাশ না যেন হয়, অহংকার, অপচয়বিবর্জিত ফ্যাশনপূজারী যেন না হয়, বরং যতটুকু সম্ভব সাদামাটা সৃজনশীল মধ্যম ধরনের হওয়ার তাকিদ করেছে। এ নিয়ম-নীতি সামনে রেখে মাযহাব সর্বযুগে, সকল দেশে, সর্বাবস্থায় ও সকল মৌসুমের প্রয়োজন অনুপাতে পোশাক তৈরির পূর্ণ আযাদী দান করে। কিন্তু সনাতন সভ্যতা দু'হাজার বছর পুরাতন এক নির্দিষ্ট ধরনের পোশাকের ব্যাপারে পীড়াপীড়ি করে। সে বলতে থাকে, অমুক সময় যে ধরনের ধুতি, কুরতা বা লেঙ্গুট ব্যবহার করা হয়েছিল শুধু তাই ব্যবহার করতে হবে। শীতের সময় কম্বল ও লেপ ছাড়া অন্য কিছু ব্যবহার করা যাবে না, কারণ অন্য সব বহিরাগত। পক্ষান্তরে মাযহাবের এসব নিয়ে কোন মাথা ব্যথা নেই, দেশী-বিদেশী, সনাতন-আধুনিক এসব আলোচনা তার নিরর্থক, বা ফালতু কথা। কারণ মাযহাবের কাছে জীবনের ব্যাপক-বিস্তৃত নীতিমালা আছে, যা সব দেশের সর্বস্তরের জনগণ ও সকল মৌসুমের জন্য প্রযোজ্য। মাযহাব একথা বলে না, এ লেবাস দেশী, এটা বিদেশী। তোমার পূর্বপুরুষ এটা ব্যবহার করত আর এটা বর্জন করত, বরং মাযহাবের আহবান হলো ঃ

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُّوَارِيْ سَوْاٰتِكُمْ وَرِيْشًا وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ ـ

"হে আদম সন্তান, আমি তোমাদের জন্য এমন লেবাস তৈরি করেছি যা তোমাদের নগ্নতা থেকে ঢেকে রাখে এবং তোমাদের সৌন্দর্যের লেবাস,আর তাকওয়াময় আল্লাহ্ভীতি লেবাস আর এ পোশাকই হলো উত্তম।"

[সুরা আ'রাফ ঃ ২৬]

মাযহাবের এ ব্যাপারে কোন মাথা ব্যথা নেই যে, এই খাদ্য ঐ দেশের আর এই ফল ঐ জাতি উৎপাদন করেছে। এ খাদ্যকে এজন্য প্রাধান্য দেওয়া হোক যে, তা আমাদের দেশের সনাতন খাদ্য। খাদ্যের ঐ সকল নীতি এজন্য বর্জন করা হোক যে, এ নীতিমালা বিজাতীয় ও সাম্রাজ্যবাদী জাতিগোষ্ঠীর মাধ্যমে প্রচলিত হয়েছে। মাযহাব শুধু এই ডাক দেয়,

كُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَاتُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَايُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ـ

"পরিমিত পানাহার কর কিন্তু অপচয় করো না, কারণ অপচয়কারিগণ অপচয়কারীদেরকে তিনি পছন্দ করেন না।" [সূরা আ'রাফ ঃ ৩১]

সর্বাবস্থায় মাযহাব ও তাহযীব-এর এ মৌলিক পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হবে

মাযহাব উসূল ও মৌলিক নীতিমালা দান করে, তাহযীব-তমদ্দুন শত সহস্র বছর পুরাতন প্রাণহীন কংকাল তাও নমুনা দেয় যা বিলুপ্তির পথে, পক্ষান্তরে মাযহাব মানব জীবনের পরিধি বিস্তৃত করে। তার দেহে প্রাণ সঞ্চার করে, আর তাহযীব মানব জীবনের পরিধিকে সংকীর্ণ ও প্রাণহীন করে তোলে। মাযহাবের মাধ্যমে আল্লাহতাআলার সকল প্রকার নিয়ামত দ্বারা উপকৃত হওয়া সম্ভব। কিন্তু সনাতন তাহযীব তমদ্দুন, সভ্যতা-সংস্কৃতি হাজার নিয়ামত থেকে মানবগোষ্ঠীকে মাহরুম করে।

এ প্রসঙ্গে মাযহাবের ঘোষণা হলো ঃ

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللّٰهِ الَّتِيْٓ اَخْرَجَ لِعِبَادِهٖ وَالطَّيِّبٰتِ مِنَ الرِّزْقِ ـ

"আপনি জিজ্ঞেস করুন– আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে যে সৌন্দর্য ও পরিচ্ছন্নতা দান করেছেন তা রিযিককে হারাম করেছে?" [সূরা আ'রাফ ঃ ৩২]

অন্যদিকে সনাতন সভ্যতা-সংস্কৃতি প্রতিটি বিষয়ে তার আপন স্বকীয়তা তালাশ করে। যেখানে তার স্বকীয়তা ক্ষুণ্ন হয়, সেগুলোর প্রতি এ নাক সিটকিয়ে নর্দমার আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করে।

সনাতন তাহযীব-তমদ্দুন ও সভ্যতা-সংস্কৃতি মানুষকে ছোট ছোট গণ্ডিতে বিভক্ত করে এবং মানুষের মাঝে দেশ-জাতি-রাষ্ট্র, রসম-রেওয়াজ ও সামাজিক রীতিনীতির মাধ্যমে বিভেদের সৌধ নির্মাণ করে। অন্যদিকে মাযহাব দুনিয়ার সকল মানুষকে এক উসূল ও নিয়ম-নীতির যিন্দেগী, এক মাকসাদের জীবন, এক রূহে যিন্দেগী ও এক পয়গামে যিন্দেগী দান করে। পক্ষান্তরে সনাতন তাহযীব ও তার ইতিহাস-ইতিবৃত্ত পর্যালোচনা করলে যে মানসিকতা তৈরি হয়, তা হলো জাতীয়তাবাদ ও জাতীয়তার উত্থান এবং সনাতন যুগকে পুনরুদ্ধারকল্পে যুলুম করা, ভারসাম্যহীনতা ও সংকীর্ণতার পথ অবলম্বন করাকে অনুমোদন দেয়। কারণ এ ছাড়া সনাতন সভ্যতার পুনরুদ্ধার সম্ভব নয়। এজন্য ইউরোপের যে সকল জাতি সেকেলে ধ্যান-ধারণায় লালিত-পালিত হয়েছে, তারা বেশি অহংকারী, নিষ্ঠুর ও অত্যাচারী ও মানবিক হিতাহিত কাণ্ডজ্ঞানহীন হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছে।

এ ক্ষেত্রে মাযহাবের তা'লীম হলো ঃ

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا - اِعْدِلُوْا - هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى - وَاتَّقُوا اللّٰهَ - اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ ۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ -

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্‌র জন্য দণ্ডায়মানকারী, ইনসাফের সাক্ষ্য দানকারী হও। কোন জাতির সাথে দুশমনীর কারণে কখনো ইনসাফ ত্যাগ করো না। ইনসাফ কর, কারণ এটাই তাকওয়ার অধিক নিকটতম। আর আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তোমাদের কৃতকর্মের ব্যাপারে সম্যক অবগত।" [সূরা মায়েদা ঃ ৮]

একদিকে তাহযীব আমাদেরকে এ আহ্বান জানায় যে, সেকেলে সেই সনাতন যুগের দিকে আস, যার রসম-রেওয়ায ও সামাজিক রীতিনীতি এরূপ ছিল, খাওয়া-দাওয়ার নিয়ম-পদ্ধতি ছিল এমন, লেবাস পোশাক ছিল এমন, বাসন-কোসন ছিল তেমন বা অমুক গাছের পাতা ব্যবহার করত, আরোহণের জন্য রথ, গরুর গাড়ি বা উট ব্যবহার হতো, নিরেট নির্ভেজাল সংস্কৃত ভাষা, আরবী ভাষা বা অন্য কোন আঞ্চলিক ভাষার পতাকাতলে। অন্যদিকে মাযহাবের এসব বিষয়ে কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। তার কাছে আসবাবপত্রের চেয়ে প্রয়োজন নিবারণ হলো গুরুত্বপূর্ণ ও মুখ্য উদ্দেশ্য। মাযহাব এমন মানসিকতাকে বেশি মূল্যায়ন করে যে, রথ, গরুর গাড়ি, ট্রেন, বাস বা উড়োজাহাজ, যখন যা প্রয়োজন তখন তা ব্যবহার করবে, সাথে সাথে এ খেয়াল করবে ঃ

لِتَسْتَوٗا عَلٰى ظُهُوْرِهٖ ثُمَّ تَذْكُرُوْا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ اِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُوْلُوْا....

'তোমরা এ সকল গাড়ী-ঘোড়ার ওপর আরোহণ কর, অতঃপর আল্লাহ্র দয়ার কথা স্মরণ কর এবং যখন আসন গ্রহণ কর তখন এ দু'আ পড়।' [সূরা যুখরুফ ঃ ১৩]

سُبْحَانَ الَّذِىْ سَخَّرَلَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ ـ وَاِنَّا اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ ـ

যার অর্থ হল, "তিনি অত্যন্ত পূত পবিত্র সত্তা যিনি আমাদের অধীন করেছেন এ সকল যানবাহন। এতো আমাদের শক্তির বাইরে ছিল আর আমরা আমাদের রবের কাছে প্রত্যাবর্তন করব।" [.....১৩-১৪]

মাযহাবের দাওয়াত ও আহ্বান কখনও এই নয় যে, আস সভ্যতার দিকে, সংস্কৃতি বা আরবী-ফারসী ইংরেজী সভ্যতার পতাকাতলে, বরং মাযহাবের আহ্বান সকলের জন্য এক। আর তা হলো, মুহাম্মদ রাসূল (সা)-এর দাওয়াত এ পয়গাম যা তিনি সকল আহলে কিতাবকে দিয়েছিলেন,

قُلْ يٰاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ ۢبَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهٖ شَيْئًا وَّلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ـ

"বলুন হে আহলে কিতাবগণ! এস এ কথার দিকে যে কথার ব্যাপারে আমরা সকলেই একমত–সমান, আর তা হলো একমাত্র আল্লাহ্রই ইবাদত করব। তাঁর সাথে অন্য কাউকে শরীক করব না এবং আমরা আল্লাহ্ ছাড়া অন্যকে রব মনে করব না ।" [সূরা আল-ইমরান ঃ ৬৪]

এজন্য লাশ সমতুল্য সনাতন সভ্যতাকে জীবন দান করা বিশ্বমানবতার জন্য এক বিরাট মুসীবত, ধ্বংসের কারণ যা নতন নতুন যুদ্ধের সূচনা করে এবং একে অন্যের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে, নিত্য-নতুন সমস্যা সৃষ্টি করে। তাই সঠিক মাযহাবের দাওয়াত দেওয়া বিশ্ব মানবতার জন্য সর্বাপেক্ষা বড় খিদমত ও পয়গামে রহমত।

একটু চিন্তা করুন, যদি সকল পুরাতন তাহযীব-তমদ্দুন তাদের প্রবক্তাদের খাহেশ ও তামান্না অনুযায়ী জীবিত হয়ে যায়, ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি, রোমান-ইরানী কৃষ্টি-কালচার আর আরবীয় তাহযীব-তমদ্দুন নব জীবন ফিরে পায়, তাহলে দুনিয়াতে কেমন ফিতনা ও তামাশা সৃষ্টি হবে? স্বভাবতই এ সকল সভ্যতা

যদি নব জীবন পায়, তাহলে তার সকল গুণাগুণ, দোষক্রটি ও অন্য সকল বৈশিষ্ট্যের সাথেই জীবিত হবে। তখন আপনি এ কথা বলতে পারবেন না যে, সনাতন সভ্যতা-সংস্কৃতি তো জীবিত হোক, কিন্তু তার মাঝে যে সকল দোষক্রটি বা ক্ষতিকর দিক আছে তা জীবিত না হোক। আর এ কথা বলার অধিকার আপনাকে কেই বা দিয়েছে, কারণ সকল সভ্যতা তার গুণগত বৈশিষ্ট্য ও তার পার্থক্যগত যোগ্যতা নিয়েই জীবন লাভ করবে। যদি এমনই হয় তাহলে তখন দেশ-জাতি তথা সমগ্র বিশ্বের সামাজিক চিত্র কেমন ভয়ানক হবে? ভারতীয় সভ্যতায় যৌনাচারের যে ধুম, জাত-পাত, ছুঁৎ-ছাত ও অন্যান্য সামাজিক বৈষম্যের অমানবিক জীবন ব্যবস্থা, যেখানে বিধবা নারীকে মৃত স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় দাহ করা হতো। গ্রীক সভ্যতায় দেবদেবীর বধ্যভূমিতে বেহায়াপনার মেলা বসত। আর বেশ্যা ও পতিতাবৃত্তিকে সম্মানজনক পছন্দনীয় পেশা মনে করা হতো। রোমান সভ্যতায় গোলামের শরীরে তেল ঢেলে তারপর আগুন লাগিয়ে দাওয়াত ও পার্টির ব্যবস্থা করা হত, আর এ মানব বিদগ্ধ রৌশ্নীতে আড়ম্বরপূর্ণ দাওয়াত ও শাহী যিয়াফতের ব্যবস্থা করা হতো। যেখানে শুধু তামাশাকারীদের আত্মতৃপ্তির জন্য একজন নিরীহ মানুষকে তলোয়ারের নির্মম আঘাতে জর্জরিত করা হতো, আর দেখতে দেখতে একটি মানুষকে রক্ত ও মাটির মাঝে লুটোপুটি করতে দেখা যেত এবং তার যন্ত্রণায় নির্গত কাতর করুণ আর্তনাদ শ্রবণে ও তার শেষ নিশ্বাস কিভাবে বের হয়, তা দেখার জন্য এক বিশাল মজমা জমায়েত হতো এবং একে অপরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ত। এ অবস্থার নিয়ন্ত্রণ করার ব্যাপারে পুলিশ হিমশিম খেত। ইরানী সভ্যতায় অগ্নিপূজা করা হতো। আমীর-উমারা লাখ লাখ টাকার তাজ টুপি ব্যবহার করত, অন্যদিকে সমাজের গরীব-দুঃখী মানুষ শীতের প্রকোপে কাঁপতে কাঁপতে মৃত্যুবরণ করত। সে সমাজে আপন বোনের সাথে বিবাহের প্রথা ছিল, অন্য দিকে আরেক দল সমাজের নেতৃত্ব মহিলাদের হাতে তুলে দেওয়ার উকালতি করত। আরব্য সভ্যতায় নিস্পাপ কচি মেয়েকে জীবন্ত কবর দেওয়া হতো, কাফেলা লুটপাট করা হতো, অহেতুক তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে দীর্ঘ (চল্লিশ) বছর নাগাদ যুদ্ধ লেগে থাকত। মদ, জুয়া আর বেহায়াপনার ভ্রষ্ট কাহিনী নিয়ে গর্বভরে কাব্য রচনা করা হতো, আর এ সকল কবি ও কবিতার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের লক্ষ্যে কবিতাগুলো স্বর্ণাক্ষরে লিখে পবিত্র কাবাগৃহে টাঙিয়ে দেওয়া হত।

সুতরাং যদি এ সকল সনাতন সংস্কৃতি নব জীবন লাভ করে, তাহলে কি দুনিয়ার সামাজিক চিত্র কল্যাণকর হবে? তখন এ কথা বলার কোন নৈতিক অধিকার থাকবে কি যে, ভারতবর্ষের চার হাজার বছর পূর্বের সনাতন সংস্কৃতি, তাহযীব-তমদ্দুন ও সভ্যতা-সংস্কৃতি নব জীবন লাভ করুক, কিন্তু দেড় হাজার বছর পুরাতন পারস্য আরব্য সভ্যতা-সংস্কৃতি জীবিত হতে পারবে না? যদি কোন এক দেশের সনাতন

সভ্যতা নব জীবন পাওয়ার অধিকার পেয়ে থাকে, তাহলে দুনিয়ার সর্বপ্রান্তে যে সব দেশ জাতি আছে, তাদের সকলের নিজস্ব সভ্যতা-সংস্কৃতি পুনরুদ্ধারের দাওয়াত দেওয়া হবে তাদের নৈতিক অধিকার। এ ক্ষেত্রে আমাদের বাধা দেওয়ার কোন অধিকার নেই।

সত্যিকার অর্থে এ সব যালিম সমাজ ব্যবস্থা সভ্যতা-সংস্কৃতির অপমৃত্যু হওয়ার সাথে সাথে তা নস্যাৎ হয়ে যাওয়াটাও আল্লাহ্র অত্যন্ত বড় দয়া ও মেহেরবানী। কারণ এর সাথে সাথে সমাজের অনেক বেইনসাফী ও ভারসাম্যহীন মতাদর্শ ধূলিসাৎ হয়ে গেছে এবং বিশাল বড় জনগোষ্ঠী এর নির্মম অত্যাচার থেকে নাজাত পেয়েছে। যদি আমরা জাতীয়তাবাদের সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত হয়ে ইতিহাস ও ইতিহাস-দর্শন পর্যালোচনা করি, তাহলে আমরা দেখতে পাই, দুনিয়ায় যে সকল জিনিস উজাড় হয়ে গেছে, তার উজাড় হয়ে যাওয়াই উচিত। তার মারা যাওয়াটা এ কথার প্রমাণ দেয় যে, তার মাঝে জীবন ধারণের ক্ষমতা শেষ হয়ে গেছে এবং সে তার জীবন-সীমা অতিক্রম করেছে। আর তার ওপর নতুন কোন সমাজ ব্যবস্থা বিজয় লাভ করা এ কথা প্রমাণিত করে যে, এ বিজয়ী নতুন জীবন ব্যবস্থা তা থেকে শ্রেয় ও অধিক যোগ্যতাসম্পন্ন এবং জীবন ধারণের অধিক যোগ্যতা ও ক্ষমতা রাখে। সুতরাং এখন ঐ হাজার বছরের মৃত সভ্যতাকে পুনরুদ্ধার ও নব জীবন দান করার কোন অর্থ হয় না। কারণ তা হবে মিসরের পিরামিড থেকে হাজার বছরের পুরাতন মমি করা ফেরাউনের লাশ কবর থেকে উঠিয়ে দ্বিতীয়বার মিসরের রাজসিংহাসনে সমাসীন করা এবং রাষ্ট্র ক্ষমতা তার হাতে তুলে দেওয়ার নামান্তর। দুনিয়ার কোন দর্শন বা জীবন ব্যবস্থা তার রূহ, স্বকীয়তার কোন বিশেষ পয়গাম ছাড়া জীবিত থাকতে পারে না। সুতরাং যে সকল জীবন ব্যবস্থা, তাহযীব-তমদ্দুন ও সভ্যতা-সংস্কৃতির মৃত্যু হয়েছে সে তার পয়গাম সমকালীন পরিমণ্ডলে দুনিয়াবাসীকে পৌঁছেছিল, এখন আর বর্তমান যুগের চাহিদা মেটানোর কোন শক্তি তার মাঝে নেই। আর না আছে তার কাছে কোন পয়গাম, না বিশ্ব মানবতার সমস্যা ও জটিলতার কোন সমাধান, পথভ্রান্ত গুমরাহ জাতির জন্য কোন পথের দিশা। এজন্য ঐ সকল পুরাতন সভ্যতা-সংস্কৃতি যিন্দা করার অর্থ হলো সময়-শ্রম ও অর্থ সম্পদকে ধ্বংস করা এবং এক অহেতুক কাজে নামা মাত্র।

যার পেছনে সময়-শ্রম ও অর্থ-সম্পদ ব্যয় করা যেতে পারে, যার দাওয়াত দেওয়া যেতে পারে এবং যাকে পুনরুদ্ধার করার চেষ্টা-তদবীর করা যেতে পারে, তা হলো চিরন্তন সঠিক মাযহাব, যা ধর্মের দাওয়াত যা আল্লাহ্র পয়গম্বরগণ, সর্বযুগে ও সর্বস্থানে নিয়ে এসেছেন এবং যে মাযহাবকে সর্বশেষে হযরত মুহাম্মদ (সা) কিয়ামত পর্যন্ত সকল জাতির জন্য চিরন্তনভাবে নিয়ে এসেছেন। তাঁরা এ মাযহাবের মাধ্যমে সমগ্র মানব জাতির দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের পয়গাম

দিয়েছেন। সৃষ্টিকর্তা থেকে বিচ্ছিন্ন মানব জাতিকে আবার স্রষ্টার সাথে সুসম্পর্ক গড়ে দিয়েছেন। খালেস তাওহীদ-এর দাওয়াত ও দরস দিয়েছেন, আখিরাতের হিসাব-কিতাবের কথা বুঝিয়েছেন, ভাল-মন্দের নির্দিষ্ট সীমারেখা নির্ণয় করেছেন, নীতি-নৈতিকতা একে অপরের সাথে হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক ও দায়িত্ববোধের এমন নিয়ম-পদ্ধতি দান করেছেন যার ওপর ভিত্তি করে সর্বযুগে মানবতা উন্নতির উৎকর্ষে সমাসীন হতে সক্ষম এবং সভ্যতাও তার ওপর ভিত্তি করে সুন্দর আদর্শ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করতে সক্ষম, নবীগণের আনীত খোদায়ী বিধানের ওপর চলার মাধ্যমে নিজে নিজেই একটি অনুপম আদর্শের সন্ধান খুঁজে পাই, খুঁজে পাই এমন এক জীবন যেখানে ভারসাম্যহীনতার ছোঁয়ামাত্র নেই। ফলে এমন এক সমাজ ব্যবস্থা কায়েম হয় যে সমাজে সুখ, শান্তি, মানসিক তৃপ্তি ও আত্মিক প্রশান্তি, হৃদ্যতাপূর্ণ সুসম্পর্ক, সাহায্য-সহযোগিতা, ভারসাম্যতা ও ন্যায়-নিষ্ঠার এক অনুপম চিত্র ফুটে ওঠে যার ভিত্তি বড় মজবুত এবং পরিধি অনেক প্রশস্ত। তার মাঝে একই সাথে ইস্পাতের কঠোরতা ও কাচের মত স্বচ্ছতা বিদ্যমান। মাযহাব এমন এক যিন্দেগী ও সমাজ ব্যবস্থার নাম, যার মাঝে কোন বিশেষ দেশ, জাতি ও বর্ণের কোন চিহ্ন বা ছোঁয়ার লেশমাত্র নেই, সমগ্র মানব জাতির এ যমানা সম্পত্তির নাম যার ওপর কোন দেশ-জাতির ইজারাদারি নেই। না চীন এ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে পারে, আর ভারতের জন্য এতে আছে লজ্জার কোন কারণ, না আছে এর মাঝে ইরানের জন্য ভয়ের কিছু আর না ইউরোপের জন্য পরহেয করার কোন বিষয়। কারণ শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করার জন্য এ ছাড়া আর কোন আইডিয়াল বা আদর্শ নেই। এ জীবন বিধানকে ইচ্ছা করলে একটি তাহযীবও বলা যেতে পারে, যা ঐ সকল আকায়েদ, ধর্মীয় বিশ্বাস ও হুকুম-আহকাম-নীতিমালা ও আদর্শের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়েছে। কিন্তু আপনি এ সভ্যতাকে আরব্য সভ্যতা বা ইরানী সংস্কৃতি বলতে পারবেন না, কারণ মাযহাব কোন দেশ, জাতি ও তাদের শিল্পকলার সাথে সম্পৃক্ত নয় এবং আর না কোন জাতি-গোষ্ঠীর প্রতিনিধি বা উকিল। প্রতিটি দেশে এ মাযহাবকে পরীক্ষা করা যেতে পারে আর প্রত্যেক মানুষ তা গ্রহণ করতে পারে। কারণ মিটে যেয়ে উজাড় হয়ে যায় এমন কোন সভ্যতার ভিত্তির ওপর এর সৌধ নির্মিত নয়। ঈমান ও আকায়েদ দিগ্বিজয়ী বস্তুনিষ্ঠ আল্লাহর বিধানের ওপর এর বুনিয়াদ যা আল্লাহর রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সা) সমগ্র মানব জাতির জন্য নিয়ে এসেছেন। এজন্য এ মাযহাব নিঃস্ব ও প্রাণহীন মৃত লাশ হওয়া তো দূরের কথা, পুনরুদ্ধারের প্রশ্নই ওঠে না।

حقائق ابدی پر اساس ہے اسکی

یہ زندگی ہے نہی طلسم افلاطون -

এ তো আফলাতুনের হিয়ালীপনা নয়
নয়তো কারোর তেলেসমাত!
আল্লাহ্‌র দেয়া জীবন বিধান , শাশ্বত পয়গাম
নয়তো হবার ধূলিসাৎ।

সুতরাং এ মাযহাবী সভ্যতা পুনর্জাগরণের জন্য নতুন ও পৃথক কোন দাওয়াত ও আন্দোলনের প্রয়োজন নেই, বরং ইসলামের দাওয়াতই এ সভ্যতার দাওয়াত; আর এ দাওয়াত চিরঞ্জীব ও চিরউদ্যমী।

طلوع ہے صفت افتاب اسکاغروب
یگانہ امر مثال زمانہ گوناگوں۔

সূর্যের মত সে চিরউদীয়মান–
বেনযীর রত্ন, যুগ-যুগান্তরের আদর্শ।

একটি পবিত্র ওয়াক্‌ফ ও তার মুতাওয়াল্লী

[বিনযেরা রোডের একটি মিশ্র সমাবেশে পঞ্চাশের দশকের কোন এক সময়ে ভাষণটি প্রদান করা হয়। হিন্দু-মুসলিমসহ বিভিন্ন ধর্মের নাগরিকের অংশ গ্রহণে সমাবেশটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল।]

রেওয়াজী সমাবেশ

বর্তমানে আমাদের দেশে সভা-সমাবেশের বিশেষ প্রচলন রয়েছে। কিন্তু এসব সমাবেশ মূলত দু' ধরনের হয়ে থাকে। একটি তো হলো এমন সব সভা-সমাবেশ, যা কেবল ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য ও স্বার্থ পূরণের জন্যেই অনুষ্ঠিত হয়। এর পেছনে কখনো কখনো কোন সংস্থা বা রাজনৈতিক দল কাজ করে; কখনো আবার কোন কোন সংস্থা বা রাজনৈতিক দল ব্যবহার করা হয়। এসবের স্পষ্ট উদাহরণ হলো, নির্বাচনী সমাবেশে। নির্বাচন উপলক্ষে শহরে-শহরে, গাঁয়ে-গঞ্জে বহু সভা-সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় এবং তার পেছনে ব্যাপক চেষ্টা-তদবীর ব্যয় করা হয়, ব্যয় করা হয় বিপুল অর্থ। টাকা-পয়সা পানির মতো প্রবাহিত হয়। যিনি কোন আসনের জন্য দাঁড়ান, তিনি ভোটদাতা-নির্বাচকদেরকে নিশ্চয়তা দান করেন, নির্বাচনের জন্য তিনি-ই সর্বাধিক উপযোগী ও যোগ্য মানুষ। এসব সমাবেশে জীবনের নীতি-নৈতিকতা ও উন্নত নাগরিক হওয়ার শিক্ষা বিতরণ করা হয় না। তাদের আগ্রহ ও চাহিদা নিবদ্ধ থাকে শুধু এই বিষয়ে, তাদেরকে অধিক থেকে অধিকতর ভোট দেওয়া হোক! তাদের চোখে সেই সব লোকই কেবল প্রশংসাযোগ্য এবং সেই সব লোকেরই কেবল জীবনের মূল্য রয়েছে, যারা তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসে এবং তাদেরকে ভোট প্রদান করে। ভোটদাতা শ্রেণী নৈতিকতার বিচারে পতিত এবং নীতি, চরিত্র ও আচরণের দিক থেকে নিকৃষ্ট পর্যায়ের হলেও তাদের কিছুই যায় আসে না। দ্বিতীয় ধরনের সমাবেশ হলো সেগুলো, যেগুলো শুধু ধর্মীয় প্রথা বা সামাজিক অনুষ্ঠানের সূত্রে অনুষ্ঠিত হয়। এসব সমাবেশ মুসলমানদের মাঝেও অনুষ্ঠিত হয়, হিন্দুদের মাঝেও অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু আক্ষেপের ব্যাপারে হলো, ধর্মীয় সভা-সমাবেশ, যা কোন এক সময় বহু জাতির মাঝে জীবনের স্পন্দন জাগানোর হাতিয়ারে পরিণত হতো, সংস্কার ও বিপ্লবের পয়গাম বয়ে নিয়ে আসত, এখন সেগুলো আর কোন পয়গাম ও প্রোগাম নিয়ে আসছে না। এমনিভাবে সেই সব সামাজিক অনুষ্ঠান, যেসবের সাহায্যে কোন এককালে সংস্কার-সম্প্রীতি জোরদার করা হতো, সেসব এখন আত্মাহীন, প্রাণহীন হয়ে গেছে এবং গৎবাঁধা নিয়মে পর্যবসিত হয়েছে।

সমাবেশের প্রভাবশূন্যতা

এই সব সমাবেশে লোকজন যেই মানসিকতা নিয়ে আসে সেই মানসিকতা নিয়েই ফিরে যায়। তাদের মাঝে কোন পরিবর্তন, কোন রদবদল ঘটে না, বরং এসব সমাবেশে অংশ গ্রহণের ফলে এক ধরনের তৃপ্তি ও আত্মপ্রসাদ জন্ম নেয়। এসব সমাবেশে অংশ গ্রহণকারী ব্যক্তি মনে করতে থাকে, এই অংশ গ্রহণের মধ্য দিয়ে সে অনেকটা নির্ভরশীল ও পবিত্র হয়ে গেছে এবং ইতোপূর্বে যে পাপ সে করেছে তা ধুয়ে-মুছে গেছে। বর্তমানে ধর্মের মাধ্যমে মানুষের হৃদয় ও মাথায় কোন আঘাত আসছে না। ধর্মীয় অনুষ্ঠানসমূহে অংশ গ্রহণের মাধ্যমে বরং আত্মতৃপ্তি ও স্বস্তির বৃদ্ধি ঘটছে।

ধর্ম ভ্রান্তিপূর্ণ জীবনের শত্রু

অথচ ধর্ম তো ভ্রান্তিপূর্ণ জীবনের শত্রু। পাপ ও অনৈতিকতার সাথে তার সমঝোতা অসম্ভব। আগের যুগের জীবন যাপনকারীরা এসব সমাবেশের ব্যাপারে শংকিত হয়ে পড়ত। তাদের কর্মকাণ্ড নিয়ে ধর্ম কোন নিন্দা বর্ষণ করে কিনা, এ ভয়েই তারা কাতর হয়ে যেত। কুরআন মজীদে হযরত শু'আইব (আ.) ও তাঁর জাতির মাঝের সংলাপ বর্ণনা করা হয়েছে। হযরত শু'আইব (আ.) তাঁর জাতির উদ্দেশে বললেন, "হে জাতি! মাপে কমতি করো না। তোমরা পাল্লা ঝুঁকিয়ে দিয়ে থাক এবং মাপে কম দিয়ে থাক। গ্রাহকের কাছ থেকে অধিক থেকে অধিকতর আদায় করার ধান্ধায় ডুবে থাক এবং তাদেরকে কম থেকেও কম প্রদানের ভাবনায় লিপ্ত থাক। এটাতো মহাপাপ!" হযরত শুআইব (আ.)-এর জাতি জবাবে তাঁকে বলল—"তোমার সালাত কি তোমাকে এই শিক্ষাই দেয়, আমাদের কর্ম পদ্ধতির বিষয়ে তুমি প্রশ্ন দাঁড় করাবে এবং আমাদেরকে আমাদের সম্পদে স্বাধীন কর্মকাণ্ড থেকে বাধা দেবে?" সেই জাতির শত্রু নির্ণয় সঠিক ছিল। সালাত এই সব প্রতিবন্ধকতা আরোপ করে থাকে এবং জীবনের মাঝে শুদ্ধ ও ভুলের পার্থক্য করে দেয়। একটি সঠিক ও জীবন্ত ধর্ম মানব জীবনের বিরাজমান ভ্রান্তি ও গুনাহ্‌র ব্যাপারে নীরব থাকতে পারে না।

আমাদের এই সমাবেশ নতুন সমাবেশ, নতুন ধারার। একটি নির্বাচনী সমাবেশসমূহের কোন সমাবেশ নয়, প্রথাগত ধর্মীয় অনুষ্ঠানসমূহের কোন অনুষ্ঠানও নয়। আমরা এই সমাবেশে এ কথাই বলে যাওয়ার চেষ্ট করব, যে সঠিক পথ কোনটি এবং কেন মানুষ পতনের গহ্বরে পড়ল?

ত্যাগের প্রশ্ন

আপনি যখন কোন একটি কাজ করেন, তখন সবার আগে এ বিষয়টা মীমাংসা করে নিয়ে থাকেন, কাজটি করছেন কোন্ নিয়তে এবং এক্ষেত্রে আপনার সঠিক

অবস্থান কী? দুনিয়ায় যা কিছু ঘটে চলেছে, তার পেছনে এই মৌলিক বাস্তবতাই কাজ করছে, মানুষ দুনিয়ায় তাকে কী মনে করেছে এবং দুনিয়াতে তার স্থান ও পজিশনটা কী? যদি এই একটি ক্ষেত্রে সুষ্ঠু অনুধাবন ঘটে যায়, তাহলে সকল কাজই সুষ্ঠু ও সঠিক হবে। আর এই ক্ষেত্রে বিচ্যুতি ঘটে গেলে বিচ্যুতি ও বিভ্রান্তি অনবরত ঘটতেই থাকবে।

মানুষ আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি

ইসলাম আমাদের এ কথাই বলছে, এই দুনিয়ায় মানুষ হচ্ছে আল্লাহ্‌র নায়েব, আল্লাহর প্রতিনিধি ও দুনিয়ার ট্রাস্টি বা আমানতদার। গোটা দুনিয়াটা একটা ওয়াক্‌ফ এবং মানুষ তার মুতাওয়াল্লী। মানুষের দায়িত্বেই এখানকার ব্যবস্থাপনা ও হেদায়াতের কাজ। দুনিয়ায় ছোট-বড় বহু ধরনের ওয়াক্‌ফ থাকে। এই গোটা বিশ্ব, সমগ্র সৃষ্টিজগত একটি মহত্তম ওয়াক্‌ফ বা ট্রাস্ট। দুনিয়াটা কারো ব্যক্তিগত মালিকানা বা বাপ-দাদার সম্পদ নয়, সে যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে খাবে আর ওড়াবে। এই ওয়াক্‌ফে প্রাণী, পশু-পাখী, গাছ, নদী-পাহাড়, সোনা-রূপা, খাদ্যদ্রব্য ও দুনিয়ার যাবতীয় নেয়ামত বিদ্যমান। এ সব কিছুই মানুষকে সোপর্দ করা হয়েছে। কেননা মানুষ এসবের স্বভাবের সাথেও পরিচিত এবং এসবের প্রতি সহানুভূতিশীলও। মানুষকে খোদ এই ট্রাস্টের মাটি দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। মানুষ এই মাটিরই সৃষ্টি। আর কোন কিছুর ব্যবস্থাপকের জন্য ঐ বিষয়ে সচেতনতা ও প্রজ্ঞা এবং সহানুভূতি ও সংযুক্তি উভয়ই শর্ত। মানুষ তো দুনিয়ার লাভ ও ক্ষতির বিষয়েও ওয়াকিফহাল। দুনিয়ার মাঝেই তার সমূহ প্রয়োজনীয়তা রেখে দেওয়া হয়েছে। এ কারণেই মানুষ দুনিয়ার উত্তম ট্রাস্টি হওয়ার ক্ষমতা রাখে।

উদাহরণস্বরূপ কোন লাইব্রেরী বা পাঠাগারের ব্যবস্থাপনা ঐ ব্যক্তিই ভালোভাবে করতে পারে, জ্ঞানের প্রতি যার আগ্রহ রয়েছে এবং বই-পত্রের সঙ্গে সম্পর্ক ও আকর্ষণ জড়িয়ে রয়েছে। যদি কোন পাঠাগারের দায়িত্ব ও ব্যবস্থাপনা কোন মূর্খ লোককে সোপর্দ করা হয়, সে যত সম্ভ্রান্ত লোকই হোক না কেন, সে ভাল লাইব্রেরিয়ান হতে পারবে না। কিন্তু যার জ্ঞানের প্রতি আগ্রহ রয়েছে, বই-পত্রের সঙ্গে সম্বন্ধ রয়েছে, সে এর মধ্যে যথেষ্ট সময় ব্যয় করবে, এর সঞ্চয় ভাণ্ডারে যুক্তিসঙ্গত সংযোগ ঘটাবে এবং উন্নয়ন সাধন করবে।

এমনিভাবে মানুষ যেহেতু এই দুনিয়ার, এর প্রতি তার আগ্রহও রয়েছে, এর প্রয়োজনও তার রয়েছে; দুনিয়া সম্পর্কে সে অবগতও, এর প্রতি সে সহানুভূতিশীলও, দুনিয়াতে তাকে বসবাসও করতে হবে এবং দুনিয়াতে তাকে মৃত্যুবরণ করতে হবে। তাই এই দুনিয়ার পরিপূর্ণ দেখাশোনা সে করবে এবং আল্লাহর দেয়া যাবতীয় নেয়ামতের যথার্থ ব্যবহার ও সংরক্ষণ করবে। ব্যবস্থাপনার কাজ মানুষ ব্যতীত আর কেউ এমন সুন্দরভাবে আঞ্জাম দিতে পারবে না।

দুনিয়ার ব্যবস্থাপনায় মানুষই উপযুক্ত

যখন হযরত আদম (আ.)-কে আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করলেন এবং দুনিয়ায় তাঁর প্রতিনিধি বানালেন তখন ফেরেশতাগণ, যাঁরা পবিত্র ও রূহানী সৃষ্টি, যাঁরা গুনাহ করতেন না, গুনাহর আগ্রহও বোধ করতেন না, বললেনঃ হে প্রভু! এমন সৃষ্টিজীবকে আপনার প্রতিনিধি বানাচ্ছেন যারা পৃথিবীতে খুন-খারাবী করবে। আমরা আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করি এবং আপনার ইবাদতে মশগুল থাকি। এই মর্যাদা আপনি আমাদের দিন।" আল্লাহ্ জবাব দিলেন, "তোমরা এ বিষয়ে অবগত নও।" আল্লাহ তা'আলা আদম (আ.) ও ফেরেশ্তাগণের পরীক্ষা গ্রহণ করলেন। যেহেতু আদম (আ.) এই মাটির তৈরী ছিলেন, দুনিয়াটাকে তাঁর ব্যবহার করতে হবে, দুনিয়ার সাথে তাঁর স্বভাবের সম্পর্ক ও সামঞ্জস্য ছিল, তাই তিনি দুনিয়ার প্রতিটি বস্তু সম্পর্কে অবগত ছিলেন। তিনি ঠিক ঠিক উত্তর দিলেন। এসব বস্তুর সঙ্গে ফেরেশ্তাগণের কোন যোগসূত্র ছিল না, তাই তাঁরা জবাব দিতে পারলেন না।

এভাবেই আল্লাহ্ তা'আআলা দেখিয়ে দিলেন, পৃথিবীর ব্যবস্থাপনা ও এই ওয়াক্ফের দায়িত্ব বহনের জন্য নিজের সব রকম মানবীয় দুর্বলতা সত্ত্বেও মানুষই উপযুক্ত, বরং এসব দুর্বলতা ও এসব মুখাপেক্ষিতাই তাকে এমন মর্যাদার জন্য উপযুক্ত সাব্যস্ত করেছে। যদি এই পৃথিবীতে ফেরেশতাগণ বাস করতেন, তাহলে পৃথিবীর অধিকাংশ নেয়ামতই অর্থহীন প্রতীয়মান হতো এবং পৃথিবীর সেই উন্নতি ও অগ্রগতি কখনো ঘটত না যা ঘটিয়েছে মানুষ তার প্রয়োজন ও চাহিদাকে ভিত্তি করে।

সফল স্থলাভিষিক্ত

কিন্তু এ বিষয়টিও আপনাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, নায়েব বা স্থলাভিষিক্তের জন্য ফরয হলো, যিনি স্থলাভিষিক্ত করেছেন, তার পরিপূর্ণ আনুগত্য করা। তাকে তার চরিত্রের নমুনা ও প্রতিভূ হতে হবে। আমি যদি এখানে কারো স্থলাভিষিক্ত হই, তাহলে সফল ও বিশ্বস্ত স্থলাভিষিক্ত আমাকে তখনই বলা হবে যখন আমি আমার সমগ্র সামর্থ্য ব্যয় করে তার অনুসরণ করবো এবং নিজের মধ্যে তার চরিত্র সৃষ্টি করবো। আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব হলো এই যে, আমাদের নিজেদের মধ্যে তাঁর স্বভাব সৃষ্টি হবে এবং তাঁর গুণাবলীর সাথে আমাদের সম্পর্ক ও সামঞ্জস্য ঘটবে। আর আমাদেরকে জানানো হয়েছে যে, তাঁর গুণাবলী ও চরিত্রের মধ্যে রয়েছে প্রজ্ঞা, দয়া, কৃতজ্ঞতা, অনুগ্রহ, পরিচালনা, পবিত্রতা, ক্ষমা ও মার্জনা, দান-দক্ষিণা, ন্যায় পরায়ণতা, হেফাযত ও সংরক্ষণ, ভালোবাসা, কঠোরতা ও মমতা, অপরাধীদের পাকড়াও করা ও শাস্তি দেওয়া, সর্ববিষয়ে সমন্বয় ও ব্যাপকতা প্রভৃতি।

আল্লাহ্র গুণাবলীর প্রকাশ

আল্লাহ্র নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) মানুষকে শিখিয়েছেন: তোমরা আল্লাহ্র গুণাবলী অবলম্বন কর تخلقوا باخلاق الله। মানুষ তার সীমিত মানবীয় গণ্ডির মধ্যে থেকে ও তার যাবতীয় মানবীয় দুর্বলতা সাথে নিয়ে আল্লাহ্র এই সব আখলাক ও গুণের প্রতিচ্ছবি নিজের মধ্যে সৃষ্টি করতে সক্ষম। মানুষ কখনো আল্লাহ্ হতে পারবে না, কিন্তু পৃথিবীতে আল্লাহ্র গুণাবলীর প্রকাশ ঘটাতে পারবে। এতে সে সক্ষম। আর সাচ্চা প্রতিনিধির কাজ এটাই আপনি ভাবতে পারেন, যদি মানুষ প্রকৃতই নিজেকে আল্লাহ্র প্রতিনিধি মনে করতে থাকে এবং আল্লাহ্র গুণাবলীকে নিজের জীবনের মানদণ্ড বানিয়ে নেয়, তাহলে স্বয়ং তার অগ্রগতি, উন্নয়ন ও তার প্রতিনিধিত্বের আমলে পৃথিবীর সুখ ও প্রাচুর্যের রূপ কেমন হবে?

ধর্ম তো মানুষের একটি উন্নততর ভারসাম্যপূর্ণ রূপ ও ধারণা (Concept) দান করেছে। ধর্ম মানুষকে আল্লাহ্র প্রতিনিধি, এই যমীন পরিচালনায় আল্লাহ্র স্থলাভিষিক্ত এবং এই মহত্তর ওয়াক্ফের মুতাওয়াল্লী ঘোষণা করেছে। মানুষের সম্মান ও মানবতার উত্থান এর চেয়ে অধিক আর কিছুই হতে পারে না।

বিপরীত দু'টি রূপ

কিন্তু মানুষ নিজেই নিজের ব্যাপারে বিপরীতধর্মী দুটি রূপ দাঁড় করিয়েছে। কোথাও তো মানুষকে আল্লাহ্ বানানো হয়েছে এবং তার উপাসনা শুরু হয়েছে। কোথাও মানুষকে পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট মনে করে নেওয়া হয়েছে এবং গরু-গাধার মত তাকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কিছু মানুষ নিজেই আল্লাহ্ সেজে বসেছে এবং কিছু মানুষ নিজেকে পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট ধরে নিয়েছে। সে মনে করে, আমাদের কাজ শুধু পেটের সঙ্গে জড়িত এবং আমাদের দেওয়া হয়েছে একটি নফ্স বা রিপু। এই উভয় ধারণাই ভুল ও ভ্রান্তিপূর্ণ, বরং সরাসরি জুলুম ও সীমা লংঘন।

মানুষ আল্লাহ্ও নয়, মানুষ পশুও নয়, মানুষ মানুষই। কিন্তু মানুষ হওয়ার কারণেই সে আল্লাহ্র প্রতিনিধি। সমগ্র জগতটাকে তার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, আর তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে আল্লাহ্র জন্য। সমগ্র জগত তার সামনে জবাবদিহি করবে, সে জবাবদিহি করবে আল্লাহ্র সামনে। এই যমীন, এই পৃথিবী কারো ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়, এটি একটি ওয়াক্ফ এবং মানুষ তার মুতাওয়াল্লী। এরূপ ধারণা ও এই বিশ্বাস ব্যতীত পৃথিবীর যথার্থ মান নির্ণয় সম্ভব নয়। ইতিহাসের সাক্ষ্য বিদ্যমান, যখন মানুষ এই সঠিক রাস্তা থেকে সরে গেছে, নিজের সীমানা লংঘন করেছে, আল্লাহ্ সাজার চেষ্টা করেছে এবং নিজেকে পৃথিবীর আসল মালিক ভেবে নিয়েছে অথবা নিজের অবস্থান থেকে বিচ্যুত হয়ে নীচে পড়ে গেছে, নিজেকে পশু ভেবে নিয়েছে অথবা পৃথিবীর পরিচালনাও দায়িত্ব থেকে হাত উঠিয়ে নিয়েছে এবং

জীবনের সমূহ যিম্মাদারী ও ফরয পালন না করে পালিয়ে গেছে, তখন সে নিজেও বরবাদ হয়েছে এবং এই দুনিয়াও ধ্বংস হয়েছে।

মানুষের জড় রূপ

আজকের যুগে ইউরোপের (বর্তমানে আমেরিকার।--অনুবাদক) হাতে দুনিয়ার লাগাম এবং সে মানবতার সরদার (Leader) সেজে বসে আছে। সে তো পশুত্বের স্তর থেকেও এক ধাপ সামনে বেড়ে গেছে। সে মানুষকে জড় পদার্থ রূপে উপস্থাপন করেছে। সে বলে থাকে, মানুষ হলো পয়সা ঝরানোর যন্ত্র এবং একটি সফল টাঁকশাল। তবে তার মধ্যে রয়েছে চাহিদা ও প্রবৃত্তি; কিন্তু তা স্পষ্টতই পাশবিক। হায়! যদি সে মানুষকে শুধু একটি যন্ত্রই বানিয়ে রাখত, যার মাঝে কোন প্রবৃত্তি ও ইচ্ছা শক্তি থাকবে না। জুলুমের চেয়েও অধিক জুলুম হলো, সেখানকার মানুষ একদিকে যন্ত্র হলেও অপরদিকে স্বার্থপর ও নিপীড়নকারী। ইউরোপের (বর্তমানে আমেরিকার অনুবাদক) এই কর্তৃত্বের যুগে গোটা পৃথিবী একটি প্রাণহীন কারখানায় (Factory) পরিণত হতে যাচ্ছে, যেখানে কখনো কখনো বড়ই ভয়ংকর সব দুর্ঘটনা ঘটে চলেছে। এই যান্ত্রিক যুগে কোমল মানবিক আবেগ-অনুভূতি, মানুষের প্রতি সহানুভূতি ও হৃদয়ের ঔদার্য অনুসন্ধান করেও পাওয়া যাচ্ছে না। এই টাঁকশালে কোথাও আল্লাহ্‌র নাম নেই, আল্লাহ্‌র সন্ধান নেই, অন্তরের বিগলন নেই, চোখে অশ্রু নেই, হৃদয়ে উত্তাপ নেই, মানবিকতার কোমলতা নেই; তা তো মানুষের দিল নয়, তা হলো পাথরের শিলা। যেই চোখে কখনো অশ্রু আসে না, তাতো মানুষের চোখ হতে পারে না, তা হলো নার্গিস ফুলের চোখ!

জীবিকার সংকট অথবা আনন্দ ছাড়া বিনোদন

এখন টাকা, পেট আর স্বার্থ ছাড়া কিছু নেই। আমি নিজের শহরে সকালে হাঁটতে বের হই। লোকজনের বিভিন্ন জমায়েত ও বন্ধুদের বিভিন্ন বৈঠকের পাশ দিয়ে চলতে হয়। এদিক থেকে দু'জন যায়, ওদিকে থেকে চারজন আসে। কিন্তু তখন এসব কথা ছাড়া আর কিছুই শুনতে পাই না, আপনার বেতন কত? আপনার উপরি আয় কি পর্যন্ত হয়? আপনার বদলি কোথায় হচ্ছে? অমুক অফিসারটি বদমেযাজী, অমুক অফিসার খুব ভাল, ছেলের বিয়েতে এত টাকা খরচ হয়েছে, মেয়েকে এ পরিমাণ যৌতুক দিয়েছি, আমার ফান্ডে এত সঞ্চয় রয়েছে, অমুকের ব্যাংকে এ পরিমাণ ব্যালেন্স রয়েছে। আর এখন তো ক্রিকেট চর্চার যুগ চলছে। সব জায়গায় ক্রিকেটের আলোচনা, সব জায়গায় খেলোয়াড়দের ওপর আলোকপাত। আমি খেলাধুলার বিরোধী নই। নিজেও খেলেছি এবং খেলার প্রতি রুচিও বোধ করি। ব্যায়াম ও বীরত্বব্যঞ্জক খেলাধুলাকে উপকারী ও আবশ্যকীয় মনে করি। কিন্তু এর অর্থ এই নয়, এটাই জীবনের একটি আলোচ্য বিষয় হয়ে

থাকবে এবং সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এর আলোচনায় কোন বিরতি পড়বে না। আপনারা হয়তো শুনেছেন, পাকিস্তানের এই খবর পেয়ে এক লোক হার্টফেল করে মারা গেছে, এক খেলোয়াড় নিরানব্বই রান করে আউট হয়ে গেছে, সেঞ্চুরী করতে পারেনি। আমি কোন কোন সফরে দেখেছি, দুই-তিন ঘণ্টা পর্যন্ত অব্যাহতভাবে ক্রিকেট টিম ও তাদের খেলা নিয়ে আলোচনা চলেছে। এক মিনিটের জন্য বিষয়বস্তু বদলায় নি। মানুষ! তুমি পৃথিবীকে ক্লাব বানিয়েছ, টাঁকশাল বানিয়েছ, কারখানা বানিয়েছ, যুদ্ধের ময়দান বানিয়েছ, কিন্তু মানুষের বসতি বানাতে পার নি।

হৃদয়ের সত্য পিপাসা

আগে প্রতিটি গ্রামে, প্রতিটি শহরে আল্লাহ্‌র এমন কিছু বান্দার সন্ধান পাওয়া যেত, যাদের মাধ্যমে হৃদয়ের পিপাসা নিবারিত হতো। জিহ্বার যেমন পিপাসা জাগে, তেমনি হৃদয়েরও পিপাসা জাগে। জিহ্বার পিপাসা পানি, শরবত, সোডা, লেবু দ্বারা নিবারণ করা হয়, আর হৃদয়ের পিপাসা নিবারণ করা হয় সত্য ও পবিত্র ভালোবাসার কথাবার্তা ও প্রকৃত প্রেমাস্পদের আলোচনা দ্বারা। টাকা, সম্পদ আর প্রবৃত্তির তাড়নার কথায় হৃদয় উত্তেজিত হয়। বর্তমানে সব জিনিসের দোকান, মেলা ও বাজার বিদ্যমান। সব জিনিসই সহজলভ্য। কিন্তু আত্মা ও হৃদয়ের খাদ্য দুষ্প্রাপ্য হয়ে যাচ্ছে। বহুদিন ধরে কবি বলে যাচ্ছেন ঃ

'ও জো বেচতে থে দাওয়ায়ে দিল,

'ও দুকান আপনি বড়হা গায়ে।

[হৃদয়ের ঔষধ বিক্রি করত যেই দোকান, আমার সেই দোকানটি এখন জীর্ণ হয়ে গেছে ।]

আজ আল্লাহ্‌র স্মরণ ঘর-বাড়িতে নেই, রেলগাড়িতে নেই, এমন কি মসজিদ-মন্দিরেও প্রভুর স্মরণ সাংঘাতিকভাবে হ্রাস পেয়েছে। আজ স্থানে স্থানে রিপু ও প্রবৃত্তি, খানা-পিনার ধ্বনি উচ্চকিত। জীবন যাপনের অর্থাভাব? এই অভাব পূরণ করে দেয় সিনেমা, যা পাশবিক তাড়না জাগিয়ে তোলার কাজ করে। আত্মা অস্থির, আল্লাহর বান্দা চলেছে কোথায়? যদি শুধু পয়সা উপার্জনই মানুষের কাজ হতো এবং পেট ভরে নেওয়াই তার কর্তব্য হতো, তাহলে এই হৃদয় মানুষকে কেন দেওয়া হলো? বিবেক কেন দান করা হলো? এমনি চঞ্চল ও উচ্চাভিলাষী আত্মা কেন প্রদান করা হলো? এমন তুলনাহীন, বিস্ময়কর ও অভিনব সব যোগ্যতাই তাকে কেন অর্পণ করা হলো?

মানবতার প্রতি মমতা নেই

ইউরোপ মানুষকে ইন্ধন ভেবে নিয়েছে। সে নিজের মান-মর্যাদা ও প্রবৃত্তির অগ্নিকুণ্ডে মানুষকে লাকড়ি ও কয়লার মতো ব্যবহার করছে। আমেরিকা চায় উত্তর

কোরিয়া ও কমিউনিস্ট চীনে বিক্ষোভ ছড়িয়ে দিতে। রাশিয়া চায় জাতীয়তাবাদী চীনকে ধ্বংস করে দিতে। গোটা ইউরোপ চায় দূরপ্রাচ্য অথবা মধ্যপ্রাচ্য যুদ্ধের ময়দানে পরিণত হোক! মানবতার প্রতি কারো মমতা নেই। কারো হৃদয়ে মানুষের প্রতি সম্মানবোধ নেই।

সবাই আল্লাহর রাজত্বের লুণ্ঠনকারী হতে চায়। কেউ আল্লাহ নায়েব হতে চায় না। কেউ নিজেকে এই পবিত্র ওয়াক্‌ফের মুতাওয়াল্লী মনে করে না। এশিয়া, আফ্রিকাতেও রাষ্ট্রের ভিত্তি হেদায়াত ও পথ-প্রদর্শনের নীতি, মানুষের সাফল্য ও কল্যাণ, নৈতিক সংশোধন ও মানবতার উন্নয়নের ওপর নেই। সবারই ভিত্তি সম্পদগ্গত উপাদান, আয়ের উপকরণ ও এতদুভয়ের বৃদ্ধি ও সংযোজনের ওপর। তাদের কাছে জাতির নৈতিক অবস্থান ও মানবিক সমস্যাগুলোর কোন গুরুত্ব নেই। এ কারণে আর্থিক ক্ষতি বরদাশত করতে কেউ প্রস্তুত নয়। যদি কোন ভুল প্রতিষ্ঠান কিংবা কোন বিনোদনমূলক শিল্প থেকে তাদের মোটা আয়ের ব্যবস্থা হয় এবং জাতির কোন শ্রেণী অথবা নতুন প্রজন্মের জন্য তা ক্ষতিকর প্রমাণিত হয়, তথাপি তারা আয়ের এই অনৈতিক ব্যবস্থা থেকে হাত গুটিয়ে নিতে প্রস্তুত নয়, এমন কি এ কারণে আগত প্রজন্ম সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেলে এবং নৈতিক চরিত্র সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হয়ে গেলেও তাদের কিছুই যায় আসে না।

আমাদের কাজ

বর্তমানে ঈমান, নৈতিকতা ও মানবতা নির্মাণের কাজ রাষ্ট্রের ওপর ছেড়ে দেওয়া যায় না, ছেড়ে দেওয়া যায় না সংস্থা-প্রতিষ্ঠান ও বিদ্যায়তনগুলোর ওপর। এটা অত্যন্ত ব্যাপক ও বিশ্বজনীন কাজ। এ কাজে আমাদের সকলের প্রচেষ্টা ব্যয় করা উচিত। মনে রাখবেন, সাধারণ মানুষ ও সাধারণ জনগণ যে কাজ করতে প্রস্তুত হবে না এবং যে কাজের গুরুত্বের উপলব্ধি ব্যাপক জনগোষ্ঠীর মাঝে জাগবে না সে কাজ যত সহজই হোক, বাস্তবায়িত হবে না। বড় থেকে বড় রাষ্ট্রও সে কাজ আঞ্জাম দিতে পারবে না। আসলে এর জন্য দরকার ব্যাপক ও গণপ্রচেষ্টার।

আম্বিয়াগণ ব্যক্তিগতভাবে নিজের চেষ্টা ও জনসাধারণের চেষ্টায় বিপ্লব জাগিয়ে তুলেছেন। আমাদের ও আপনাদেরকে তাঁদের পদচিহ্নের ওপর চলেই এই কাজের প্রচেষ্টা শুরু করা উচিত। স্বয়ং নিজের ইসলাহ ও সংশোধন করা উচিত এবং ব্যাপক সংশোধনের প্রচেষ্টা চালানো উচিত। এই চেষ্টা করা উচিত, মানুষ যেন এই পৃথিবীকে একটি পবিত্র ওয়াক্‌ফ সম্পদ ও নিজেকে তার দায়িত্বশীল মুতাওয়াল্লী মনে করে। চেষ্টা করা উচিত, মানুষ যেন নিজেকে আল্লাহ্‌র প্রতিনিধিত্বের উপযুক্ত পাত্ররূপে প্রতিষ্ঠিত করে এবং আল্লাহ্‌র নৈতিক গুণাবলী অবলম্বন করে সকল সৃষ্ট জীবের প্রতি আচরণ করে। এটাই সংশোধনের পদ্ধতি এবং এরই মাঝে রয়েছে মানুষ ও পৃথিবীর পরিত্রাণ।

কৃত্রিমতা বনাম বাস্তবতা

প্রতিটি জিনিসের একটা বাস্তব রূপ আছে, সাথে রয়েছে তার একটি কৃত্রিম রূপ। দুটো রূপ যদিও দেখতে এক কিন্তু বাস্তবে এদের মাঝে আছে বিস্তর ফারাক। আমরা আমাদের জীবনে অতি সহজেই এদু'য়ের পার্থক্য নির্ণয় করে থাকি। সেই সাথে বাস্তব রূপকে যেভাবে মূল্যায়ন করে থাকি ঠিক সেভাবে কৃত্রিম রূপের মূল্যায়ন করা হয় না। উদাহরণস্বরূপ মাটির তৈরী কৃত্রিম ফল দেখতে যদিও রঙে ও আকৃতিতে হুবহু আপেল, ডালিম কিংবা কলার মত দেখায়, কিন্তু বাস্তবে কি তা প্রকৃত ফল? এসব কৃত্রিম ফল ও প্রকৃত ফল কি এক হতে পারে? না, কখনও নয়। কারণ এসব কৃত্রিম ফলের স্বাদ নেই ,গন্ধ নেই। এগুলো তো শুধু শিশুদের খেলনা বা শোভা বর্ধনের জন্য।

আমরা যাদুঘরে বিভিন্ন ধরনের জীবজন্তু, রঙ-বেরঙের পশু-পক্ষী ও রকমারী হিংস্র প্রাণী দেখতে পাই, তন্মধ্যে বাঘ-সিংহ, হাতি-ভল্লুক, শিকারী পাখি ও নানা ধরনের ভয়ংকর হিংস্র প্রাণী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু সেগুলো মূলত প্রাণহীন, নিস্তেজ শরীরমাত্র যার নড়াচড়া করার শক্তি নেই। এগুলো ঘাস ও তুলাভর্তি মৃতদেহ, যাতে প্রাণের স্পন্দন নেই, নেই কোন আক্রমণাত্মক শক্তি। তাইতো তাদের কোন পদধ্বনি অনুভূত হয় না এবং হুংকার কিংবা গর্জনও শোনা যায় না।

মোদ্দা কথা, কৃত্রিমতা কখনোই বাস্তবতার স্থান পূরণ করতে বা তার প্রতিনিধিত্ব করতে পারে না। সেই সাথে মানব জীবনে বাস্তব রূপের ভূমিকা পালন করাও তার পক্ষে সম্ভব নয়। তার মাঝে শক্তি-সামর্থ্য থাকলেও তা বাস্তবতার মুকাবিলায় টিকতে পারে না। শুধু তাই নয়, কৃত্রিমতা কখনো বাস্তবতার সাথে মুকাবিলা করা বা তার সাথে প্রতিযোগিতা করতে সক্ষম নয়, বরং উভয়ের মাঝে কখনো সংঘর্ষে বেঁধে গেলে নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, কৃত্রিমতা সেখানে ধরাশায়ী হবেই। এই কৃত্রিমতা বাস্তব রূপের দায়িত্ব ভার বহন করতেও অপারগ। যদি কেউ বাস্তব রূপের দায়িত্বভার কৃত্রিম রূপের কাঁধে অর্পণ করে অথবা কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজে কৃত্রিমতার কাছে আশ্রয় নেয় তবে অবশ্যই সে প্রতারিত হবে এবং এ কারণে তাকে লজ্জিতও হতে হবে।

কৃত্রিম রূপ যত বড় ও ভয়ংকরই হোক না কেন, বাস্তব রূপ তার ওপর বিজয় লাভ করবেই করবে, হোক না তা যতই দুর্বল। কারণ নগণ্য একটি বাস্তব রূপ বিরাটকার ভয়ংকর কৃত্রিম রূপের তুলনায় অনেক গুণ বেশি শক্তিশালী ও

ক্ষমতাবান। তাইতো একজন অবুঝ শিশুর পক্ষে তার কোমল হাতে তূলা ও খড়ের তৈরি প্রাণহীন বাঘকে উল্টে দেওয়া সম্ভব হয়। কারণ শিশুটি বাস্তবতার অধিকারী যদিও তার রূপটি অতি নগণ্য। অন্যদিকে বাঘটি কৃত্রিম রূপ ছাড়া আর কিছুই নয় যদিও বা তার রয়েছে বিশালকায় ও ভয়ংকর আকৃতি।

আমরা যে ধরণীতে বসবাস করছি, এখানে বাস্তবতার একটি জগত আছে, আছে কিছু বাস্তব বিষয়। কারণ আল্লাহ্ তাআলা প্রতিটি বস্তুকে একটি বাস্তবতা দিয়েই সৃষ্টি করেছেন। যেমন ধন-দৌলতের একটি বাস্তবতা আছে, আছে তার একটা সৃষ্টিগত স্বভাব ও বৈশিষ্ট্য। এর মাঝে আল্লাহ তাআলা ক্রিয়াকরণ ও আকর্ষণ শক্তি দান করেছেন। তাই এর প্রতি মানুষের মুহাব্বত হওয়া সাধারণ ও স্বাভাবিক ব্যাপার আর এ কারণেই তিনি এ ব্যাপারে অসংখ্য আহকাম, বিধি-বিধান দান করেছেন। অনুরূপভাবে সন্তান-সন্ততিরও একটি বাস্তবতা আছে। এদের প্রতি স্নেহ-মমতা ও প্রেম-ভালবাসা একটি সৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্য। এজন্যেই তাদের শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা করা, তাদের আদর্শ মানুষ হিসাবে গড়ে তোলার ব্যাপারে বিধি-বিধান দান করেছেন। তেমনিভাবে মানবিক চাহিদা ও সৃষ্টিগত আকর্ষণের একটি বাস্তবতা আছে যা আমরা অস্বীকার করতে পারি না এবং এর ওপর অন্য কোন বাস্তবতা প্রভাবও বিস্তার করতে পারে না। তবে হ্যাঁ, যদি তার চেয়ে অধিক শক্তিশালী ও আকর্ষণীয় কোন বাস্তবতা থাকে, তবে এ বাস্তবতার ওপর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম। ঠিক তেমনি আমরা দুনিয়া বিস্তৃত সকল বাস্তবতার ওপর বিজয় লাভের জন্য ইসলাম ও ঈমানের বাস্তব রূপের প্রয়োজন অনুভব করে থাকি। কারণ ইসলামের কৃত্রিম রূপ এতই অক্ষম যে, তার পক্ষে কোনক্রমেই সম্ভব নয়, সে ঐ সকল মিশ্রিত বাতিল মিশ্রিত বাস্তব রূপের সাথে প্রতিযোগিতায় নেমে তাদেরকে ধরাশায়ী করবে। কেননা শুধু কৃত্রিম কোনভাবেই অতি নগণ্য একটি বাস্তব রূপের ওপর বিজয় লাভে অক্ষম। এ কারণেই আমরা প্রতিনিয়ত প্রত্যক্ষ করছি, ইসলামের বাহ্যিক রূপ অতি নগণ্য বস্তুবাদী বাস্তবতার ওপর বিজয়ী হতে পারছে না। কারণ এ কৃত্রিম রূপের বাহ্যিক দিকটা দেখতে অতি পবিত্র ও আকর্ষণীয় মনে হলেও অন্যের ওপর প্রভাব বিস্তারকারী বা অন্যকে ধরাশায়ী করার ক্ষমতা তার কাছে নেই। তাইতো বর্তমানে আমাদের ইসলাম আমাদের কালেমা ও আমাদের নামাযের বাহ্যিক রূপ আমাদের সামান্য অভ্যাসও পরিবর্তন করতে পারে না, পারে না আমাদের মনোবৃত্তিকে বশীভূত করতে। জ্ঞান পারে না আমাদের ঈমান ও ইবাদতের লৌকিক রূপ, বালা-মুসীবতের সময় হকের ওপর সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত রাখতে।

যে কলেমাটি আগে মানুষের মন ও আত্মার ওপর বিস্ময়কর প্রভাব ফেলত, যে কলেমা মানুষেকে তার অতি প্রিয় বস্তু ত্যাগ করা সহজ করে দিত, মনচাহি যিন্দেগী

অবদমন করতে পারত, যে কালেমা একমাত্র আল্লাহ্র জন্য নিজের জান-মাল ও সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়ে আল্লাহ্রই পথে শহীদ হওয়ার পথ সহজ করে দিত, যে কালেমা আল্লাহ্র রাস্তায় যাবতীয় কষ্ট-ক্লেশ ও তিক্ত অভিজ্ঞতা হাসিমুখে বরণ করে নেওয়ার শক্তি যোগাত, সেই অনন্য কালেমাটি আজ সারা রাত গভীর ঘুমে ডুবে থাকা মানুষকে ফজরের নামাযের জন্য বিছানা ত্যাগ করাতে পারছে না। হ্যাঁ! এতো সেই কালেমা যা একদিন মাদকাসক্তির ওপর বিজয় লাভ করেছিল, যে মানুষদের মাঝে খুঁজে পেত প্রশান্তি, সেই মানুষও মদের গ্লাসের মাঝে এই কালেমাই লৌহ প্রাচীরের মত বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে তাকে মদ্য পান থেকে বিরত রেখেছিল। কারণ তার দীন ইসলাম তাকে মদ্য পান থেকে বিরত থাকতে বলে। আর যে কালেমা সে পাঠ করেছে, তাতো হারাম পানীয়কে কঠোরভাবে অস্বীকার করে। সেই কালেমাই আজ প্রভাব-প্রতিপত্তিহীন হয়ে পড়ে আছে। আদেশ-নিষেধ, বাধা-বাধ্যকতার কোন শক্তি তার কাছে অবশিষ্ট নেই।

ইসলামী ইতিহাসের সোনালী দিগন্তে একটু নজর বুলিয়ে দিন, ইতিহাসের পাতাও একটু উল্টিয়ে তাতে কিছুক্ষণ বিচরণ করুন, স্পষ্টত বুঝতে পারবেন যে, হযরত সাহাবায়ে কিরাম (রা) ও প্রথম শতাব্দীর মুসলমানরা যে 'ইসলাম' শব্দটি উচ্চারণ করতেন বা তাঁদের কাছে যে ইসলাম পরিচিত ছিল, তা কিন্তু এক মজবুত বাস্তবতাসমৃদ্ধ ইসলাম ছিল। তাঁদের সেই শব্দ বা কালেমাটি একটি পূত-পবিত্র ও উন্নত বৃক্ষের মত যার মূল শিকড় জমীনে আর শাখা-প্রশাখা আকাশ জুড়ে বিস্তৃত। আল্লাহর হুকুমে সে বৃক্ষটি নিয়মিত ফল দিতে থাকে। পক্ষান্তরে আমাদের মুখে সদা উচ্চারিত শব্দ অর্থহীন ও অন্তসারশূন্য ব্যর্থ কথা। তাই আপনি দেখবেন আমাদের মুখে উচ্চারিত 'ইসলাম' জাতীয় জীবনে কোন প্রভাব ফেলতে পারছে না। এরপরও আমরা আমাদের জীবনে মহানবী (সা) ও তাঁর সাহাবাদের জীবনাদর্শ বাস্তবায়ন করতে চাই। আমরাও চাই মুখে উচ্চারিত 'ইসলাম' নিছক শব্দের গণ্ডিতে বন্দী না থেকে তা সদা ফুলে ফলে বিকশিত হোক। আর এ শব্দকে কেন্দ্র করে অতীতের মত বর্তমানেও ঘটুক অজস্র যুগান্তকারী ঘটনা। আমরা সাহাবাদের মত হতে চাই বটে, কিন্তু তাঁদের ন্যূনতম অনুসরণও আমরা করি না যেন এমনিতেই তাঁদের মত হয়ে যেতে পারব। পরে ব্যর্থ হলে আমরা মনে মনে বলে বেড়াই, আমরা কি মুসলমান নই? আমরা কি নামায পড়ি না? রোযা রাখি না? আমরা কি সকাল-বিকাল কালেমা পড়ি না? আমাদের এত কিছুর পরও খুলাফায়ে রাশেদার যুগ ও আমাদের যুগের মাঝে এ বিস্তর ফারাক কেন? তাঁদের ও আমাদের ঈমানের প্রাপ্ত অংশের মাঝে কেনই বা এ দূরত্ব? আমরাও তো ঈমান এনেছি কিন্তু ঈমান বৃক্ষের সে ফল কই? নামায-রোযার সুফলও তো লক্ষ্য করছি না? আর কোথায়ই বা আল্লাহপাকের সে ওয়াদা যে, তিনি মু'মিনদেরকে সাহায্য করবেন, সৎ

কর্মপরায়ণ মু'মিনদেরকে খিলাফত দান করবেন এবং এ দুনিয়ার কর্তৃত্ব দান করবেন?

সাবধান! ঈমান ও আমলের সামান্যটুকু পুঁজি নিয়ে আমরা যেন আত্মপ্রবঞ্চনায় না পড়ি আসল কথা হলো, আমাদের পূর্বসূরী সাহাবায়ে কিরাম ছিলেন দীনের জন্য একনিষ্ঠ নিবেদিতপ্রাণ। তাঁদের কালেমা ছিল বাস্তবতাসমৃদ্ধ। তাঁদের নামায-রোযায় ছিল এক অনন্য শক্তি। পক্ষান্তরে আমরা হলাম বাস্তবতাশূন্য ঈমানদার ও অন্তরসারশূন্য মুসলমান [আমাদের কালেমাতে যেমন বাস্তবতার ছোঁয়া নেই, তেমনি নামায-রোযা ইত্যাদিও শুধুই আনুষ্ঠানিকতা মাত্র।] সুতরাং এমতাবস্থায় একটি রূপক ও শব্দসর্বস্ব কালেমা দিয়ে বাস্তবতাসমৃদ্ধ কালেমার অনুরূপ ফল আশা করা শুধু কল্পনা বিলাসই নয়, বলতে গেলে অসম্ভব।

হযরত খুবায়ব (রা) ইসলামের ইতিহাসের এক স্মরণীয় নাম। তাঁর ঘটনা হয়ত আপনাদের অজানা নয় যখন শত্রুরা তাঁকে শূলির দণ্ডে তুলল, বিভিন্ন দিক থেকে তীর-বল্লম নিক্ষেপ করতে লাগল। একে একে তাঁর শরীর ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। কিন্তু তিনি অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে সেসব সহ্য করলেন। তাঁর মুখে বেদনার কোন চিহ্নমাত্র নেই। নেই কোন শোক, ক্রন্দন বা অভিযোগ। এমন করুণ মুহূর্তে নির্দয় কাফেররা তাঁকে বলল, "তোমার স্থানে মুহাম্মদ নির্যাতিত হোক তা কি তুমি চাও?" প্রশ্ন শোনামাত্র তাঁর দেরী নেই। অস্থির কণ্ঠে নির্দ্বিধায় বলে ওঠেন, "আল্লাহর কসম! আমার জীবন বাঁচাতে গিয়ে প্রিয় নবীজির শরীর মুবারকে একটি কাঁটাও বিদ্ধ হবে, তা আমি কখনোও সইতে পারি না।"

মুসলিম উম্মাহর চিন্তা করার বিষয়, এমন এক বিভীষিকাময় স্থান ও চরম সংকটের মুহূর্তে যে শক্তিটি হযরত খুবায়বকে পাহাড়ের মত অবিচল রেখেছিল এবং মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে প্রিয় নবীজির প্রেম-ভালবাসার যে অনুপম বাণী তাঁর মুখ দিয়ে বের হয়েছিল, তা কি নিছক ইসলামের শাব্দিক রূপের কারণে হয়েছিল? না, কখনো নয়, বরং তা ছিল ইসলামের বাস্তব রূপেরই কারিশমা যা তাঁর সামনে জান্নাতের দরজা খুলে দিয়েছিল। যে কঠিন মুহূর্তে তাঁর দেহ তীর-বল্লমের অবিরাম আঘাতে ঝাঁঝরা হচ্ছিল, তাঁর শরীর ধীরে ধীরে অকেজো হতে চলছিল, তখন তাঁর মন জুড়ে বিস্তৃত ইসলামের বাস্তব রূপ তাঁকে সান্ত্বনার বাণী শোনচ্ছিল। তাঁর কানে কানে বলছিল "খুবায়ব! একটু ধৈর্য ধর। কয়েক মুহূর্তে মাত্র। ঐ দেখ, জান্নাত তোমার জন্য অপেক্ষা করছে। বেহেশতের হুররা তোমায় বরণ করতে অপরূপ সাজে প্রস্তুত হয়ে আছে। তোমার প্রতীক্ষায় আছে আল্লাহর অপার কৃপা। তোমার এ ক্ষয়িষ্ণু দেহ ও মরণশীল জীবন যদিও সাময়িক কষ্ট সহ্য করতে পারে, তবে মনে রেখ আখিরাতের অনন্ত সুখ ও চিরন্তন সফলতা তোমার পথ চেয়ে আছে।"

এটাই হলো আত্মিক প্রশান্তি, ঈমান ও প্রেম-ভালবাসার বাস্তব নমুনা। এ বাস্তবতাই হযরত খুবায়বকে অস্বীকার করতে বাধ্য করেছিল যে, তিনি বেঁচে গিয়ে প্রিয় নবী (সা)-এর কদম মুবারকে কাঁটার একটি আঁচড় লাগুক।

পক্ষান্তরে ইসলামের শাব্দিক রূপের পক্ষে কি সম্ভব যে, সে নামসর্বস্ব মুসলমানকে ইখলাস ও ত্যাগের শিক্ষা দেবে? সঠিক আক্বীদা-বিশ্বাসের ওপর পাহাড়ের মত অবিচল থাকার অনুপ্রেরণা দেবে? মৃত্যুর দুয়ারে দাঁড়িয়েও এমন ধৈর্য ধরার সাহস যোগাবে? না, তা কখনোই সম্ভব নয়। কারণ কোন বস্তুর শুধু বাহ্যিক রূপ কখনোই বিপদ-আপদ ও মুসীবতকে প্রতিহত করতে পারে না, এমন কি মনের জল্পনা-কল্পনারও অবসান ঘটাতে পারে না। ভারতের ঘটে যাওয়া সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় এ কথা দিবালোকের মত প্রতিভাত হয়েছে। কেননা মুসলমানদের একদল মৃত্যুভীতি, কঠিন বিপদের আশংকা ও কাল্পনিক যুদ্ধের ভয়ে তারা ইসলামের বাহ্যিক রূপকে পরিবর্তন করে ফেলেছিল, তারা বিভিন্ন কুফরী আদর্শ ও প্রতীক বুকে ধারণ করে নিয়েছিল। কারণ তারা ইসলামের বাহ্যিক রূপকেই প্রাধান্য দিয়েছিল, ইসলামের অন্তর্নিহিত বাস্তবতার সাথে তাদের আদৌ কোন সম্পর্ক ছিল না।

হযরত সুহাইব (রা) হিজরত করে মদীনার পথে রওয়ানা হলেন। পথিমধ্যে মক্কার একদল কাফির তাঁকে বাধা দিয়ে বলল ঃ তুমি একজন হীন দরিদ্র হিসাবে আমাদের কাছে এসেছিলে। আমাদের কাছেই তোমার ধন-সম্পদে সমৃদ্ধি এসেছে এবং তোমার আজকের যে অবস্থান, তাতো আমাদের কাছে থেকেই গড়েছ। আর তুমি এখন তোমার ধন-সম্পদ নিয়ে চলে যেতে চাও। না! এ রকম হতে পারে না। আল্লাহ্‌র কসম! আমরা তা হতে দেব না। তখনই শুরু হয় ইসলামের নিগূঢ় বাস্তবতার সাথে ধন-সম্পদের সংঘাত। উভয়ের মাঝে লেগে যায় এক অনিবার্য সংঘাত আর এ সংঘর্ষে ইসলামই বিজয়ী হলো। কাফিরদের কথা শুনে হযরত সুহাইব (রা) বলেন ঃ আমি যদি আমার যাবতীয় ধন-সম্পদ তোমাদেরকে দিয়ে দিই, তাহলে কি তোমরা আমার পথ মুক্ত করে আমাকে যেতে দেবে? তারা বললঃ হ্যাঁ। তখনই হযরত সুহাইব (রা) যাবতীয় সম্পদের মালিকানা কাফেরদেরকে বুঝিয়ে দিলেন। আর তিনি ইসলামকে বুকে ধারণ করে সন্তুষ্ট চিত্তে চলতে লাগলেন। তাঁর অবস্থা দেখে কিছুতেই মনে হবে না তিনি তাঁর সর্বস্ব হারিয়েছেন বা শত্রুরা তাঁর সবটুকু সহায়-সম্বল কেড়ে নিয়েছে!

আরেকটি ঘটনা। হযরত আবূ সালমা (রা) স্ত্রী-পুত্র নিয়ে মদীনার উদ্দেশে বের হলেন। পথিমধ্যে বনু মুগীরার কিছু লোক তাঁকে দেখে ফেলল। তারা তাঁর দিকে ছুটে এসে তার পথরোধ করে বলল ঃ প্রাণের মায়া নিয়ে তুমি মক্কা ছেড়ে মদীনায় চলে যাচ্ছ তাতে আমাদের বলার কিছুই নেই। আমাদের কোন আপত্তিও নেই।

কিন্তু আমাদের এই যে কন্যা, তাকে তুমি যথেচ্ছা নিয়ে যেতে পারবে না। এই বলে তারা তার হাত থেকে উটের রশি ছিনিয়ে নিল। তাঁর স্ত্রী ও উট দুটোই নিয়ে গেল। ওদিকে বনু আবদুল আসাদ তাঁর শিশু সন্তান সালমাকে নিয়ে চলে গেল। এখন তিনি একা। আর তখনই শুরু হয় ইসলামের সাথে বিবি-বাচ্চাদের প্রতি ভালবাসার সংঘাত। কিন্তু তাতেও ইসলামের যুগান্তকারী বাস্তবতাই বিজয় লাভ করে। হযরত আবূ সালমা (রা) স্ত্রী-সন্তান হারিয়ে পেছনে ফিরে তাকান নি। তাঁদেরকে আল্লাহর দরবারে সোপর্দ করে একা একা মদীনায় পাড়ি জমালেন। নিছক কৃত্রিমতার পক্ষে তা কখনো কি সম্ভব? শাব্দিক অর্থে ইসলামপন্থীরাও কি পারবে নিজের দীন ও আক্বীদা-বিশ্বাসের পথে স্ত্রী-সন্তানদের ত্যাগ করতে? না, তা কোনমতেই সম্ভব নয়, বরং আমরা প্রতিনিয়ত শুনতে পাই, অসংখ্য মানুষ ধন-সম্পদ, স্ত্রী সন্তান-সন্ততি ও দুনিয়ার অন্যান্য মন ভোলানো বস্তুর লোভ-লালসায় শিকার হয়ে শেষতক মুরতাদ হয়ে গেছে।

একদা হযরত আবূ তালহা (রা) নামাযরত ছিলেন। হঠাৎ দেখলেন একটি পাখি তাঁর সম্মুখস্থ বাগানে ঢুকে বের হবার পথ খুঁজে পাচ্ছে না। আবূ তালহা (রা.)-এর ধ্যান-মন সেদিকে নিবদ্ধ হলো। নামাযে কিছুটা বিঘ্ন ঘটল যার কারণে তিনি নামায শেষ করেই বাগানটি আল্লাহ্র ওয়াস্তে দান করে দিলেন। কারণ নামাযে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারে বা নামাযে তাঁর মনোযোগ ও ধ্যানে ব্যাঘাত ঘটাতে পারে এমন কোন বস্তু তার পছন্দনীয় ছিল না, অথচ এ বাগানেরও তো একটি বাস্তবতা আছে, আছে তার ফুল-ফল ও তার আহারের একটা বাস্তবতা। এসব বাস্তবতা দুনিয়ার সাথে সম্পৃক্ত। এগুলোর ওপর একমাত্র ইসলামের নিগূঢ় বাস্তবতাই বিজয়ী হতে পারে। কিন্তু আমাদের নামায বাস্তবতাশূন্য। তাইতো আমাদের নামায বস্তুগত সামান্য বাস্তবতার সাথেও মুকাবিলা করতে পারে না।

ইসলামের ইতিহাসের এক যুগান্তকারী অধ্যায় ইয়ারমুকের যুদ্ধ। মুসলমানরা নামেমাত্র হাজার কয়েক সৈন্য নিয়ে দু'লক্ষাধিক রোমান সৈন্যের মুকাবিলা করে। মুসলিম বাহিনীর পতাকাতলে যুদ্ধরত একজন খৃস্টান সৈন্য বলে উঠল ঃ রোমানদের এ বিশাল সৈন্যবাহিনীর মুকাবিলায় মুসলমানরা নিতান্তই কম। প্রতিধ্বনিত কণ্ঠে বীর সৈনানী হযরত খালিদ ইবন ওয়ালীদ (রা) বলেন ঃ আমার ঘোড়া আশকর যদি সুস্থ হতো তাহলে আমি তাদেরকে আরো অধিক সৈন্য রণক্ষেত্রে জমায়েত করতে বলতাম। হযরত খালিদ (রা.) ছিলেন দৃঢ়চেতা বীর মুজাহিদ। রোমানদের এ বিশাল সৈন্যবাহিনী তাঁকে একটুও বিচলিত করতে পারেনি। কিন্তু কেন ? কেন এ বিশাল সৈন্যদল তাঁর মনে একটুও প্রভাব ফেলতে পারেনি? সশস্ত্র রোমান যোদ্ধাদের এ ভয়ানক সামরিক মহড়া কেন তাঁকে ভীত করতে পারেনি? জবাব একটাই। কারণ তিনি মু'মিন ছিলেন, আল্লাহ পাকের সাহায্যের ব্যাপারে খুবই

আস্থা ছিল তাঁর মনে। ফলে তিনি জানতেন, তিনি এক অপ্রতিরোধ্য বাস্তবতার মালিক। পক্ষান্তরে তাঁর শত্রু শুধু কৃত্রিমতার অধিকারী। আল্লাহ্‌র ওপর অগাধ বিশ্বাস ও দৃঢ় আস্থার ফলে রোমানদের এ সুবিশাল বাহিনীও তাঁর চোখে কাগুজে বাঘে পরিণত হয়। তাঁর মনে এ বিশ্বাসও ছিল, কৃত্রিমতার সংখ্যা যতই ভারি হোক না কেন, ইসলামের বাস্তবতার সাথে মুকাবিলা করতে কখনোই সক্ষম নয়।

আমরা (মুসলিম উম্মাহ্) নিয়মিত কালেমায়ে তাওহীদ ও কালেমায়ে শাহাদাত পাঠ করি। আবার কেউ কেউ এর অর্থও জানি ও বুঝি। কিন্তু আমাদের নির্ণয় করতে হবে, বাস্তবতা এক জিনিস আর বাস্তবতাবিবর্জিত কৃত্রিমতা আরেক জিনিস। উভয়ের মাঝে বিস্তর ব্যবধান। প্রিয় নবীজির প্রিয় সাহাবাগণ ও প্রকৃত মুসলমানগণ কালেমা শাহাদাতের বাস্তবতার ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ফলে তাঁরা যখন "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু" বলতেন, তখন তাঁদের অন্তরে পূর্ণ বিশ্বাস থাকত যে, আল্লাহ ছাড়া সত্যিই কোন মা'বূদ নেই। তিনি ছাড়া আর কোন রব্ব নেই, কোন রিযিকদাতা নেই, লাভ-লোকসানের মালিকও মহান আল্লাহ ছাড়া আর কেউ নন। দৃশ্যমান ও অদৃশ্য সব কিছুর ওপর একচ্ছত্র আধিপত্য একমাত্র তাঁরই। তিনিই সকল সৃষ্টির একক স্রষ্টা ও সার্বভৌমত্বের একক অধিকারী। সব কিছুর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা তাঁরই হাতে। তিনিই একমাত্র আশ্রয়দাতা। তাঁর বিরুদ্ধে আশ্রয় দেয়ার মত কেউ নেই। প্রেম-ভালবাসা, ভয়-ভীতি, চাওয়া-পাওয়ার একমাত্র কেন্দ্রবিন্দু তিনি। এক কথায় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁরা ছিলেন আল্লাহর প্রতি একান্ত অনুগত, একনিষ্ঠ। তাই তাঁরা হতে পেরেছিলেন আল্লাহর পূত পবিত্র খাঁটি বান্দা ও সাহসী কর্মঠ বীর সিপাহসালার। কোন শত্রুকে তাঁরা ভয় পেতেন না। মৃত্যুর শংকায় পিছপা হবার মত লোক তাঁরা ছিলেন না। তাঁরা আল্লাহ্‌র পথে কোন ভর্ৎসনাকারীর ভর্ৎসনারও পাত্তা দিতেন না।

ওপরের দীর্ঘ আলোচনার নিরিখে আমরা একটু আত্মসমালোচনা করে দেখি। একটু চিন্তা করে দেখি, ঈমানের এ বাস্তব রূপ আমাদের মন-মনন, আমাদের রক্ত-মাংস ও শিরা-উপশিরায় মিশে একাকার হয়ে গেছে কি? আমাদের জীবনবৃক্ষ কি ঈমানের আবেহায়াতে সিক্ত হয়েছে? অত্যন্ত দুঃখ ও আক্ষেপের ভাষায় বলতে হয়: না। আমার মনে হয় আমাদের পুরো ব্যাপারটিই ঠিক তার উল্টো। আমরা বাস্তবতার তুলনায় বাহ্যিক রূপ নিয়েই বেশি ব্যস্ত থাকি। আমাদের জীবন যেন কৃত্রিমতার লীলাভূমি, এখানেই আমাদের প্রধান দুর্বলতা। আর এটিই আমাদের দুর্ভাগ্য ও দুর্দশার মূল কারণ।

আমরা সকলেই বিশ্বাস করি, আখিরাত সত্য, জান্নাত সত্য, সত্য জাহান্নামও। মৃত্যুর পর পুনর্জীবনকেও আমরা সত্য বলে জানি। এতদ্‌সত্ত্বেও আমরা কি সাহাবা

কিরাম ও তাবিঈদের মত ঈমানের পূর্ণ বাস্তবতা অর্জন করতে পেরেছি? তাঁদের মধ্যে এমন লোকও ছিলেন যিনি প্রিয় নবীজির মুখে শুনতে পান ঃ

وسارعوا إلى جنة عرضها السموات والارض -

"তোমরা এমন জান্নাতের দিকে অগ্রসর হও যার আয়তন আসমান-যমীন সম বিস্তৃত।"

এ ঘোষণা শুনেই হাতের খেজুর নিক্ষেপ করে বলেন ঃ আমি যদি এ খেজুর খাওয়ার সময়টুকু জীবিত থাকি, তবে তা তো অনেক দীর্ঘ সময়। সঙ্গে সঙ্গে তিনি জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং শেষতক শহীদ হয়ে যান। এর কারণ হলো জান্নাত তাঁর কাছে এমন এক বাস্তবতা ছিল যার ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহ বা সংশয় তাঁর মনে ছিল না। আজ আমাদের মাঝে এমন কেউ আছেন কি যিনি আনাস বিন নযর (রা.)-এর মত দৃঢ় ঈমানবিধৌত নিঃসন্দেহ কণ্ঠে বলতে পারবে, "সত্যি সত্যিই আমি উহুদের দিক থেকে জান্নাতের সুগন্ধি পাচ্ছি?"

নবীজির ইন্তিকালের পর ইয়ারমুক যুদ্ধের ঘটনা। একজন মুসলমান সৈন্য এসে প্রধান সেনাপতিকে বললেনঃ আমি এ মুহূর্তে শাহাদাতের জন্য প্রস্তুত। প্রিয় নবীজির কাছে আপনার বলার কিছু আছে কি? তিনি বলেনঃ হ্যাঁ, নবীজির দরবারে আমার সালাম বলো, সাথে বলবে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন আমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা আমরা সত্যি সত্যিই পেয়ে গেছি।

এবার বলুন, আল্লাহর পথে শাহাদাতের ব্যাপারে পূর্ণ আস্থাশীল ব্যক্তি ছাড়া এমন কথা আর কে বলতে পারে? শহীদ হওয়ার পর তিনি প্রিয় নবীজির সাথে সাক্ষাত লাভে ধন্য হবেন, আল্লাহ্র অফুরন্ত নিয়ামতের বাগানে তাঁর সাথে মিলিত হবেন, কথাবার্তা বলবেন, খোশগল্প করবেন, নিশ্চিত ঈমানদার ছাড়া এমন কথা আর কার মুখ থেকে বের হতে পারে? তাই এমন ইস্পাতসম একীন যাঁর অর্জিত হয়, মৃত্যু তাঁর সামনে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না এবং পার্থিব কোন লোভ-লালসা তাকে কাঙ্ক্ষিত শাহাদাতের পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারে না।

অপ্রিয় হলেও সত্য যে, উম্মতে মুহাম্মদীর ইতিহাসে বৃহত্তম ট্রাজেডি হলো সকল কিছুতে কৃত্রিমতা আজ বাস্তবতার স্থান দখল করে আছে, এমন কি মুসলমানদের জীবনের কর্তৃত্বও চলে গেছে কৃত্রিম আড়ম্বরের হাতে। এ বিপর্যয় আজকের নতুন নয়, তা শুরু হয়েছে অনেক আগেই। বস্তুত কোন কৃত্রিম বস্তু যখন দূর থেকে দেখা যায়, মনে হয় যেন বাস্তবিক পক্ষেই এটি কোন আসল বস্তু। দূর থেকে দৃশ্যমান সেই বস্তুটি যদি হয় কোন ভয়ংকর হিংস্র প্রাণীর ছবি, তবে মানসিক ভয়-ভীতির কারণে তা দেখেই আমরা ঘাবড়ে যাই এবং তার কাছে যেতেও ভয় পাই।

ঠিক তেমনি আমাদের মাঝে বিদ্যমান ইসলামের এ বাহ্যিক রূপ দেখেই শত্রুরা প্রথমে ভয় পেত, এখন আর তা পায় না। যেমন কৃষক তার ক্ষেত রক্ষা করার জন্য ক্ষেতে মানুষরূপী পুতুল স্থাপন করে যাতে ক্ষেত নষ্টকারী হিংস্র প্রাণী ভীত হয়ে কাছে আসতে না পারে। পাখিরাও সে পুতুলকে মানুষ বা পাহারাদার ভেবে পালিয়ে যায়। পরে একদিন কোন বিচক্ষণ কাক বা অন্য কোন সাহসী প্রাণী কাছে এসে দেখে যে, এটি তো কিছুই নয়। তখন সে ক্ষেতে বসে মনের আনন্দে তাতে বিচরণ করে। তাকে দেখে অন্যান্য পাখিরাও মাঝে মাঝে এসে ক্ষেত উজাড় করে দেয়।

মুসলিম উম্মাহর সাথেও ঠিক এ ট্র্যাজেডি ঘটে। তাদের ইস্পাতসম দৃঢ় ঈমান, নন্দিত চারিত্রিক মাধুর্য, তাদের শৌর্যবীর্য ও দুরন্ত সাহসের কারণে অবৎ বিশ্বের কোন শক্তি তাদের ওপর আক্রমণ করার সাহস পায়নি। এ সূত্র ধরে ইসলামের বাহ্যিক রূপ তাদেরকে অনেক দিন ধরে আগলে রেখেছে। পূর্বেকার অভিজ্ঞতার আলোকে দুশমনেরা মুসলমানদের ওপর চড়াও হবার সাহস করেনি। কেননা তারা জানত না যে, এ ইসলাম পূর্বেকার সেই ইসলাম নয়।

কিন্তু এভাবে আর কতদিন? একদিন চতুর কাকের মত তাতারী সৈন্যবাহিনী ইসলামী খিলাফতের রাজধানী বাগদাদে ধ্বংসাত্মক আক্রমণ চালায়। শাব্দিক অর্থেই মুসলমানদের পক্ষে এ আক্রমণ প্রতিহত করা সম্ভব ছিল না। তাই তাদের দিশেহারাই হতে হলো। এ সুযোগে তাদের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক দুর্বলতা প্রকাশ পেতে থাকে। শত্রুরাও তাদের বদ্ধমূল ভুল ধারণা কাটিয়ে উঠে একের পর এক ধ্বংসলীলা চালাতে থাকে। ইসলামের বাহ্যিক রূপ তার অনুসারীদেরকে এসব মর্মান্তিক ধ্বংসযজ্ঞ থেকে বাঁচাতে পারেনি। কারণ কৃত্রিমতার ভিত্তিই হলো অজ্ঞতা ও প্রতারণার ওপর। তাই যখন অজ্ঞতার পর্দা সরে যায় তখন চোখের সামনে সত্য উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, তখন কৃত্রিমতার করার কিছুই থাকে না।

ইসলামের ইতিহাসের বিভিন্ন অধ্যায়ে মুসলমানদের পরাজয় কাহিনী লিপিবদ্ধ রয়েছে। এসব পরাজয় ও বিপর্যয় মূলত কৃত্রিমতার পরাজয় বৈ আর কিছু নয়। সেগুলো ইসলামের পরাজয় ছিল না, ছিল ইসলামের মুখোশধারী তথাকথিত মুসলমানদের পরাজয়। এটি এক অনস্বীকার্য বাস্তবতা। কৃত্রিমতাই আমাদেরকে প্রতিটি যুদ্ধে বিপর্যস্ত করেছে। এর জন্য দায়ী কে?

আমরাই দায়ী। আমরাই তো পুরো বাস্তবতাকে কৃত্রিমতার হাতে তুলে দিয়েছি যা তাকে বহন করতে ও সামলে রাখতে অক্ষম ছিল। আর এমন জীর্ণ কৃত্রিমতা দিয়ে মজবুত স্বপ্ন প্রাসাদ নির্মাণ করতে চেয়েছি। ফলে যা হবার তাই হয়েছে। আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার গুড়ে বালি পড়েছে। ভূ-লুণ্ঠিত হয়েছে আমাদের স্বপ্নসৌধ। এ আড়ম্বর কৃত্রিমতা আমাদেরকে মাঠে-ময়দানে লাঞ্ছিত করেছে।

বারবার দুনিয়ার জাতিগোষ্ঠী ও তাদের সৈন্যদলের সাথে কৃত্রিম ইসলামের সংঘাত হয়েছে। কিন্তু প্রতিবারই কৃত্রিম ইসলাম পরাজয় গ্লানি বরণ করেছে। ফলে মানুষ এটাকে বাস্তব ইসলামের পরাজয় গ্লানি মনে করছে। আর এ কারণে ইসলাম মানুষের চোখে ছোট হয়ে পড়েছে এবং তাদের দিল ও দেমাগ হতে ইসলামের ভয় দূর হয়ে গেছে। অথচ মানুষ বোঝে না, ইসলামের বাস্তব রূপ সুদীর্ঘ সময় হতে যুদ্ধের ময়দানে অগ্রসর হয়নি। আর পৃথিবীর জাতিগোষ্ঠীর নামে তার কোন সংঘ্যাতত্ত্ব হয়নি, বরং যুদ্ধের ময়দানে যা দেখা গেছে তা হলো কৃত্রিম ইসলাম, বাস্তব ইসলাম নয়। কারণ কৃত্রিমতার বৈশিষ্ট্যই হলো বাস্তবতার সামনে পরাজয় ও নতি স্বীকার করা।

• বর্তমানের ভূমধ্যসাগর পাড়ের তুরস্ক এককালে ছিল উসমানী খিলাফতের প্রাণকেন্দ্র। তার প্রভাব-প্রতিপত্তির সামনে সারা ইউরোপ সদা সন্ত্রস্ত থাকত। এ তুরস্কের হাতে বহু ইউরোপীয় রাষ্ট্র পরাজয়ের গ্লানি মাথা পেতে নিয়েছিল। সেই তুরস্কের বিরুদ্ধেই ইউরোপীয় সম্মিলিত জোট প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বাঁধিয়ে দেয়। উপর্যুপরি ও সম্মিলিত আক্রমণের মুখে ইসলামের সোনালী ঐতিহ্যবাহী উসমানীয় খেলাফতের পতন ঘটে। ঈমানের অজেয় শক্তিতে বলীয়ান আগের সেই তুরস্ক এবার ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে। এবারের তুরস্ক ছিল বাস্তবতাশূন্য ইসলামের জীর্ণ রূপসমৃদ্ধ তুরস্ক। তাই সে তার আগের দাপট দেখাতে পারেনি। ইউরোপীয়দের আক্রমণের বিরুদ্ধে কোন প্রতিরোধ ব্যূহ গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়। অবধারিত পরাজয় ছাড়া তার সামনে কোন বিকল্প পথ ছিল না বলে পরাজয়ের গ্লানি বহন করে অনেক ভূ-খণ্ডের অধিকার বিসর্জন দিতে বাধ্য হয়।

ফিলিস্তীনে ইয়াহুদী যায়নবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সাতটি আরব দেশ এক মঞ্চে আসে। কিন্তু এসব দেশ ইসলামী আদর্শ ও রূহানী শক্তির ক্ষেত্রে ছিল নিতান্তই দুর্বল। পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী ধ্যান-ধারণা তাদের অন্তরের ঈমানী শিখাকে নিভিয়ে দেয়। আল্লাহর রাহে জানবাজি রেখে জিহাদ করার জযবাকে নিস্তেজ করে দেয়। সাথে দুনিয়ার স্বল্পকালীন যিন্দেগীর ভোগ-বিলাস তাদেরকে আকণ্ঠ নিমজ্জিত করে দেয়। এদিকে আরব দেশসমূহে সম্পদের প্রাচুর্য সত্ত্বেও সমকালীন সমরনীতি, অত্যাধুনিক যুদ্ধাস্ত্র ও কৌশল প্রয়োগের ক্ষেত্রে তারা বেশ পিছিয়ে ছিল। তাই তখন আরব-ইয়াহুদী যে যুদ্ধ সংঘটিত হয় তা মূলত শাব্দিক অর্থে মুসলমানদের কৃত্রিম ইসলাম বনাম আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তি ও সমরাস্ত্রের বাস্তবতার যুদ্ধ। স্বাভাবিক কারণেই এ যুদ্ধে কৃত্রিমতার ওপর বাস্তবতার বিজয় ছিল অবধারিত। ঠিক তাই হলো।

আল্লাহপাকের কাছে কৃত্রিমতারও একটা সম্মানজনক স্থান রয়েছে, যেহেতু কৃত্রিমতার মাঝে বাস্তবতা অনেক দিন যাবত জীবন ধারণ করেছে। কৃত্রিম রূপ

আল্লাহওয়ালা বান্দা ও আল্লাহ পাকের বন্ধুদের আকৃতি কৃত্রিম রূপ ধারণ করার কারণে তিনি এ কৃত্রিমতাকেও ভালবাসেন। আর আমরাও তার অবদান স্বীকার করতে বাধ্য, কুফরের বাস্তব রূপে বা কৃত্রিম রূপের মাধ্যমে ঈমানের কাঙ্ক্ষিত বাস্তবতার নাগাল পাওয়ার তুলনায় ইসলামের কৃত্রিমতার মাধ্যমে ধীরে ধীরে ঈমানের বাস্তবতা পর্যন্ত পৌছানো অধিকতর সহজ। তাই কৃত্রিমতাকে বাদ দিলে চলবে না, বরং তার আশ্রয়ে থেকেই আমাদেরকে খুঁজতে হবে নিগূঢ় বাস্তবতার নতুন পথ। তবে এই বলে যদি কৃত্রিমতাকেই যথেষ্ট মনে করা হয়, তাহলেও বিপদ। তা হবে ইসলামের বাস্তবতা ও আধ্যাত্মিক রূহানী শক্তির প্রতি চরম অবজ্ঞা প্রদর্শন।

ইসলামের ঝাণ্ডাবাহী কাণ্ডারিগণ! কুরআনে হাজারো অঙ্গীকার রয়েছে, আল্লাহর পক্ষ থেকে মুসলমানদের জন্য অবধারিত বিজয়, আখিরাতে নাজাত ও মাগফিরাত। অতঃপর অকল্পনীয় নায-নিয়ামত, বিভিন্ন মনজুড়ানো সুখকর পুরস্কারের কথা বর্ণিত আছে। কিন্তু এসব কাদের জন্য? একজন কাফিরের কপালে মুসলমানী নাম লাগালেই সে এসব নিয়ামতের ভাগীদার হবে না, বরং এসব কিছু সম্পূর্ণ নির্ভর করে মূলত ইসলামের বাস্তবতার ওপর। যেমন আল্লাহ্ পাক বলেন,

وَلَا تَهِنُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ -

"তোমরা মন ছোট করো না, চিন্তিত হয়ো না; তোমরাই হবে বিজয়ী যদি তোমরা মু'মিন হয়ে থাক।" [সূরা আলে ইমরান ঃ ১৩৯]

কুরআনের এ সম্বোধন শুধু মু'মিনদের উদ্দেশেই। এতে দুনিয়ার বৈষয়িক মান-মর্যাদা, শান-শওকত, আত্মিক প্রশান্তিসহ জীবনের যাবতীয় সম্মানের প্রধান শর্ত হলো ঈমান। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ পাক অন্যত্র ইরশাদ করেনঃ

انا لننصر رسلنا والذين امنوا فى الحياة الدنيا ويوم يقوم الاشهاد -

"আমি পার্থিব জীবন ও সাক্ষ্য-প্রমাণের দিন (কিয়ামতের দিন) আমার রাসূলগণ ও আমার মু'মিন বান্দাদেরকে অবশ্যই সাহায্য করব।"

[সূরা গাফির ঃ ৫১]

অন্যত্র ইরশাদ করেন ঃ

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِى ارْتَضٰى لَهُمْ ....

"যারা ঈমান এনেছে এবং সৎ কর্ম করেছে, আল্লাহ পাক তাদেরকে ওয়াদা দিয়েছেন যে, তিনি অবশ্যই তাদেরকে দুনিয়ার খিলাফত দান করবেন, যেমন দিয়েছিলেন পূর্ববর্তিগণকে। এবং আরো ওয়াদা করেছেন যে, তাদের জন্য মনোনীত ধর্মকে অবশ্যই বিজয়ী করবেন এবং তাদের যাবতীয় ভয়-ভীতিকে প্রশান্তি ও নিরাপত্তায় পরিণত করবেন। তারা আমার ইবাদত করবে। আল্লাহ্‌র সাথে কোন কিছুর অংশীদারিত্ব স্বীকার করবে না। এরপরও যারা অবিশ্বাস করে তবে তারা ফাসিক (আল্লাহর রহমতবঞ্চিত)।" [সূরা নূর ঃ ৫৫]

আল্লাহ্‌পাক মুসলমানদের এসব ওয়াদা করেছেন একমাত্র ঈমানের ও নেক আমলের ভিত্তির ওপর। তাই এসব ওয়াদার সম্যক বাস্তবায়িত হবার প্রধান শর্ত হলো, মু'মিনদের মাঝে তাওহীদ ও ঈমানের বাস্তবতা বিদ্যমান থাকতে হবে।

বর্তমান যুগে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দীনী দায়িত্ব, সর্বোৎকৃষ্ট খেদমত হলো উম্মতের বিশাল জনগোষ্ঠীকে আড়ম্বরপূর্ণ কৃত্রিমতা থেকে ইসলামের নিগূঢ় বাস্তবতার দিকে দাওয়াত দেওয়া। ইসলামী দাওয়াতের কর্মীরা এ উদ্দেশ্য সামনে রেখেই কাজ করতে পারেন। মুসলিম বিশ্বের হৃদ্-স্পন্দনহীন শরীরে ইসলামের নতুন প্রাণ সঞ্চার করার লক্ষ্যে তারা তাদের সবটুকু প্রচেষ্টা উজাড় করে দিতে পারেন। এভাবেই একদিন এ জাতির অবস্থার উত্তরণ ঘটবে। তাদের পরিবর্তনের হাওয়া লাগবে সারা বিশ্ব-পট পরিবর্তনেও। যেহেতু পৃথিবীর ভাগ্য নির্ভর করে মুসলিম উম্মাহর অবস্থার ওপর আর মুসলিম উম্মাহর ভাগ্য নির্ভর করে ইসলামের বাস্তবতার ওপর। সুতরাং মুসলিম উম্মাহই যদি হারিয়ে ফেলে ইসলামের বাস্তবতা, তবে সারা বিশ্বে ইসলামের দাওয়াত নিয়ে কে দাঁড়াবে? বিশ্বের মৃতদেহে কে জাগাবে নতুন প্রাণ?

হযরত ঈসা (আ) সত্যিই বলেছেন ঃ

"তোমরা হলে যমীনের লবণসদৃশ। লবণ যদি তার লবণাক্ততার গুণ হারিয়ে ফেলে খাদ্যকে লবণাক্ত করার কি উপায়?"

আজকে আমাদের জীবন ব্যবস্থাও প্রাণহীন শরীরে পরিণত হয়েছে। আর যেখানে মুসলিম উম্মাহর সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী প্রাণহীন, বাস্তবতাবিবর্জিত দেহ নিয়ে বসে আছে, সেখানে মানব জীবনে পুনর্বার প্রাণ সঞ্চার ও বাস্তবতামণ্ডিত করার আশা কিভাবে করা যায়?

এ ধরাপৃষ্ঠে প্রাচীনকাল হতে আজ পর্যন্ত প্রাণহীন ও বাস্তবতাশূন্য অনেক জাতির অস্তিত্ব বিরাজমান। তাদের রীতিনীতিতে কতিপয় ছকবাঁধা বিশ্বাস আর কতক প্রাণহীন তুচ্ছ কৃত্রিম রূপ ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। ফলে তাদের কাছ থেকে ধর্মীয় ও অধ্যাত্মময় বাস্তব জীবন শেষ হয়ে গেছে, এমন কি তাদের

বিপর্যয়ের অবস্থা এমন যে, এ জাতিকে সংশোধন কিংবা সংস্কার করার চেয়ে নতুন একটি জাতি গঠন করা সহজতর হবে। এরপরও যারা ঐ সব জাতি-গোষ্ঠীকে সংশোধনের নিমিত্ত যথাসাধ্য প্রচেষ্টা চালিয়েছে, তারাও কিন্তু সফল হতে পারেন নি। আধুনিক যুগের তথ্য-প্রযুক্তি, রচনা-প্রকাশনা, শিক্ষা-দীক্ষা ও যাবতীয় নিত্য-নতুন মিডিয়া থাকা সত্ত্বেও তারা ব্যর্থ হয়েছেন। এর কারণ হলো, সে সব জাতির ধর্মীয় ও আত্মিক বন্ধন সম্পূর্ণ ছিন্ন হয়ে গেছে, সাথে সাথে জাতির সাথে ধর্মীয় জীবন, নৈতিক আদর্শ ও আত্মিক উৎকর্ষের কোন সম্পর্ক ছিল না।

কিন্তু মুসলিম উম্মাহ তাদের সকল দোষ-ত্রুটি সত্ত্বেও দীনের রশি শক্ত হাতে আঁকড়ে ধরে আছে। আল্লাহ পাক ও তাঁর রাসূল (সা)-এর প্রতি পূর্ণ আস্থাও পরকালের হিসাব-নিকাশে পূর্ণ বিশ্বাসকে তারা জীবনের সম্বল করে বেঁচে আছে। তাদের নৈতিক অবক্ষয় ঘটলেও ধর্মীয় মূল্যবোধকে সম্পূর্ণ ছেড়ে দেয়নি। অন্যান্য জাতির মত দীনের মূলনীতি থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েনি, বরং অনেক সাধারণ মুসলমানের ঈমান অন্য জাতির বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ঈমান অপেক্ষা দৃঢ়। এ সাধারণ মুসলমানদের ঈমান প্রগাঢ়তা ও চেতনার দিক দিয়ে অন্য জাতির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকেও ছাড়িয়ে যায়। এ জাতির কাছে যে কিতাব আছে, তাতে বিকৃতির ছোঁয়া লাগেনি। এ কিতাবকে নিয়ে কেউ অনাধিকার চর্চা করতে পারেনি, যেমনটি করেছে পূর্বেকার কিতাবগুলোতে। এ উম্মতের সামনে রয়েছে প্রিয় নবীজির যুগান্তকারী জীবন ও তাঁর রেখে যাওয়া অনুপম আদর্শ। তাই তাদেরকে পুনরায় দীনের দিকে ডাকা সহজ। সংস্কারও অসম্ভব নয়। তাদের অন্তর তো সত্য গ্রহণের জন্য সদা প্রস্তুত রয়েছে। উপরন্তু ঈমানের অগ্নিশিখা দ্রুত জ্বলে উঠতে পারে। আর বাস্তবতা ও কৃত্রিমতার মাঝে দূরত্বটাও খুবই অল্প। এমতাবস্থায় জরুরী কেবল ঈমানকে সংস্কারকরণ, নতুনভাবে ধর্মীয় গণ্ডিতে ফিরে যাওয়া এবং দীনের অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তিতে উদ্বুদ্ধ হওয়া। দীন-ই-ইসলামের বাস্তবতা নতুন আঙ্গিকে ধারণ করার ক্ষেত্রে সেতুবন্ধনের কাজ করতে পারে একমাত্র দাওয়াত ও তাবলীগ।

আমি নিরাশ নই। এ যুগেও ইসলামের সেই নিগূঢ় বাস্তব রূপ নতুনভাবে প্রকাশ পেতে পারে। সমকালীন সমাজে বহুল প্রচলিত 'যুগ বদলে গেছে' একথা আমি বিশ্বাস করি না। আমি একথাও বিশ্বাস করি না, মুসলমানরা ইসলামের প্রাণশক্তি হারিয়ে ফেলেছে, তাই নতুনভাবে ইসলামের বিজয়ের কোন আশা করা যায় না। না হয় একটু পেছনে ফিরে তাকাও, দেখবে, ইসলামের মূল বাস্তবতার শেকড় ইতিহাসের সূচনালগ্ন থেকেই ব্যাপক হারে সজীব রয়েছে। তাইতো বাস্তবতা যখনই কোন হোঁচট খেয়েছে, পরক্ষণেই আবার উঠে দাঁড়িয়েছে। আবার যখনই আড়াল হয়েছে, পরক্ষণেই আবার প্রকাশ পেয়েছে আপন মহিমায়। আর যখনই মুসলিম বিশ্বের কোন প্রান্তে যে কোন সময় ইসলামের বাস্তবতা ফুটে

উঠেছে, তখনই লাভ করেছে নিরংকুশ বিজয়। এ বিজয় অর্জন করার পথে নানাজনের নানা অভিজ্ঞতাপ্রসূত ধারণা মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। সে সব বিজয়ের পর মানুষের মনে ইসলামের প্রথম শতাব্দীর সেই সুখকর বাতাস বইতে শুরু করে—যার ফলে অতীতের সোনালী পরিবেশ নতুন করে মুসলিম উম্মাহর জন্য সৃষ্টি হতো।

সুতরাং বর্তমান যুগেও যদি ইসলামের বাস্তবতাসমৃদ্ধ একটি দল আত্মপ্রকাশ করে, তবে তারা সকল বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে বিশ্বের যে কোন শক্তিকে পরাজিত করতে পারে। এ যুগেই ঘটতে পারে ঈমান, আমল, বীরত্ব ও অপরকে অগ্রাধিকার দেওয়ার বিস্ময়কর ঘটনা। এসব ঘটনার কোন কারণ মানুষ খুঁজে পাবে না। অতীতেও তারা পায়নি। ইসলামী ইতিহাসের সূচনাপর্বে সংঘটিত বিপদসমূহ যেমন মানুষের কল্পনাতীত ছিল, তেমনি বর্তমান যুগে আসন্ন বিজয় যুদ্ধে এমন সব ঘটনা ঘটতে পারে যা আধুনিক যুগের আধুনিক মস্তিষ্কের অত্যাধুনিক তথ্য-প্রযুক্তির অধিকারী মানুষগুলোকে হতবাক করে দিতে পারে এবং তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ হবে সম্পূর্ণ ব্যর্থ।

কুরআন অধ্যয়ন ও এর আদবসমূহ

[২৬ শে জুলাই ৭৮ ইং মডেল টাউন, লাহোরের কুরআন একাডেমীর এক বিশেষ জলসায় এ বক্তৃতা দেওয়া হয়েছিল। এ জলসায় দূর-দূরান্ত থেকে সফর করে এসেছিলেন চিন্তাশীল কোরআন গবেষক ও শিক্ষার্থিগণ। উদ্বোধনী বক্তব্য ও কোরআন একাডেমীর পরিচিতি পেশ করেন একাডেমীর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ডক্টর আসরার আহমদ।]

পবিত্র কুরআন সর্বক্ষেত্রেই সহায়ক

প্রিয় ভ্রাতৃবৃন্দ! কিয়ামত পর্যন্ত চলমান আল-কুরআনের মুজিযাসমূহের অন্যতম হলো সর্বক্ষেত্রে তার সহায়তা ও সমাধান প্রদানের উপযোগিতা। আমার জীবনেও এ অভিজ্ঞতা বহুবার হয়েছে। বক্তৃতার প্রারম্ভে আমি বিষয়ে নির্ধারণের অস্থিরতা ও কথা শুরু করার অনিশ্চয়তায় ভুগছিলাম। ইতোমধ্যে ক্বারী সাহেব কোনো আয়াত তিলাওয়াত শুরু করলেন এবং আমার তখন মনে হতে লাগল, শ্রোতাদের শোনার আগে আমারই জন্য এ আয়াতসমূহ চয়ন করা হয়েছে। বিদেশ ভ্রমণেও আমার অভিজ্ঞতা অনুরূপ। সারা দিনের ব্যস্ততা ও বিভিন্ন প্রোগ্রামের কারণে বক্তৃতার বিষয়বস্তু নিয়ে ভাববার সুযোগ হয়ে ওঠে নি। অনুষ্ঠানে পৌঁছে, কোথাও বা অনির্ধারিত (মুক্ত) বিষয়ে আমি বিষয়টি আল্লাহর হাওলা করে রাখতাম এই ভরসায়, তিনি যথাসময়ে উপায় বের করে দেবেন। যেহেতু আল্লহওয়ালার ভাষায় তাঁর পক্ষ থেকে আগত বিষয়কে বলা হয় 'ওয়ারিদ' (আগন্তুক বা স্বাগত), সম্মানিত মেহমান যিনি নিজের ইচ্ছায়ই এসেছেন, মেযবানের ইচ্ছা বা নির্বাচন সেখানে কার্যকরী নয়। আজকের ব্যাপারও ছিল অভিন্ন। আল্লাহ পাক আজকের মজলিসের ক্বারী সাহেবকে জাযায়ে খায়ের দান করুন, যিনি এ আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করলেন। এতে করে আমি পথ পেয়ে গেলাম আয়াতসমূহের তাফসীর সম্পর্কেও। আমার আসল শ্রোতা কোরআন পাকের 'তালিবে ইলমে'দের কাছে কিছু অভিজ্ঞতা ও পরামর্শের কথা পেশ করার আগে আমি আমার নগণ্য ব্যক্তিপরিচিতি ও আমার 'ইলমী সফর' সম্পর্কে কিছু কথা পেশ করতে চাই।

পবিত্র কুরআনে দাওয়াতের হিকমত

ডক্টর সাহেব বেশ আড়ম্বরের সাথে আমার পরিচিতি পেশ করেছেন। কিন্তু আরো কিছুটা পরিচয় পেশ করার প্রয়োজন অনুভব করছি এবং হযরত ইউসূফ আলায়হিস-সালামে'র সুন্নত স্বপ্নের অনুসরণ করে নিজেই আনজাম দিচ্ছি সে

কর্তব্য। "স্বপ্নের ব্যাখ্যা আমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আমাকে শেখানো বিষয়াবলীর অন্তর্ভুক্ত।" তাঁর এ আত্মপরিচিতি প্রদানের কারণ কি ছিল? শ্রোতা কিংবা প্রশ্নকর্তার মনে সর্বাগ্রে এ নিশ্চয়তা সৃষ্টি করতে হবে, তাদের সম্মুখস্থ ব্যক্তি দ্বারা সহায়তা লাভ করা যেতে পারে। ব্যক্তি নির্বাচনে তারা ভ্রান্তির শিকার হন নি। তাই তিনি বলেছিলেন, "স্বপ্ন ব্যাখ্যা আমার প্রতিপালকপ্রদত্ত জ্ঞান। কেননা আমি বর্জন করেছি এমন সব লোকের মাযহাব যারা ঈমান রাখে না আল্লাহ্‌র একত্ববাদে এবং অস্বীকার করে আখিরাতকে।" [সূরা ইউসূফ]

এ ছিল একজন নবীর কথা, "তোমাদের পরবর্তী খাদ্য গ্রহণের সময়ের আগেই তোমাদের স্বপ্নের ব্যাখ্যা পেশ করছি।" ...এতে ছিল কিঞ্চিৎ আত্মস্তুতির প্রকাশ। সম্ভাব্য সে ধারণা খণ্ডন করার উদ্দেশে সাথে সাথে তিনি বললেন, "ঐ বিষয়টি আমার জন্য আমার প্রতিপালক প্রদত্ত ইলম।" অর্থাৎ তোমাদের সমস্যা সমাধানে আমি তোমাদের সহায়তা করতে পারছি। আল্লাহ আমাকে সে 'ইলম' দান করেছেন। কিন্তু কেন দান করলেন তিনি? কেননা "আমি বর্জন করেছি অর্থাৎ তা আমার মেধা কিংবা অভিজ্ঞতার ফসল নয় (অথচ তাঁর মাঝে পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান ছিল এ উভয় গুণ), বরং এ 'ইলম' লব্ধ হয়েছে এ কারণে, আমি বর্জন করেছি আল্লাহ ও আখিরাতে অবিশ্বাসী জাতিকে আর সেই সাথে "আমি অনুসরণ করেছি আমার পূর্বসূরী ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকূবের মাযহাব।" এভাবে তিনি অবকাশ সৃষ্টি করেছিলেন তাওহীদের ওজর করার। প্রিয় ভাইয়েরা! যে বিষয়টি তোমাদের কাছে সুকঠিন এবং যে ভারি বিষয়টি নিয়ে তোমাদের আগমন, আমাদের সবার সামনে রয়েছে তার তুলনায় কঠিনতর সমস্যা। তা হচ্ছে আক্বীদা ও মৌল বিশ্বাসের সমস্যা। তোমরা যে স্বপ্ন দেখেছ। আর স্বপ্ন অবশেষে স্বপ্নই। সে তো ঘুমের জগতের ব্যাপার! কিন্তু সমস্যা হচ্ছে সজাগ পৃথিবীর, সমস্যা হচ্ছে ভবিষ্যত জীবন, স্থায়ী ও চিরন্তন জীবনের।

স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিতে পারে এমন একটি লোকও যদি খুঁজে না পাওয়া যায়, তবে তা কোন মারাত্মক ক্ষতির কারণ নয়। কিন্তু এ বাস্তব স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিতে পারে এমন কাউকে পাওয়া গেল না, হদিস দিতে পারল না কেউ পৃথিবীতে আগমনের উদ্দেশ্য কি, পরিচয় দিল না কেউ বিশ্বস্রষ্টার, মূল বিপদাশংকা রয়েছে এসব বিষয়ে জ্ঞান লাভ না করার ক্ষেত্রে। কিন্তু তিনি এই সংক্ষিপ্ত মাত্রা (Dose) দিয়েই ক্ষান্ত হয়েছিলেন। কেননা তিনি বুঝতেন, আগন্তুকরা এসেছে পেরেশান হয়ে এক বিশেষ উদ্দেশে, দু'চার ঘণ্টার লম্বা ওয়াজ শোনার ধৈর্য তাদের হবে না। তাই তিনি একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসক, একজন প্রজ্ঞাসম্পন্ন ধর্ম প্রচারক ও সংস্কারকের ন্যায় যথার্থ পরিমিতিবোধের পরিচয় দিয়ে মাত্রা ততটুকুই দিয়েছেন যা ছিল তাদের সহনশীলতার পরিধিভুক্ত।

কখনো কখনো মনের দুয়ার খুলে যায়

লক্ষ্য করুন পরিমিতিবোধের দিকে, তাতে পরিপূর্ণ পরিস্ফুটিত রয়েছে 'ইউসূফী সৌন্দর্যবোধ'। অল্প ও অধিকের মাঝে পরিমাপ ঠিক রেখে তিনি যথাস্থানে থেমে গিয়েছেন অর্থাৎ তাওহীদের মূল কথাটি বলে দিলেন। কিন্তু এত দীর্ঘ করলেন না যাতে লোকেরা বিরক্ত হয়ে বলে ফেলে, "জনাব! আপনি স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিতে পারেন তো দিন, অন্যথায় আমরা অবসর সময়ে আসব।" হযরত ইউসূফ (আ.) দেখলেন, তাদের মন ও মস্তিষ্কের দরজা খোলা রয়েছে। আর মনের দুয়ার খুলে মাঝে-মধ্যে, যখন ভাগ্য হয় সুপ্রসন্ন, মনের দরজা উন্মুক্ত হয় বিশেষ কোন উদ্দেশে, কোন দুশ্চিন্তার সময়ে, তবে তা করতে হবে দ্রুততর কৌশলের সাথে দরজা বন্ধ হয়ে যাওয়ার আগেই এবং 'প্রত্যাখ্যান' বন্ধ হওয়ার পূর্বেই। বিষয়টি উপলব্ধি করে আমি বিস্ময়াভিভূত হয়ে যাই। সেই সাথে আমার আক্ষেপ, বাইবেলে এ অংশটি সম্পূর্ণ বিলুপ্ত। আর এতেই স্পষ্ট বোঝা যায়, বাইবেল কার রচনা, আর কোরআন কে অবতীর্ণ করেছেন?

হযরত ইউসূফ (আ.) ভালোভাবেই জানতেন, তাঁর শ্রোতারা কতটকু সহ্য করতে পারবে। আর তিনি ততটুকুই বলেছিলেন। রোগী চায় দ্রুত তার রোগের প্রতিকার। এজন্যই তিনি আশ্বাস-বাণী শোনালেন অর্থাৎ বরাদ্দকৃত খাবার পাওয়ার সময়ের পূর্বেই ব্যাখ্যা দিচ্ছি। চিকিৎসকের কাছে আগন্তুক রোগী নিশ্চয়তা চায় দু'টি বিষয়ে—ওষুধ পাওয়া যাবে কি না এবং তা দ্রুত পাওয়া যাবে কি না? মাঝে তিনি পেশ করলেন তাওহীদের পয়গাম।

কুরআন অধ্যয়নের মাধ্যমে 'ইলমী জীবনের সূচনা

এখন আমি কিঞ্চিৎ আত্মপরিচয় পেশ করা উপযোগী মনে করছি। আমি পবিত্র কোরআনের একজন অতি নগণ্য ও তুচ্ছ তালিব 'ইলম। আমার 'ইলমী জীবন শুরু হয়েছে কুরআন অধ্যয়নের মাধ্যমে। আমি কয়েক স্থানে লিখেছি আল্লাহ আমাকে তাওফীক দিয়েছিলেন এমন একজন উস্তাদের সান্নিধ্যে আসার, যিনি ঈমানী ও কুরআনী রুচির অধিকারী। তিনি কুরআন তিলাওয়াত করতেন আর কাঁদতে থাকতেন। আমার মনে প্রথমে রেখা অংকিত হয়েছিল তাঁর বেদনাভরা উচ্চারণের। তা-ই ছিল আমার সৌভাগ্য, এটাই পবিত্র কুরআনের মূল স্বভাব।

পবিত্র কুরআনের স্বভাব হচ্ছে 'সিদ্দীকী'

কুরআন শরীফ 'সিদ্দীকী' স্বভাবের বিষয়। হুযূর (স.)-এর ওফাতের পূর্বে তাঁর মুসল্লায় দাঁড়িয়ে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-কে নামাযে ইমামতি করার নির্দেশ দেওয়া হলো। হযরত আয়েশা (রা.) আরয করলেন, "আবূ বকরকে রেহাই দেওয়া হোক!" তিনি 'অতি ক্রন্দনশীল' মানুষ। কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করতে আরম্ভ

করলে প্রবল কান্না তাঁর তিলাওয়াত থামিয়ে দেবে। মুক্তাদীরা শুনতে পারবে না। মুশরিকদেরও অভিযোগ ছিল অভিন্ন। হযরত আবূ বকর (রা)-কে তাঁর বাড়ীতে নামায পড়ার অনুমতি দেওয়া হলে তিনি তাঁর বাড়ীর সম্মুখভাগে একখানা মসজিদ বানালেন। নীরবে নামায পড়া পর্যন্ত কোন অসুবিধা ছিল না। কিন্তু শব্দ করে তিলাওয়াত শুরু করলে সেখানে ভিড় জমে যেত শিশু ও নারী-পুরুষের। তাঁর মর্মবেদনাপূর্ণ তিলাওয়াতে পাথরও গলে যেত। শ্রোতাদের মনে তা এমন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করত যার ফলে কুরায়শদের দুশ্চিন্তা হলো মক্কায় কোন বিপ্লব ঘটে যাওয়ার। তারা ভাবনায় পড়ল, পরিস্থিতি তাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে না যায়!

মূলত কুরআনের স্বভাবই হচ্ছে দিলের দরদ লাগিয়ে ঈমানী আস্বাদনের সাথে তিলাওয়াত করা। হাদীস শরীফে রয়েছে, "ঈমান হচ্ছে য়ামানের, ফিকাহ্ য়ামানের আর হিকমতও য়ামানী।"

আমার সৌভাগ্য, আমার প্রথম মু'আল্লিম ছিলেন কোমল হৃদয়, দরদে ভরা মনের অধিকারী। আমাদের আক্ষেপ হতো, যখন তিনি তিলাওয়াত করতেন, তিনি তিলাওয়াত করতে থাকেন, আর আমরা শুনতে থাকি। তিনি আমাদের মহল্লার মসজিদে ফজরের নামাযে ইমামতি করতেন। খুব কমই তিনি পূর্ণ সূরা তিলাওয়াত করতে পারতেন। তিলাওয়াত শুরু করার পরই প্রবল বেগে কান্না চেপে আসত, আওয়াজ ডুবে যেত। রোজই এমন হতো। তিনিই আমাকে পবিত্র কুরআনের কয়েকটি সূরা পড়িয়েছেন। শুরু করেছিলেন তাওহীদের আলোচনাসম্বলিত সূরাসমূহ দিয়ে। প্রথম সূরা ছিল 'যুমার'। পরবর্তী সময়ে ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে লেখাপড়ার চাপ সৃষ্টি হলে তাতে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম, কিন্তু পবিত্র কুরআনের প্রতি আকর্ষণ দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকল। এর রুচিবোধ আমাকে প্রভাবিত করত।

শিক্ষা জীবন সমাপ্ত হলে আমার কুরআন অধ্যয়নের আগ্রহ আরো বৃদ্ধি পেল। মাদ্রাসা নিসাবের তালিকাবহির্ভূত অনেক কিতাব পড়লাম। এই লাহোরে এসে পুরো কুরআন পড়লাম মাওলানা আহমাদ আলী লাহোরী (র)-এর কাছে। এখানেও পেলাম তাঁর কুরআনী জীবন। তাঁকে বলা হতো "চলমান কুরআন"। অন্তরে অনুভূত হতো তাতে এক অনাবিল পরিচ্ছন্নতা। ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে তাঁর আড়ম্বরহীনতা, দরবেশসুলভ জীবন যাপন ও তাঁর সুন্নতের আমল আমাকে এমনভাবে প্রভাবিত করেছে যাকে ব্যক্ত করা হয় 'বরকত' শব্দ দিয়ে। কিছুদিন দারুল উলূম দেওবন্দেও কুরআন শেখার সুযোগ হয়েছে। মাওলানা সায়্যিদ হুসায়ন আহমদ মাদানী (র)-এর খেদমতে আরয করলাম, আমাকে একটু সময় দিন যাতে পবিত্র কুরআনের কঠিন আয়াতসমূহ যা প্রচলিত তফসীর গ্রন্থে আমি আত্মস্থ করতে পারি নি— তা আপনার খেদমতে পেশ করে বুঝে নিতে পারি। মাওলানা ছিলেন তাঁর যুগের শ্রেষ্ঠ আলিমগণের অন্যতম। বিভিন্ন বিষয় ও হাদীস (তিনি ছিলেন যার

স্বীকৃত উস্তাদ ও শায়খুল হাদীস) ছাড়াও কুরআন শরীফে তাঁর ছিল গভীর প্রজ্ঞা। তাঁর জীবন ও স্বভাব ছিল কুরআনী রঙে রঙিন। তিনি আমাকে সময় দিয়েছিলেন শুক্রবারে। আমার মনে পড়ে কঠিন আয়াতগুলো আগে থেকে খুঁজে বের করে যথাসময়ে তাঁর সামনে পেশ করতাম। তাঁকে খুব বেশী সফর করতে হতো। সময়টি ছিল খিলাফত আন্দোলনের, তবুও আমি সুযোগ পেয়েছিলাম তাঁর নিকট থেকে কিছু 'ইলম হাসিল করার।

সাইয়েদ সুলায়মান নদভী (রহ.)-এর কুরআন প্রজ্ঞা

নিকট অতীতের শ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞ মাওলানা সায়্যিদ সুলায়মান নদভী (রহঃ)-এর তাফসীর ও বিভিন্ন আয়াত সম্পর্কে তাঁর সারগর্ভ আলোচনা শোনার অবকাশ আমার হয়েছে। আমি তো কুরআন অনুধাবনে কারো জ্ঞান, গভীরতা তাঁর সাথে তুলনীয় পাই নি। আমার এ দাবী একটা ঐতিহাসিক তথ্য। কেননা লোকেরা সায়্যিদ সুলায়মান নদভীকে (রহ.) মনে করে ইতিহাসবেত্তা কিংবা চরিত-রচয়িতা কিংবা কালামশাস্ত্রবিদ। কিন্তু আমার মতে কুরআনের উপলব্ধিতে তাঁর স্তর এত উঁচুতে যে, কুরআন অধ্যয়নের প্রসারতা ও গভীরতায় গোটা উপমহাদেশে কেউ তাঁর স্তরে উপনীত হতে পারেন নি। তাঁর এ সুগভীর প্রজ্ঞার মূলে ছিল আরবী ভাষা ও সাহিত্য এবং বালাগাত ও ই'জায (অলংকরণ ও বর্ণনাশৈলীতে কুরআনের সর্বকালীন চ্যালেঞ্জের ঊর্ধ্বে অবস্থান ও সর্বব্যাপী শ্রেষ্ঠত্ব) বিষয়ে তাঁর গভীর পাণ্ডিত্য। তা ছাড়া এ বিষয়ে তিনি ইমাম ও বিশেষজ্ঞ, মাওলানা হামীদুদ্দীন ফারাহী (রহ.)-এর সান্নিধ্য, তাঁর আলাপচারিতা এবং তাঁর গবেষণা ও কুরআন অধ্যয়নের নির্যাস গ্রহণ করেছিলেন। আমার আজও মনে পড়ে, একবার দারুল-মুসান্নিফীনে (আজমগড়) আমরা সূরা জুমআর ওপর তাঁর বক্তৃতা শুনেছিলাম। এমন পাণ্ডিত্যসুলভ গবেষণা ও সূক্ষ্ম আলোচনাসমৃদ্ধ বক্তৃতা আর কখনো শুনি নি। হায়! তা যদি সংরক্ষিত হয়ে থাকত। মোট কথা, এ মহান ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্যে আমি কুরআন অধ্যয়নে উপকৃত হয়েছি।

তারপর আসে দারুল-উলূম নাদওয়াতুল-'উলামা' (শিক্ষাঙ্গনে) আমার উস্‌তাদরূপে কুরআন অধ্যয়নের পালা। সেখানে বিশেষভাবে কুরআন পঠনের দায়িত্বে নিয়োজিত করা হয়েছিল আমাকে। প্রসংগত উল্লেখ্য, নাদওয়াতুল-উলামায় কুরআন শিক্ষা দু'টি স্তরে বিভক্ত। প্রথমত, তাফসীরবিহীন মূল কুরআনের ভাষ্য পড়ানো হয় (সম্ভবত এ পদ্ধতির উদ্ভাবক নাদওয়াতুল-উলামাই, অন্যরা পরে এর অনুসরণ করেছেন)। তাফসীরবিহীন আল-কুরআন ছাত্র-শিক্ষকের সামনে থাকে। শিক্ষক তাঁর অধ্যয়নের আলোকে ভাবার্থ পেশ করেন। এতে সরাসরি কোরআনী মহাজ্ঞান আহরণের যোগ্যতা সৃষ্টি হয়। অনেক বছর এ পন্থায় কুরআনের যোগ্যতা

সৃষ্টি হয়। অনেক বছর এ পদ্ধতিতে কুরআনের খেদমত করার তওফীক আল্লাহ আমাকে দিয়েছিলেন। তাফসীর পড়াবার অবকাশও হয়েছে। তবে মূল কুরআনই আমার দায়িত্বে ছিল অধিক সময় আর আমার দায়িত্বে অর্পিত অংশ ছিল অধিক তাফসীরসম্বলিত। এসব কথার অবতারণা করে আত্মপরিচয় দানের উদ্দেশ্য মাত্র একটাই, আর তা হলো, অধম পবিত্র কুরআনের এক নগণ্য খাদিম। একথা আপনাদের অন্তর্লোকে গেঁথে দেওয়া। আমার পরবর্তী জীবনে যা কিছু (ভাঙা-চোরা) কাজ করেছি তার সবই মহান আল-কুরআনের অবদান।

"কবিতা যা কিছু করেছি তা আল-কুরআনেরই দান।"

আমার লেখা নগণ্য নিবন্ধাদি ও বই-পুস্তক যাঁরা পড়ে দেখেছেন তাঁরা অবশ্য লক্ষ্য করেছেন, আমার লেখার মাল-মসলা, তত্ত্ব ও বুনন সবই আল-কুরআন থেকে। অতঃপর সাহায্য নিয়েছি ইতিহাসের। অবশ্য আমি ইতিহাসকে মনে করি আল-কুরআনের বিশ্বজোড়া ব্যাখ্যা।

'ইজতিবা' সীমিত, হিদায়াত ব্যাপক

পঠিত আয়াতে দু'টি বিষয় বিবৃত হয়েছে। এক. ইজতিবা' স্তর, দুই. হিদায়াত স্তর। ইজতিবা অর্থ মনোনয়ন, নির্বাচন ও বাছাইকরণ। এ বিষয়ে আল্লাহ পাকের বিধান হলো নিযুক্তকরণ।

"আল্লাহ যাকে মর্যী করেন তাকেই বাছাই করে নেন।" এটা আল্লাহর একান্ত অধিকার, যাকে ইচ্ছা তাকে তিনি বেছে নিয়ে মনোনীত করে 'ইজতিবা'-র মর্যাদায় ভূষিত করেন।

কিন্তু হিদায়াত সার্বজনীন প্রয়োজনীয় বিষয়, তাই তা ব্যাপকতর এবং তাই তার বিধান হলো, "যারাই ধাবিত ও আকৃষ্ট হয়, হিদায়াত অন্বেষী হয়, নিজেকে অক্ষম, নগণ্য ভেবে বিনয় ও আগ্রহের সাথে যারা অগ্রগামী হয় আর আপনাকে করে দেয় তুচ্ছাতিতুচ্ছ, আল্লাহ পাক তাদের লাগিয়ে দেন পথ-পরিক্রমায়, পৌঁছে দেন শেষ মনযিলে। কিন্তু তার জন্য মূল শর্ত থাকে 'ইনাবাত' গুণে গুণান্বিত হয়ে আপনাকে নীচু করে মহান সত্তার পানে ধাবিত হওয়া। এ কথাটিই বিবৃত হয়েছে আয়াতে–যারা আকৃষ্ট ও ধাবিত হয়, তাদের তিনি হিদায়াত দেন, পথ দেখান আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছার। আমার আলোচনাও আজ এ বিষয়ে।

পবিত্র কুরআনের রয়েছে দু'টি সম্পূরক ধারা ঃ প্রথমটি হলো তার 'তা'লীম ও তাবলীগ অর্থাৎ সে সব 'আক্বীদা ও মৌল বিশ্বাসের আলোচনা যা অনুধাবন করা এবং যার প্রতি ঈমান রাখা প্রত্যেক মানুষের জন্য অপরিহার্য। আর তা আহরণ করতে হবে সরাসরি আল-কুরআন থেকে। কেননা এ বিষয়ে আল-কোরআনের দাবী হলো (সুস্পষ্ট প্রাঞ্জল আরবী ভাষায়), বরং আরও সুস্পষ্ট দাবী করে ঘোষিত

হয়েছে, "কুরআনকে অবশ্যই আমি সহজ ও প্রাঞ্জল করে দিয়েছি অধ্যয়ন উপদেশ আহরণে। কেউ কি আছে উপদেশ গ্রহণে আগ্রহী?"

আল-কুরআন পাঠে কোন মানুষ মুশরিক হতে পারে না

কারো যদি একথা জানার আগ্রহ হয়, তার স্রষ্টা আল্লাহ তার কাছে কী দাবী করেন? তার হিদায়াত প্রাপ্ত হওয়ার পূর্বশর্ত কী কী? কুরআনের বিবৃত তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের রূপরেখা কী কী? পৃথিবীতে হিদায়াত ও আখিরাতে নাজাত লাভের রহস্য কিসে নিহিত? এসব প্রশ্নের সমাধানে আল-কুরআনের বর্ণনা সাবলীল ও প্রাঞ্জল। "কুরআন থেকে এ বিষয়গুলো বুঝতে পারছি না, কাজেই কুরআন আমাদের জন্য দলীল নয়"—এ অভিযোগ উত্থাপনের কিংবা অপারগতা প্রকাশের অবকাশ দেওয়া হবে না কাউকে।

• তাওহীদ ও একত্ববাদ বিবৃত হয়েছে স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতম, সবলতম ও উজ্জ্বলতম ভাষ্যে। দু'কথায় কোন বিষয় বুঝিয়ে দেওয়ার মতই বিষয়টি আল-কুরআনে বিদ্যমান। কাজেই কুরআন পড়ে আর যা-ই হোক, কেউ মুশরিক থেকে যাবে, এমন হতে পারে না। আমি সার্বজনীন ঘোষণা দিচ্ছি, কুরআন অধ্যয়নকারীরা ঠোকর খেতে পারে, বে'আমল হতে পারে, ফাসিক, ফাজির হতে পারে, কিন্তু একত্ববাদ ও অংশীবাদ, তাওহীদ ও শিরক বিষয়ে তাদের দ্বিধা-দ্বন্দ্বের কোন অবকাশ থাকতে পারে না। তাওহীদ বর্ণনায় তো আল-কুরআন দিবা সূর্য না, বরং তার চাইতে সমধিক উজ্জ্বল। অনুরূপ রিসালাতের 'আক্বীদা নবুওত কিসের নাম? নবীগণের পরিচয় কি? তাঁদের দায়িত্ব ও কর্তব্য কী ছিল? কী করার জন্য তাঁরা আদিষ্ট হতেন? তাঁদের দেয়া শিক্ষা কী ছিল? তাঁদের জীবন-চরিত কেমন মহান ও সুপবিত্র হতো? এ সবের বর্ণনায়ও আল-কুরআন উজ্জ্বলতম গ্রন্থ। সুস্পষ্ট বর্ণনায় রয়েছে নবীগণের আত্মপরিচিতি এবং সাথে সাথে উত্থাপিত ও উত্থাপনকৃত মন্তব্য ও প্রশ্নসমূহের জওয়াব। পড়ুন সূরা আ'রাফ, সূরা হূদ, সূরা শু'আরা'। এসব সূরার নাম নিয়ে নিয়ে নবীদের পরিচিতি ও তাঁদের প্রদত্ত শিক্ষা তুলে ধরা হয়েছে।

যুক্তি ও বুদ্ধি বিচারকর্তা নয়, উকীল হতে পারে

আল-কুরআনের রিসালাত ও নবী-রাসূলগণের আলোচনায় কোন ভ্রান্ত উপলব্ধির অবকাশ নেই। তবে একথা স্বতন্ত্র, কেউ যদি গোমরাহী ও ভ্রষ্টতার জন্য উঠে পড়ে লেগে যায়, তা হলে এ পৃথিবীতে যুক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির জোরে কত কিছুই না করা যায়! উপস্থিত সুধীবৃন্দের মাঝে এমন কোন তীক্ষ্ণধী বাকপটু থাকতে পারেন, যিনি এই রাতের বেলা দাঁড়িয়ে জোর গলায় দাবী করবেন, এখন তো রাত নয়, দিন চলছে এবং তা রৌদ্রোজ্জ্বল দুপুর, এই তো সূর্য কিরণের তাপ ও দাহ অনুভূত হচ্ছে। হতে পারে, তিনি ক্ষুরধার যুক্তি ও গলার জোরে তার দাবী প্রমাণ

করে দেবেন, আমাদের সবাইকে করে দেবেন বোকা ও লা-জওয়াব। এটা হচ্ছে গলাবাজি ও বুদ্ধির খেলা। আদালতগুলোতে মামলা-মোকদ্দমায় এই ঘটে থাকে। দিনকে রাত আর রাতকে দিন বানিয়ে উকীলরা মামলায় জিতে যান। আমাদের উস্তাদ মাওলানা 'আবদুল বারী নদভী (রহ.) বলতেন, "বুদ্ধি বিচারক (জজ) নয়, তা উকীল মাত্র, ফিস পেয়ে গেলে সে দাবী প্রমাণ করে যে কোন মামলা জিতিয়ে দিতে পারে। এজন্য পৃথিবীতে উদ্ভাবিত নতুন নতুন দর্শনকে বুদ্ধি তার ক্ষুরধার যুক্তি দিয়ে এমনভাবে পেশ করেছে। যেন তা সর্বজনস্বীকৃত নিরেট বাস্তব! কাজেই কেউ যদি স্থির করে বসে, কুরআন থেকে ভ্রান্ত দাবী প্রমাণিত করবে, তা হলে তা স্বতন্ত্র ব্যাপার। একটা দৃষ্টান্ত নিন, ইসলামিক স্টাডিজ কনফারেন্স হচ্ছিল। স্থান ও ব্যক্তির নাম উল্লেখ করছি না। জনৈক প্রবন্ধ পাঠক তাঁর প্রবন্ধে একথা দাবী করলেন, পবিত্র কুরআনে যতবার 'সালাত' (নামায) শব্দ উল্লিখিত হয়েছে তার অভিন্ন অর্থ হলো 'আঞ্চলিক সরকার'। 'আর আস-সালাতুল-উসতা' (আসরের নামায) দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কেন্দ্রীয় সরকার। তিনি যুক্তি দ্বারা তাঁর দাবী প্রমাণে সচেষ্ট হলেন। অবশেষে কঠোর ভাষায় আমাকে তা খণ্ডন করতে হলো।

মহাজ্ঞানের চিরন্তন ভাণ্ডার, হিদায়াত প্রদানে সহজ আল-কুরআন

হিদায়াত লাভ ও পথ প্রদর্শনে আল-কুরআনের সহজ হওয়া সন্দেহাতীত। কিন্তু তার অসীম জ্ঞান-ভাণ্ডার, তার সমুন্নত ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়মালা, সে সম্পর্কে কারো এ দাবী যে, সব কিছু বুঝেছি কিংবা এ অহমিকা, 'আমি যা বুঝেছি তা-ই ঠিক আর সব বাতিল'-এ দাবী অশ্রাব্য ও বাতুলতামাত্র। পবিত্র কুরআনের কোন বিষয়ে স্বতন্ত্র, একাকী ভিন্ন মত পোষণ করা ভয়াবহ ব্যাপার! হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর বাণী ঃ ইয়া আল্লাহ! পবিত্র কুরআনের কোন বিষয় সম্পর্কে ভিত্তিহীন কোন বাজে উক্তি করলে আমাকে ছায়া দেবে কোন্ আসমান? বহন করবে কোন্ যমীন?

কুরআন বিষয়ে সাহাবীগণের মন্তব্য ও আচরণ ছিল অনুরূপই। হযরত 'ওমর (রা.) কোন শব্দ সম্পর্কে আত্মজিজ্ঞাসা করতেন ঃ এ শব্দের অর্থ কী? আবার নিজেই থমকে গিয়ে বলতেন, "ওমর! মরে যাও! তোমার মায়ের পুত্রশোক হোক! একটা শব্দের অর্থ না জানা থাকলে তোমার বয়ে গেল কি?" সাহাবায়ে কিরামের ভাবনা পদ্ধতি থেকে এ কথা সহজেই অনুমেয়, তাঁরা সঠিকভাবে কুরআনের মহাজ্ঞান আত্মস্থ করা 'সম্ভব' মনে করতেন না এবং তা জরুরীও ভাবতেন না। আল-কুরআন সম্পর্কে আমার এ মন্তব্য দুঃসাহস ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে বিবেচনা করবেন। আমি বলতে চাই, আল-কুরআনের যা আত্মা, যা তার মূল সুর, মূল দাবী ও মুখ্য উদ্দেশ্য, তা হাসিল করা অপরিহার্য, আল-কুরআনের সাথে আচরণ হতে হবে আদব ও বিনয়ের।

অনেক বিষয় এমন রয়েছে যার তত্ত্ব ও তথ্য আমাদের নাগালের বাইরে। কিন্তু তা ঐ সব বিষয় থেকে পরিপূর্ণ উপকার লাভের ব্যাপারে আমাদের জন্য অন্তরায় হয়নি। তাই কেউ যদি কুরআনের হাকীকত, মূল তত্ত্ব এবং সুনিবিড় ও সুগভীর ভাবার্থ আহরণে অপারগ হয়, এমন কি যদি শব্দগুলোর শাব্দিক অর্থও অজানা থাকে, কিন্তু তার অন্তরে থাকে আল্লাহর ভয় আর তার আযাব-ভীতি, তার অবস্থা যদি এমন হয়, কুরআন তিলাওয়াতের আওয়ায তাকে করে সন্ত্রস্ত ও উদ্বেলিত যার বর্ণনা দিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ্ পাক, "পর্বতশৃঙ্গে নাযিল করা হলে এ কুরআন তুমি দেখতে পেতে বিচূর্ণ তাঁর (আল্লাহর) ভয়ে" অর্থাৎ কুরআন শুনে তার গায়ের পশম কাঁটা দিয়ে ওঠে। সে হয় কম্পিত, তার রন্ধ্রে রন্ধ্রে জাগে স্পন্দন ও প্রকম্পন আর সে বলতে থাকে, এ যে আমার মহান রবের (প্রতিপালকের) কালাম! এ যে আল্লাহর বাণী! এমন ব্যক্তি সম্পর্কে প্রায় সুনিশ্চিত এ আশা করা যায়, সে উপনীত হবে হিদায়াতের সর্বশেষ মনযিলে আর সে পেয়ে যাবে কুরআনের সান্নিধ্য। হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে ঃ

"এমন কতেক লোকও হবে কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করবে এবং তা করবে চরম ভনিতার সাথে। কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালীর নীচে প্রবেশ করবে না।" আগে উল্লিখিত হৃদয়বানেরা হবেন এদের থেকে স্বতন্ত্র।

মোটকথা, আল-কুরআনের বিষয়বস্তু ও অর্থ-ভাণ্ডার সম্পর্কে একজন ছাত্র হিসেবে আমি আরয করতে চাই, তা এক অকূল সাগর যার বিশালতা ও প্রসারতা দেখে সকল শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ও বরেণ্য মনীষীই প্রকম্পিত হয়ে উঠেছেন এবং এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত হিদায়াত ও তওফীক ব্যতিরেকে কেউ এ পথে এক পা-ও অগ্রগামী হতে পারে না।

সুবুদ্ধি ও জ্ঞান আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে

প্রথম কথাঃ কোন কিছু বুঝে ফেলা ও অনুধাবন করার শক্তি আসে আল্লাহর পক্ষ থেকে। আর পবিত্র কুরআনের ব্যাপারে এ উপলব্ধি হাসিল হয় সে সব বিশিষ্ট বান্দাদের, যাদের অন্তরে বিদ্যমান থাকে আল্লাহর ভয় ও রাব্বানী কালামের প্রভাব। অন্তর সজীব ও পরিপূর্ণ থাকে আল্লাহর বাণীর প্রভাব মাহাত্ম্যে। এসব অন্তরেই আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতারিত হয় 'ইলম ও মহাজ্ঞান। দ্বিতীয় কথাঃ নফল নামাযে কুরআন তিলাওয়াতের অভ্যাস করুন। কল্পনা করতে থাকুন যেন হৃদয় মাঝে তা এ মুহূর্তে অবতীর্ণ হচ্ছে! তার স্বাদ আস্বাদন করতে থাকুন, তাতে বিলীন হয়ে যাওয়ার সাধনা করুন। কুরআন শরীফ মস্তিষ্ক চর্চার ক্ষেত্র নয়, নয় কোন বুদ্ধির ব্যায়ামাগার। তাই সেখান থেকে কসরত করে নিজের পছন্দসই মতলব বের করার অপপ্রয়াস চালানো যেতে পারে না।

তৃতীয় কথাঃ অধ্যয়নকালে কুরআনের কোন অর্থ বা ভাবার্থ বুঝে আসলে বুঝতে পারলে তা এভাবে প্রকাশ করুন, আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে নগণ্য বুদ্ধিতে এ অর্থ উপলব্ধিতে আসে। এমন দাবী কখ্খনো করবেন না, আজ পর্যন্ত কুরআন বুঝতে সক্ষম হননি কেউ। আজই আমি তার রহস্য উদ্‌ঘাটন করলাম। এমন দাবী বাগাড়ম্বরমাত্র। একথা আমি বারবার বলেছি ও লিখেছি, বিগত তের শত বছর কেউ কুরআন বোঝে নি—এ দাবী পবিত্র কুরআনের বিপক্ষে বিরাট অভিযোগ। কেননা কুরআন তো দাবী করছে প্রাঞ্জল আরবী ভাষায় ঃ আর আমি নাযিল করেছি সাবলীল আরবী কুরআন। যাতে তোমরা তা হৃদয়ঙ্গম করতে পার। পক্ষান্তরে আপনার দাবী হচ্ছে, হাজার বছরে বিগত শতাব্দীগুলোতে কুরআন পাকের অমুক শব্দটির রহস্য কেউ উদ্ঘাটন করতে পারেনি (আমিই তা করেছি) এ দাবীর স্পষ্ট অর্থ হলো, এ যুগ-যুগান্তর ধরে কুরআনের অর্থ অনুধাবনের দ্বার রুদ্ধ রয়েছে।

আলীগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটির এক সেমিনারের সমাপনী (সভাপতির) বক্তৃতায় আমি বলেছিলাম, জ্ঞানসেবী ও গবেষকগণ তাঁদের গবেষণা এ ভূমিকাসহ পেশ করে থাকেন, আমাদের অধ্যয়ন ও গবেষণালব্ধ ফল এই, আমি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি। কেউ তাঁর গবেষণার ফলাফল শতকরা এক শ' ভাগ নির্ভুল হওয়ার ব্যাপারে জিদ করে কিংবা সব ভিন্ন মতকে বাতিল ঘোষণা করে দেবে—এ পদ্ধতি যথার্থ ও স্বীকৃতিযোগ্য নয়।

আল-কুরআন হচ্ছে নিত্য-নতুন ও অক্ষয় সজীবতার অধিকারী। তার অভিনবত্বের কোন সীমা-সরহদ নেই। হযরত নূহ্ (আ.)-এর মত জীবন লাভ করে তা কুরআন অধ্যয়ন ও তার মর্ম অনুধাবনে ব্যয় করতে থাকলে প্রতি মুহূর্তে নতুন নতুন অর্থ উদ্ঘাটিত হবে। আমাদের জীবনের সীমিত সময় ও সীমিত শক্তি ও যোগ্যতা সত্ত্বেও এ দাবী করা, ইতোপূর্বে কেউই কুরআন বুঝতে পারে নি, বাতুলতামাত্র।

আমার ব্যক্তিগত গ্রন্থ

শেষ ও মৌলিক কথাটি হলো, পবিত্র কুরআনকে একান্ত নিজস্ব কিতাব মনে করতে হবে। এ হচ্ছে চিরন্তন গ্রন্থ, আসমানী কিতাব, কিন্তু সেই সাথে আমার ব্যক্তিগত গ্রন্থ, হিদায়াতনামা ও পথপ্রদর্শক। এতে দিক নির্দেশিত হয়েছে আমার দুর্বলতাগুলোর, চিহ্নিত হয়েছে আমার রোগসমূহ।

যে কোন মানুষ আল-কুরআনের আয়নায় নিজের চেহারা দেখে নিতে পারে। আর এ কাজটি করার জন্য পূর্বশর্ত হলো একে জীবন্ত গ্রন্থ ও একান্ত আপন কিতাব মনে করা। নিজের ভেতরে আত্মশুদ্ধির উদ্দীপনা থাকতে হবে, অপরকে শোধরাবার কাজ পরে করা যাবে, প্রথমে নিজেকে শুধরে নিই। নবীগণের পদ্ধতি হচ্ছে, প্রথমে

আত্মশুদ্ধি, পরে অন্যদের কিছু বলা। আমরা অনেকে কুরআন অধ্যয়ন করি, তা দ্বারা অপরের সাথে হুজ্জত করার হীন উদ্দেশ্য নিয়ে, অন্যকে লজ্জিত করার মনোবৃত্তিতে, অথচ সাহাবায়ে কিরাম কুরআন তিলাওয়াত করতেন আত্মশুদ্ধির নিয়তে। মাত্র এক আয়াত তিলাওয়াত করেই তার ওপর আমল শুরু করে দিতেন। আর এজন্যই শুধু সূরা বাক্বারা সমাপ্ত করতেও অনেক সাহাবীর কয়েক মাস লেগেছিল।

একজন তালিব 'ইলম হিসেবে মনের কথাগুলো আপনাদের সামনে রেখে দিলাম–(যারা আগ্রহ নিয়ে ধাবিত হয় তাদেরই তিনি হিদায়াত দেন)। এ ময়দানে যথাসাধ্য সাধনা করতে থাকি। আল্লাহ তাঁর মর্জি মুতাবিক কাউকে ইজতিবা' (মনোনয়ন) স্তরে উপনীত করবেন। সে স্তরের বাধ্যবাধকতা আমাদের জন্য নয়। আমরা যদি শিখতে চাই, হিদায়াত হাসিল করতে আগ্রহী হই, আত্মগঠনে উদ্‌গ্রীব হই, জীবনে বিপ্লব সাধন করতে চাই, তা হলে আমাদের জন্য রয়েছে পবিত্র কুরআন, যা আমাদের পথ দেখাবে এবং অবশেষে অভীষ্ট লক্ষ্যে (মনযিলে মকসুদে) পৌঁছে দেবে। আমাদের মাঝে থাকতে হবে হিদায়াতের চাহিদা, অভাবের অনুভূতি, অসহায়ত্বের স্বীকৃতি ও আকুতি। আর এ সবের সমষ্টির নামই হচ্ছে 'ইনাবত', আল্লাহর প্রতি ঝোঁক, আল্লাহতে আগ্রহ । আমি দু'আ করছি, আপনারাও দু'আ স্মরণে রাখুন!

আজকের উম্মাহ : বদর যুদ্ধের অবদান

ولقد نصر كم الله ببدر وأنتم أذلة ـ فاتقوا الله لعلكم تشكرون ـ

"এবং নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা বদর যুদ্ধে তোমাদেরকে সাহায্য করেছেন, অথচ তোমরা ছিলে তখন অসহায়। সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় করতে থাক, যাতে করে কৃতজ্ঞ বান্দা হতে পার।" [আলে-ইমরান ঃ ১২৩]

বক্ষ্যমান আয়াতটিতে আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় ইরশাদ করেছেন ঃ হে মুসলিম জাতি! তোমরা যখন অসহায় ছিলে, দুর্বল ছিলে, ভয়ানক আশঙ্কায় ছিলে, ঠিক তখনি আমি তোমাদেরকে বদর যুদ্ধে বিজয় দান করেছি। তাই তোমরা আমাকে ভয় কর যাতে কৃতজ্ঞ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হতে পার।

সুধীমণ্ডলি!

আজকের এই বিশাল বর্ণাঢ্য তাবলিগী ইজতিমায় আমি এই আয়াতটি পাঠ করেছি বলে উপস্থিত বিজ্ঞজনরা হয়তো তাজ্জব হতে পারেন! কেউ হয়তো ভাবতে পারেন, তা হলে বুঝি বদর যুদ্ধের ইতিহাস শোনাব আপনাদেরকে। কিন্তু আমার কথা হলো, শুধু দাওয়াত ও তাবলীগই নয়, বরং আমাদের মুসলমানদের সামগ্রিক জীবন, মুসলিম উম্মাহর বর্তমান অস্তিত্ব, বিজয় ও সফলতার সাথে এই আয়াতের সম্পর্ক খুবই গভীর! আমি ইতিহাসের একজন নগণ্য ছাত্র হিসেবে, একজন দৃষ্টিমান মানুষ হিসাবে যদি এ কথা বলি, বর্তমান পশ্চিমা বিশ্বে যে অসংখ্য মুসলমানের বসবাস, মুসলমানদের রাজত্ব ও শান-শওকত, ক্ষমতা ও সম্পদের প্রাচুর্য, দীনী দাওয়াত ও ইসলামী আদর্শের তৎপরতা, অসংখ্য মাদরাসা, এমন কি আন্তর্জাতিক এই নদওয়াতুল উলামা মাদরাসার সুবিশাল লাইব্রেরি, বিশ্বময় অসংখ্য বর্ণাঢ্য লাইব্রেরি-রচনাবলীর বিশাল সম্ভার, ইতিহাস, বরং পরিপূর্ণ মানবেহিতাসে মুসলিম মিল্লাতের যে অবদান, জ্ঞান চর্চা, গবেষণা, রচনা, আল্লাহর ইবাদত, তাওহিদী বিশ্বাসের তরঙ্গময় জোয়ার, এই যে বিশ্ব জুড়ে ইসলাম চর্চার, ইলাহী দাসত্বের আলোকময় দৃশ্য-এসবই বদর যুদ্ধে বিজয়ের ফসল এবং শুধুই বদর যুদ্ধে বিজয়ের ফলাফল। আমি তো বলব, এই যে আমরা নামায পড়লাম, এই যে আমরা রোযা রাখছি, যাকাত দিচ্ছি, হজ্জ্ব করছি, এ সবই সেই বদর যুদ্ধেরই আলোকিত ফসল। আজকের তাবলিগী ইজতেমা ও ইজতিমার এই চোখ জুড়ানো শীতল দৃশ্যও সেই বদর যুদ্ধেরই দান।

বদর যুদ্ধের সময় মুসলমানদের অবস্থা

মাত্র তিন শ' তেরজন মুসলমান! আল্লাহ্‌র পথে সংগ্রামের অবিনাশী প্রত্যাশায় বেরিয়েছেন তাঁরা মদীনা থেকে। তাঁরা মদীনাকে রক্ষা করতে বদ্ধপরিকর! সংগ্রাম তাঁদের আল্লাহর দীনকে হেফাযত করার লক্ষ্যে। এদিকে এক হাজার সশস্ত্র যোদ্ধা প্রস্তুত! তারা মুখ ব্যাদান করে দাঁড়িয়ে আছে এই নবশক্তির মূলোৎপাটন করতে, এর অস্তিত্ব চিরতরে নিশ্চিহ্ন করে দিতে। তারা রণসাজে সজ্জিত হয়ে এসেছে। পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে এসেছে। অধিকন্তু তারা লড়াকু স্বভাবের লোক। এদিকের মুসলমানদের অবস্থা হলো, তাদের ঘরে খাবার নেই। সঙ্গী যোদ্ধাদের মধ্যে কয়েকজন কোমল বালক যোদ্ধাও আছেন এবং তাঁরা সকলেই আল্লাহ্‌র পথে সংগ্রামের অসম প্রেরণায় উদ্দীপ্ত! আবেগ তাঁদের বাঙময়। কিন্তু এখানে তো প্রয়োজন আসবাব-উপায়-উপকরণের। সমরাস্ত্র, যোদ্ধা সংখ্যা, রণকৌশল, যুদ্ধের সামগ্রিক প্রেক্ষিত ইত্যাকার বিবেচনায় যে কোনো সুস্থ বিবেকবান, অংকশাস্ত্রে সামান্য বোধ আছে যার, সেও বলবে, এটা কি করে সম্ভব! একদিকে সশস্ত্র হাজার যোদ্ধা, অন্যদিকে অসহায় তিন শ' তেরজন। এমন অসম যুদ্ধ হয়?

সন্দেহ নেই, পার্থিব জগতের সব কিছুই আল্লাহর সৃষ্টি এবং সকল বস্তুর শক্তি বৈশিষ্ট্য এবং কার্যক্ষমতাও তিনিই সৃষ্টি করেছেন। তাই তাঁর ইচ্ছা ও অভিপ্রায় যতক্ষণ পর্যন্ত বস্তুর শক্তি ও বৈশিষ্ট্যের অনুকূলে ততক্ষণ পর্যন্তই সেই বস্তুর শক্তি ও ক্ষমতা বাস্তবতায় রূপায়িত হবে। বিজয় হবে হাজার জনের অসহায় নিরস্ত্র তিন শ' তেরজনের ওপর। আল্লাহ্ ক্ষমা করুন, তিনি যদি সেদিন এই সিদ্ধান্ত নিতেন তা হলে সেই তিন শ' তেরজনের জীবন বিজয় ও অবদানের আলোচনা আজ কে করত? আর ইসলামই বা অবশিষ্ট থাকত কীভাবে?

আমি যা বলতে চাই তা হলো, এটা ঐতিহাসিক সত্য, তিন শ' তেরজন হাজার জনের বিরুদ্ধে জয় লাভ করেছেন। কিন্তু বলার কথা হল, স্বাভাবিকতার পরিপন্থী, আকল ও বিবেকবিরোধী কায়দায় এই তিন শ' তেরজনের বিজয় হলো কেন? এই কেনটাকেই গভীরভাবে বুঝতে হবে আমাদেরকে। বিজয়ের এই নিগূঢ় রহস্য উপলব্ধি করতে হবে, স্মরণ রাখতে হবে, সঙ্গে রাখতে হবে এই উপলব্ধিটুকু! কারণ অর্থ, মানব কিংবা অস্ত্র বল তো তাঁদের ছিল না।

নবীজীর (সা) অস্থিরতা

হযরত (সা) অস্থির হয়ে পড়লেন। তিনি আল্লাহ্‌র দরবারে মুনাজাতে ভেঙে পড়লেন। তাঁর সে অস্থিরতা হযরত আবূ বকর (রা) পর্যন্ত সহ্য করতে পারছিলেন না। তিনি (সা) নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন! তিনি কান্নাবিজড়িত কণ্ঠে দু'আ করতে লাগলেন!

আবূ বকর (রা) জানতেন, তিনি যাঁর সাথে কথা বলতে যাচ্ছেন তিনি আল্লাহ্‌র রাসূল। তিনি সরাসরি আল্লাহ্‌র পয়গাম লাভ করে থাকেন। তাঁর দরবারে ওহী অবতীর্ণ হয়। তিনি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও সাহায্যের প্রতি সর্বাধিক আশাবাদী, বরং প্রত্যয়-বিশ্বাসের অধিকারী। তিনি আল্লাহ্ তা'আলাকে সর্ববিষয়ে সক্ষম মনে করেন। তিনি আল্লাহ্‌র ফয়সালাকে বস্তু শক্তি ও অস্ত্রের অধীন মনে করেন না, অথচ তিনিই আজ কান্নায় ভেঙে পড়েছেন! অবুঝ শিশুর মতো কান্না! হযরত আবূ বকর (রা) ধৈর্যের বাঁধন ধরে রাখতে পারলেন না আর। অস্থিরতায় ভেঙে পড়লেন তিনিও। বলে ফেললেন, "হে রাসূল! আর নয়! আল্লাহ দয়া করবেন! আপনি আর চিন্তিত হবেন না। আবূ বকর (রা) নবীজী (সা)-কে সান্ত্বনা দিলেন।

শাশ্বত সত্য নবীর এক ইলহামী উচ্চারণ

অতঃপর যে কথাটি বলতে চাই, সে কথাটি আমরা সকলেই হৃদয়ে গেঁথে নেব! আর সেই কথাটি হলো-বদর যুদ্ধের এই কঠিন মুহূর্তে হযরত (সা)-এর যবান মুবারক থেকে একটি বাক্য উচ্চারিত হয়েছিল। সীরাত পাঠকরা সেই বাক্যটি পড়েন, তবে চিন্তা করেন না। থমকে দাঁড়ান না। সেই বাক্যের গভীরে প্রবেশ করেন না। বাক্যটি নিয়ে দীর্ঘ সময় চিন্তা করেন না। অবস্থাটি এমন, যদি আপনাদের একজনকে বলি, ভাই, আপনি এখন যে পথ দিয়ে হেঁটে আসলেন এ পথের ডান দিকে একটি সাইনবোর্ড আছে। আচ্ছা, সাইনবোর্ডটিতে কী লেখা আছে? বলবেন ঃ তা তো বলতে পারব না। প্রতিদিন কতবার এ পথে আসা-যাওয়া করি, কিন্তু লক্ষ্য করে তো কখনো দেখি না ওতে কী লেখা আছে। আর দরকারও তো নেই।

সীরাত পাঠকদের অবস্থাও অনুরূপ। বাক্যটির পাশ দিয়ে তারা রীতিমতোই যাতায়াত করেন। তবে খুব কম পাঠকই বাক্যটি নিয়ে চিন্তা করেন। খুব কম পাঠকই ভাবেন, এটা কেমন অদ্ভুত এক বাক্য-ঘুম ও চিন্তাকে সজাগ করে তোলে, ভাবিয়ে তোলে সমূহ অনুভব ও অন্তরসত্তাকে। বাক্যটি এমন যে, কেউ গভীর নিবিষ্টতাসহ যদি এই বাক্যটি পাঠ করে তা হলে সে স্তব্ধ হবে, বিচলিত হবে। ভেবে আকুল হবে নবীজী (সা) এ কী বলছেন!

পরিস্থিতির পুরো খোঁজ খবর নিয়েছেন রাসূল (সা)! শক্তি ও অস্ত্রের অবস্থা জেনেছেন। সংখ্যা ও মানসিক ব্যবধানের কথা জেনেছেন। দেখেছেন, কুরাইশরা রাগে-রোষে-ক্ষোভে ফেটে পড়বার উপক্রম আর মুসলমানগণ আল্লাহ বিশ্বাসে দৃঢ়-শান্ত; তাঁরা আল্লাহর সাহায্যকেই বিজয়ের উৎস বলে জ্ঞান করে। সংঘাতময় প্রচণ্ড উত্তপ্ত এক মুহূর্তে তিনি মহান মনিবের দরবারে এমন একটি বাক্য উচ্চারণ করলেন যা শুধু চিন্তা করবারই নয়, বরং জীবনের সকল ক্ষেত্রে মূলনীতি হিসাবে বরণ করে নেবার উপযুক্ত। তিনি বললেন ঃ

اللهم ان تهلك هذه العصابة لاتعبد ـ

"হে আল্লাহ! তুমি যদি এই ক্ষুদ্র জামাতটিকে ধ্বংস করে দাও তা হলে তোমার ইবাদত করার আর কেউ থাকবে না।"

অর্থাৎ হাজার যোদ্ধার বিশাল বাহিনীর বিরুদ্ধে নিরস্ত্র বাহ্যত দুর্বল ও অসহায় এই তিন শ' তের সদস্যের ক্ষুদ্র কাফেলাকে তুমি যদি পরাজিত করে দাও, নিশ্চিহ্ন করে দাও, তা হলে তোমার এই বিশাল ভুবনে তোমাকে সিজদা করার, তোমার বন্দেগী করার আর কেউ থাকবে না। মূলত এমন ধরনের কথা একমাত্র নবীই বলতে পারেন যিনি আল্লাহ তা'আলার একান্ত প্রিয়ভাজন ও নৈকট্যপ্রাপ্ত মানুষও। সবচেয়ে বড় কথা হলো ঃ

مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحٰى ـ

"তিনি প্রবৃত্তির প্ররোচণায় কিছু বলেন না। যা বলেন তা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আদিষ্ট হয়েই বলেন।" [নাজম ঃ ৩-৪]

তাঁর প্রতি আল্লাহ্র প্রত্যাদেশ আসে। প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত এই মহান সত্তাই এই ইলহামী বাক্য উচ্চারণ করেছেন। অন্যথায় কোনো ওলী, কোন সিপাহসালার কিংবা অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন অনেক বড় মুফাসসিরের পক্ষেও একথা বলা সম্ভব নয়।

আরও লক্ষ্য করার বিষয় হলো, তিনি এ কথা যে মহান পূত পবিত্র সত্তার সমীপে আরয করছেন তিনি কিন্তু কারও মুখাপেক্ষী নন। তাঁকে কোন বিষয়ে ভয় দেখানো যায় না। মূলত এখানে প্রিয়তম নবীর মুখ দিয়ে এই অসাধারণ বাক্যটি তিনিই বলিয়েছেন যাতে করে কিয়ামত পর্যন্ত সকল মুসলমান গভীর দৃষ্টিতে লক্ষ্য করতে থাকে এ কেমন কথা বলেছিলেন নবীজী! শত বিস্ময়ে তারা যেন দাঁতে আঙ্গুল চেপে নির্বাক চিন্তা করতে থাকে— কেমন ভয়ঙ্কর পরিবেশ, কত অলৌকিকভাবে, বিস্ময়কর ভঙ্গিতে বলেছেন তিনি একথা। মূলত নবীজীর এই একটি বাক্য সম্পর্কে চিন্তা করতে করতে কেউ যদি বিচলিত হয়ে পড়ে, অস্থির হয়ে পড়ে কিংবা জ্ঞান হারিয়ে বেহুঁশ হয়ে পড়ে, তাহলে তাতে তাজ্জব হবার কিছু থাকবে না।

কিন্তু বাস্তব হলো আমরা ভাবতে অভ্যস্ত নই! এই যে রাসূল (সা) ইরশাদ করলেন, হে আল্লাহ! তুমি যদি এই ক্ষুদ্র দলটি ধ্বংস করে দাও তা হলে পৃথিবী থেমে যাবে না। পৃথিবীর কলকারখানা কাজ-কর্ম সবই চলবে, পৃথিবীতে আলো ঠিকই জ্বলবে, বিজয় ধারা ঠিকই অব্যাহত থাকবে, রাজত্বও থেমে যাবে না; সম্পদের বন্যাও যথার্থই বইবে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চাও থাকবে, তবে একটি কাজ হবে না। তোমার একক অনাদি সত্তার ইবাদত বন্ধ হয়ে যাবে। তারপর কি হলো?

মহান রাব্বুল আলামীন সম্পূর্ণ অলৌকিকভাবে বিস্ময়কর পদ্ধতিতে তাঁর অসীম-পরিচিত শক্তির বিকাশ ঘটালেন। খোদায়ী ইচ্ছা, কুদরতী ক্ষমতা আর অলৌকিক অভিপ্রায়ে মাত্র তিন শ' তেরজনের বিজয় হলো হাজার জনের বিরুদ্ধে। নিরস্ত্রগণের বিজয় হলো সশস্ত্রদের বিরুদ্ধে।

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ -

"বদর যুদ্ধে আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে বিজয় দান করেছেন, অথচ তোমরা ছিলে দুর্বল। সুতরাং আল্লাহকে ভয় কর যাতে কৃতজ্ঞ বান্দা হতে পার।" [আলে-ইমরান ঃ ১২৩]

এর সারমর্ম এটাই, বাস্তব নিয়ম, সাধারণ বাস্তবতা ও অভিজ্ঞতার বিপরীতে সম্পূর্ণ অলৌকিক ও বিস্ময়করভাবে আল্লাহ তা'আলা তিন শ' তেরজন নিরস্ত্র মুজাহিদকে বিজয় দান করেছেন শুধু এই কথা প্রমাণ করার জন্য, এই তিন শ' তেরজন তাঁর পৃথিবীতে তাঁর ইবাদত করবে; এঁদের মাধ্যমে তাঁর ইবাদতের ধারা অব্যাহত থাকবে বিশ্বময়।

বদর যুদ্ধে বিজয় : হিকমত ও লক্ষ্য

একথা সকলেই জানেন, যখন কোন শর্ত, কোন গুণ কিংবা কোন বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে বিরাট কোনো ফলাফল বিকশিত হয়, যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে বিস্ময়করভাবে বিজয় আসে তখন সেই গুণ শর্ত ও বৈশিষ্ট্যটি ধরে রাখাও অনিবার্য বলে বিবেচিত হয়। এর অর্থ হলো, এই পৃথিবীতে মুসলিম উম্মাহকে বেঁচে থাকার, সম্মান ও স্বাধীনতা ও মর্যাদার সাথে টিকে থাকার, মুক্ত প্রাণে আল্লাহর বন্দেগী করার, অন্যকে আল্লাহর ইবাদতের প্রতি আহ্বান করার, বিশ্বব্যাপী আল্লাহর বিধানাবলীর প্রচার ও বিজয় ঘটাবার, রাজ্য শাসন ও বিজয়ের ধারা অব্যাহত রাখার, আল্লাহ্‌র পরিচয়-মা'রিফাত, ইলমের সাধনা, অধ্যবসায় ও গবেষণার দরিয়া সৃষ্টির সুযোগ আল্লাহ পাক দেবেন। কিন্তু এসবের মূল প্রেরণা হতে হবে আল্লাহ্‌র ইবাদত। এই ইবাদতের জন্যেই তাদের অস্তিত্ব। ইবাদত করতে হবে নিজে; মেনে চলতে হবে আল্লাহ তা'আলার বিধানাবলী, এ পথে ডাকতে হবে অন্য সকলকে এবং একথাও মনে রাখতে হবে, ইবাদত শুধু নামায-রোযা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ নয় বরং সঠিক আকীদা, বিশুদ্ধ লেন-দেন, বিধৌত চরিত্রগুণ, আল্লাহর আইন ও বৈবাহিক জীবনে আল্লাহ্‌র নিয়ম মান্য করাটাও ইবাদতের মধ্যে শামিল। এই ইবাদতের মধ্যে সহীহ ব্যবসা-বাণিজ্য পর্যন্ত শামিল।

সারকথা হলো, আল্লাহ তদীয় কিতাবে ও রাসূল (সা) তাঁর পবিত্র হাদীসে যে জীবন পথের নির্দেশনা দিয়েছেন, অবতীর্ণ সেই পূর্ণাঙ্গ শরীয়তের ওপর আমল

করার লক্ষ্যেই সেদিন মহান আল্লাহ তা'আলা মাত্র তিন'শ তেরজনকে হাজার জনের বিরুদ্ধে জয়ী করেছিলেন। উম্মতের অস্তিত্বের মূল ভিত্তিই ছিল শরীয়তের ইত্তিবা।

আজ আমি একথা অত্যন্ত পরিষ্কার ভাষায় বলতে পারি, আজ পৃথিবীর মুসলমান যদি আকাশের গ্রহ-নক্ষত্রে চড়ে বসে, আকাশ ও প্রাকৃতিক পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করে ফেলে, মুহূর্তে কিংবা সেকেন্ডে যদি পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে পৌঁছে যায়, বিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধনে বিস্ময়কর রেকর্ড সৃষ্টি করে ফেলে, জ্ঞানের সাগর সৃষ্টি করে লাইব্রেরীতে শহরের পর শহর পূর্ণ করে ফেলে; স্মৃতি, মেধা, আবিষ্কার, রহস্য উদ্‌ঘাটন, সাহিত্য সৌকর্য, শারীরিক সৌন্দর্য, রূপ চর্চা, শক্তি ও কৌশলে সর্বোচ্চ মাত্রায় উন্নীত হয়ে বসে, হোক! তবে ওসব কিছু উম্মতের অস্তিত্ব রক্ষার গ্যারান্টি দিতে পারবেন।

অস্তিত্বের গ্যারান্টি

উম্মতের অস্তিত্ব ও মর্যাদাময় প্রতিষ্ঠার গ্যারান্টি ও নিশ্চয়তা দিতে পারে আল্লাহর ইবাদত প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। কারণ এই উম্মতকে বদর যুদ্ধে এজন্যই আল্লাহ তা'আলা বিজয় দান করেছিলেন, তারা আল্লাহ্‌র ইবাদতের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করবে, নিজে ইবাদত করবে, আল্লাহর বিধানের অনুসরণ করবে। বিশ্ববাসীকে আহ্বান করবে আল্লাহ্‌র বিধান পালনের জন্য।

আচ্ছা, হযরত (সা)-এর চেয়ে বেশি আল্লাহ তা'আলাকে আর কে জানে? আল্লাহ'র শান, আদব ও মর্যাদা আল্লাহর রাসূলের চেয়ে বেশি আর কে বুঝতে পারে? তিনি সেদিন আল্লাহ্‌র দরবারে যে কথাটি বলেছিলেন, আমি মনে করি, আল্লাহ তাআলাই তাঁর যবান দ্বারা এটা বলিয়েছেন এবং তিনি এমন একটি গুণ ও বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন যার মাধ্যমে পরিপূর্ণভাবে আল্লাহ'র জালাল ও জামাল-তাঁর মহান প্রভুত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব ফুটে ওঠে। অতঃপর তারই ভিত্তিতে আল্লাহ তা'আলা মুসলমানগণকে বিজয় দান করলেন যাতে করে কিয়ামত পর্যন্ত সকলের জন্যে এটা মূলনীতি হয়ে থাকে, প্রতিষ্ঠিত ভিত্তি হয়ে থাকে যে, মুসলমানদের অস্তিত্ব, জীবন, সম্মান, স্বাধীনতা ও অতীতকালের বিজয়সমূহ এই ইবাদতের ওপরই প্রতিষ্ঠিত, এমন কি ইসলামের আমল, দাওয়াত ও তাবলীগের সিলসিলা সবই এর ওপর প্রতিষ্ঠিত।

আমি দৃঢ় কণ্ঠে বলতে পারি, খেলাফতে রাশিদা থেকে খেলাফতে বনূ উমাইয়া পর্যন্ত, বনূ উমাইয়া থেকে খেলাফতে বনূ আব্বাসী পর্যন্ত, অতঃপর ইরান ও রোমের মত শক্তিশালী সাম্রাজ্যকে পরাজিত করা একান্তই অলৌকিক ব্যাপার ছিল। সেকালের ইরান-সাম্রাজ্যের সীমানা এসে ঠেকেছিল এই ভারত পর্যন্ত।

আজকের ইরাক তো সেকালের ইরানেরই অংশ ছিল, অথচ এই বিশাল শক্তি ও সাম্রাজ্যসমূহকে আল্লাহ্ তাআলা মুসলমানদের করতলে এনে দিয়েছিলেন এই লক্ষ্যেই-তাদের দ্বারা ইবাদতের ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে। তাঁরা আল্লাহ্র ইবাদত, দাসত্ব ও গোলামিতে ডুবে থাকবে এবং এ পথে আহ্বান করবে অন্যদেরকেও। আমি বলব, আজ পর্যন্ত মুসলমানরা যা কিছু লাভ করেছে, এমন কি এই যে আমরা মাগরিব নামায আদায় করলাম এটাও বদর যুদ্ধের বিজয়ের ফল ও বরকত। এই বিশাল তাবলিগী ইজতিমা, বাৎসরিক হজ্জের সম্মিলন, লক্ষ মানুষের মিলন মেলা, মিনা-আরাফার অবস্থান, তাওয়াফ-তাকবীর, সাফা-মারওয়ার সা'ঈ-বিশ্বময় মুসলিম মিল্লাতের শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন, ইবাদত-বন্দেগী সবই সেই বদর যুদ্ধের ফসল।

ইসলামের মু'জিযা

পৃথিবীতে এ পর্যন্ত কত ধর্মই তো এসেছে! ইতিহাস পাঠ করলে দেখবেন, কোনো ধর্ম এক'শ বছর টিকেছে, কোনোটি টিকেছে পঞ্চাশ বছর, কোনোটি তার চেয়েও কম। তারপর বিকৃত হয়ে গেছে, অথচ ইসলাম আজও টিকে আছে। শুধু টিকেই আছে না-এতে কোনোরূপ পরিবর্তন-পরিবর্ধন হয়নি আজ অবধি। আপন অবস্থায়, আপন বৈশিষ্ট্যে, স্বীয় আকীদা-বিশ্বাস ও সকল রীতি-নীতিসহ বহাল আছে স্বমহিমায়! আল্লাহ্র যিকর, নবীজীর প্রতিটি দরূদ পাঠ, আল্লাহ্র প্রতি প্রেমময় আনুগত্য, রাসূলের (সা) সাথে সুগভীর সম্পর্ক, সত্যের প্রতি সমর্থন ও সহযোগিতার অবিনাশী প্রেরণা, অন্যায় ও বাতিলকে প্রতিহত করার সংগ্রামী চেতনাসহই বেঁচে আছে ইসলাম। অধিকন্তু এই উম্মত সত্যকে সত্য মনে করে, অন্যায়কে মনে করে অন্যায়। রিপু ও কামনার আহ্বান আর আল্লাহ্র আনুগত্যের মধ্যে বিশাল ব্যবধান স্বীকার ও মান্য করে এই উম্মত। পৃথিবীর কোথাও এই উম্মতের কোন উপমা নেই। আল্লাহ্ তাআলার মহান গ্রন্থ আল-কুরআনের এটা মু'জিযা বটে। সর্বাধিক পঠিত সূরা—সূরা ফাতিহায় ইরশাদ হয়েছে ঃ

اهدنا الصراط المستقيم - صراط الذين انعمت عليهم - غير المغضوب عليهم و لا الضالين -

"আমাদেরকে সরল পথের সন্ধান দিন। তাঁদের পথ যাদের প্রতি আপনি নিয়ামত বর্ষণ করেছেন। পথভ্রষ্ট অভিশপ্তদের পথ নয়।"

বর্তমান পৃথিবীতে ইসলাম ছাড়া আসমানী ধর্ম বলতে দুটি ধর্মই টিকে আছে ঃ ইহুদী ধর্ম ও খৃস্টধর্ম। এই দুই ধর্মের একটিকে আল্লাহ তা'আলা এই সূরায় 'অভিশপ্ত' বলেছেন, অন্যটিকে বলেছেন 'পথভ্রষ্ট'। আর মুসলমানদের ধর্ম

বলেছেন—সরল সঠিক পথ। এই সরল পথ অর্জিত হয়েছে বদর যুদ্ধে এবং মুসলমানগণ এই সরল পথ নিয়ে সেদিন মদীনায় ফিরে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন। মদীনায় পৌছে তাঁরা বার বার পড়ছিলেন,

إِلاَّ تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِى الأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ـ

লক্ষ্য করুন! এই ক্ষুদ্র দল, অথচ সর্বাধিক মূল্যবান দলকেই লক্ষ্য করে বলা হচ্ছে, হে ক্ষুদ্রতম মুসলিম বাহিনী! [সূরা আনফালঃ ৭৩]

হে মক্কা থেকে আগত মুহাজিরগণ! হে খায়বার বিজয়ী আনসারগণ! শোন! তোমরা যদি কুফ্র ও শিরকের মোকাবিলায়, অন্যায় ও অন্ধকার বিতাড়নে, দুনিয়াব্যাপী ইলাহী আলো প্রজ্জ্বলনে, বিশ্ববাসীর মাথাকে আল্লাহ'র সামনে নত করতে বদ্ধপরিকর না হও; যদি সৎ চরিত্র, আদর্শ ও ন্যায়-নীতি প্রতিষ্ঠায়, রিপুপূজা, শায়তানিয়্যাত ও অপরাধ-চিন্তা থেকে বিশ্বমানবকে মুক্ত করতে কঠিন পদে না দাঁড়াও,

تَكُنْ فِتْنَةٌ فِى الأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ـ

"তাহলে পৃথিবীতে এক বিরাট বড় ফিতনা ও বিপর্যয় ঘটে যাবে।"

[সূরা আনফালঃ ৭৩]

আমি ইতোপূর্বে মক্কা শরীফে আরবদেরকেও বলেছি, আপনারা সংখ্যায় স্বল্প হলেও মূল্যে অনেক বেশি। আপনাদের পূর্বসুরিগণও তো সংখ্যায় খুবই নগণ্য ছিলেন। এক মুঠো ছিলেন তাঁরা পরিমাণে। বুখারী শরীফের বর্ণনা থেকে বোঝা যায়, তিনবার মুসলমানদের মধ্যে আদম শুমারী হয়েছে। তার মধ্যে কোনটায় কয়েক শ' আর শেষবারে মাত্র দুই-আড়াই হাজারে গিয়ে ঠেকেছিল অর্থাৎ সংখ্যায় ছিলেন তাঁরা খুবই সামান্য। কিন্তু উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য, কল্যাণ ও দাওয়াত, কর্ম ও অবদানের হিসাবে সর্বদাই ছিলেন অনেক মূল্যবান। আজও যদি আদম শুমারী করা হয় তাহলে মুসলমানদের সংখ্যা কমই হবে। কিন্তু সেই স্বল্প সংখ্যাকে কি করে অনেক মূল্যবান বানানো যায় সেটাই প্রধান বিষয়। আর এর একমাত্র পথ হলো পবিত্র ইসলামের অনুসরণ।

ইবাদতের মর্ম

কুরআন-হাদীসের পরিভাষা অনুযায়ী ইবাদতের মর্ম খুবই ব্যাপক, যদিও আমরা সামান্য দু'আ, এক-দুই রাকাত নামাযকেই ইবাদত মনে করি। আরবী ভাষার রীতি অনুযায়ী ইবাদতের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার সমস্ত বিধানই এসে পড়ে। আমি প্রায়ই বলে থাকি, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

يايها الذين امنوا ادخلو افى السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان -

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ কর! আর শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না।"

এই আয়াতের মর্মকথা হলো, হে মু'মিনগণ! তোমরা একশ' তে একশ' ভাগ মুসলমান হয়ে যাও! এখানে শতকরা পঞ্চাশ, ষাট কিংবা সত্তর ভাগের কোন অবকাশ নেই। ষাট ভাগ দীনের ওপর চলব— এটা কোন মুসলমানের জন্যেই বৈধ নয়, বরং দীন মানতে হবে এক'শ পার্সেন্ট। ইসলামের আইন ও বিধানে সম্পূর্ণভাবে প্রবেশ করতে হবে। মসজিদে পা রেখে শরীর বাইরে রেখে দিলাম-এতে মসজিদে প্রবেশ করা হবে না। প্রবেশ করতে হবে পুরোপুরি। এমন হলে হবে না, নামায পাঁচ ওয়াক্ত ঠিক আছে। বিশ্বাসও করেন, মানেনও কিন্তু বিবাহ-শাদীর ক্ষেত্রে আর আল্লাহর বিধানের অনুসরণ করেন না, বরং সে ক্ষেত্রে গিয়ে বলেন, এটা তো একান্তই ব্যক্তিগত কিংবা খান্দানী বিষয়? এটা একান্তই সামাজিক বিষয়। এখানেও দীনকে টেনে আনার কী আছে। সর্বত্র যৌতুকের প্রচলন আছে। মানুষ চাচ্ছে, নিচ্ছে। সুতরাং মুসলমানরাও যদি চায় তাহলে তাতে আপত্তির এমন কি আছে? এটা একটা সমাজ, পরিবেশ ও খান্দানী বিষয়। আমি বলি, না, মুসলমানদের জন্য এমনটি করার অবকাশ নেই।

বিশ্বাস, চেতনা, চরিত্র, লেন-দেন, সামাজিক আচার-আচরণ, ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষি খামার থেকে শুরু করে পারস্পরিক সম্পর্ক পর্যন্ত সকল ক্ষেত্রেই আল্লাহর বিধান মেনে চলতে হবে। কারণ এই উম্মতকে আল্লাহ তা'আলা তখনই অনিবার্য ধ্বংস ও পতনের হাত থেকে রক্ষা করেছেন যখন হযরত রাসূলে কারীম (সা) এই দু'আ করেছেন ঃ

اللهم ان تهلك هذه العصابة لاتعبد فى الارض -

"হে আল্লাহ! যদি এই ক্ষুদ্র দলটি ধ্বংস করে দাও তাহলে তোমার ইবাদত করার কেউ থাকবে না।"

হযরত (সা) তো আল্লাহ বিশ্বাস, আল্লাহ'র মহান মর্যাদা, বড়ত্ব ও শক্তির বিশালত্ব সব কিছু সম্পর্কে সম্যক ওয়াকেফ ছিলেন। তারপর তাঁর যবান থেকে এই বাক্যটি বের হয়েছে, যা পাঠ করলে যে কাউকে স্তব্ধ হতে হয়, বিবেক-বুদ্ধি খেয়ে যায়। যদি নির্ভরযোগ্য সীরাত গ্রন্থে ও বিশুদ্ধ হাদীস শরীফে এর প্রমাণ পাওয়া না যেত তাহলে কেউ এই উচ্চারণে সাহস করত না।

আমি বলি, এই উম্মতকে আল্লাহ পাক নির্ঘাত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছেন, জীবনকে দীর্ঘায়িত করেছেন, জীবন যাপনের সমূহ আয়োজনকে সহজ

করে দিয়েছেন। বার বার আসমান থেকে খোদায়ী সাহায্য এসেছে এবং আজও তিনি রক্ষা করে বাঁচিয়ে রাখছেন এই উম্মতকে মূলত এই ইবাদতের জন্যই।

আপনারা হয়তো জানেন না, আমেরিকা ও ইজরাইল মিলে এমন এক যৌথ ও সমন্বিত কর্মসূচি গ্রহণ করেছে যার মূল টার্গেট হলো মুসলিম মিল্লাতকে সমূলে বিনাশ করে দেওয়া। প্রতিটি মুসলিম রাষ্ট্রকে স্পেনে পরিণত করা। মুসলিম মিল্লাতকে আত্মমর্যাদাবোধ, দীনী অনুপ্রেরণা, দীন ও ইসলামের প্রতি প্রেম ও অনুরাগশূন্য করে দেওয়া। ইসলামের প্রতি গর্ববোধ ও অহংকার বোধের চেতনাকে হত্যা করতে তারা বদ্ধপরিকর। তাদের প্ল্যান হলো সকল জনপদকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখা; স্বাধীনতার ভাওতা তুলে নারী সমাজকে পুরো মানবতার বিপক্ষে নিয়ে দাঁড় করানো। এই জঘন্য অন্ধ ও পশু পরিকল্পনার ভেতরও এরপর উম্মাহ বেঁচে আছে, ইনশাআল্লাহ্ বেঁচে থাকবে! কিয়ামত পর্যন্ত বেঁচে থাকবে! বেঁচে থাকবে ইবাদতের জন্য, ইবাদতের প্রতি দাওয়াত দানের জন্য।

মুসলিম উম্মাহর কর্তব্য

আমার ভায়েরা!

মূলত হযরত (সা) আল্লাহর দরবারে দু'আ করেছেন যেন তাঁর ইবাদতের পরম্পরা বজায় রাখার লক্ষ্যে এই উম্মতকে ধ্বংস না করা হয়। আল্লাহ তাঁর প্রিয় হাবীবের এই প্রার্থনাকে মঞ্জুর করেছেন। তাই আজ এই যে আমরা নামায পড়ছি, জুমু'আ পড়ছি, দীনী আলোচনা করছি, বছরে একবার হজ্জ করছি, স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করছি–এ সবই সেই মুনাজাতের ফসল। আর এ সকলের জন্যই আমাদের অস্তিত্ব।

আমরা সকলেই যদি বাদশাহ হয়ে যাই, 'আল্লাহ না করুন' আমরা সকলেই যদি সময়ের হামান, কারুন ও ফেরাউন হয়ে যাই, স্কলার, ইঞ্জিনিয়ার, প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট কিংবা প্রধান মন্ত্রী হয়ে যাই তাহলে এ সকল পদ ও ক্ষমতা কিন্তু আমাদের রক্ষা করতে পারবে না, বরং আল্লাহর দরবারে এসবের কারণে আমরা বেঁচে থাকার অধিকার লাভ করতে পারব না। কারণ রাসূল (সা) তো সেদিন পরিষ্কারই বলে দিয়েছিলেন, খোদা হে! যদি এই ক্ষুদ্র দলটি ধ্বংস করে দাও তা হলে তোমার এই কারখানা যথারীতিই চলবে, কিন্তু তোমার ইবাদত হবে না! তোমার ইবাদতের জন্য চাই এই উম্মত!

মূলত দীনের তাবলীগ ও দাওয়াত শুধু এই কথাগুলোকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্যই এবং উম্মতের প্রধান কর্তব্যও এটাই—নিজে আকণ্ঠ ডুবে থাকবে আল্লাহর ইবাদতে; অনন্তর অন্যকেও ডাকবে আলোকিত এ পথে। আর এটা ছাড়া এই উম্মতের এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকারও কোন অধিকার নেই।

রিপু পূজা নয়, প্রয়োজন আল্লাহর গোলামী

পৃথিবীর মানুষ ডুবে আছে পার্থিব সংকীর্ণতায়। ফ্যাশন, স্বকল্পিত জীবনবোধ, মেকি মর্যাদা, প্রেস্টিজ ও স্ট্যান্ডার্ডবোধ আজ মাবুদে পরিণত হয়েছে। এসব অসার অনুষঙ্গ ছাড়া তারা বাঁচতে পারে না; চলতে পারে না। এসব ফ্যাশনপূজারী আত্মভোলাদেরকে বোঝাতে হবে, জীবনে সত্যিকারের স্বাধীনতা কাকে বলে, জীবনের প্রকৃত স্বাদ কিসে! এই ইউরোপ আমেরিকা যত বড় অর্থের মালিকই হোক না কেন, যত বড় সামরিক শক্তির অধিকারীই হোক না কেন, বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও সংস্কৃতিতে তারা যত সমৃদ্ধই হোক না কেন, তারা প্রকৃতপক্ষে নফস ও রিপুপূজারী! তারা যন্ত্র ও প্রযুক্তির দাস। তারা তাদের হাতে তৈরী ফ্যাশনের এমনভাবে গোলামী করে যেমন কোন ক্রীতদাস তার মালিকের দাসত্ব করে।

সুতরাং, এখন আমাদের মুসলমানদের কর্তব্য হলো, তাদেরকে এই পার্থিব সংকীর্ণ জগৎ ও বিশ্বাসের গোলামী থেকে মুক্ত করে পৃথিবীর বিশাল মুক্ত স্বাধীন ভুবনে নিয়ে আসা! তাদেরকে মুক্ত বিশ্বাস ও বাতাসের সাথে পরিচিত করে তোলা। প্রকৃত স্বাধীনতার রূপ তাদের সামনে তুলে ধরা এবং সংকীর্ণ বিশ্বাস, নফস ও রিপুর গোলামী থেকে মুক্ত করে এক আল্লাহ্‌র গোলামী ও দাসত্বের চিরকল্যাণময় সুতোতে গেঁথে দেওয়া।

আমাদেরকে আজ দৃঢ়ভাবে উপলব্ধি করতে হবে, আমরা যদি কল্যাণ চাই সম্মান চাই, পরকালীন বিজয়, সফলতা ও অসীম নিয়ামত চাই, তাহলে নিজেদেরকে প্রত্যয়সূত্রে গেঁথে রাখতে হবে ইবাদতের সাথে। অধিকন্তু আমরা যেখানেই থাকব, যে অবস্থাতেই থাকব-থাকব এই মহান দীনের দাঈ হিসাবে। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে সেই তাওফীকই দান করুন!

ইউরোপ, আমেরিকা ও ইসরাইল

মুসলিম দেশগুলোর হীনমন্যতা, ইসলামী আইন বাস্তবায়নকারী সংগঠনগুলোর প্রতি বিরূপ মনোভাব ও ভয়ের কারণসমূহ

স্নেহাস্পদ ছাত্রবৃন্দ ও প্রাণপ্রিয় মুসলিম উম্মাহ!

আমি নদওয়াতুল ওলামার একজন নগণ্য খাদেম ও দায়িত্বশীল ব্যক্তি হিসেবে এটা আমার জন্য বড় আনন্দের বিষয়, আলমাহাদুল আলী লিদদাওয়াতি ওয়াল ফিকরিল ইসলামী নামে দ্বীনি দাওয়াতের কাজে সহযোগিতা ও দীনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে একটি প্রতিষ্ঠান তের'শ নিরানব্বই হিজরী হতে আজ পর্যন্ত কাজ করে আসছে। সুতরাং যে সমস্ত নদভী ভর্তি হয়ে আছে তাদের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয় হলো, তারা যেন ইসলাম ও ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতির ব্যাপারে নিজেরা আত্মতৃপ্তি ও আত্মমর্যাদাবোধ করে তারা যেন মানসিকভাবে তার প্রতি পূর্ণ আস্থা রাখে এবং অন্যদেরকেও আস্থাশীল করে তুলতে পারে। তারা যেন যুগের ভয়াবহতা ও চ্যালেঞ্জকে উপলব্ধি করতে পারে, ইউরোপ থেকে আগত যত ষড়যন্ত্র আছে সেগুলোকে ভালভাবে বুঝতে সক্ষম হয়, বিশেষভাবে আমেরিকা-ইসরাইলের ষড়যন্ত্রকে। কারণ এ দু'টি দেশ বুঝতে পেরেছে, তাদের রাজনীতি, তাদের জীবন দর্শন, তাদের বিশ্ব মোড়লীপনাকে অন্য কেউ চ্যালেঞ্জ করতে সক্ষম নয়। মুসলমানদের একাত্মতা ও কার্যকরি পদক্ষেপ ছাড়া অন্য কেউ চ্যালেঞ্জ করতে সক্ষম নয়। এ কঠিন মুহূর্তে এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের আত্মপ্রকাশ নদওয়াতুল ওলামার মৌলিক লক্ষ্য উদ্দেশ্যের একটি কারণ নদওয়াতুল ওলামার প্রতিষ্ঠাতা সাইয়েদ মাওলানা মুহাম্মদ আলী মুমুগীরী (র.)-কে খ্রিস্টান মিশনারীদের সাথে প্রায়শ তর্ক-বিতর্ক ও ওঠা-বসা করতে হতো। ফলে তিনি এসব তর্ক-বিতর্কের সময় উপলব্ধি করতে সক্ষম হন, এখন আমাদের মাদ্রাসার ছাত্র ও ওলামাদেরকে নতুন নতুন বিপদকে উপলব্ধি করা এবং সেগুলোর তুলনামূলক (Comparative study) লেখাপড়া ও গবেষণা করা প্রয়োজন। তাদের কাছে ও আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত যারা সাধারণত চিন্তা-চেতনা জ্ঞান-বিজ্ঞান ও রাজনীতির ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিচ্ছেন শ্রেণীর দিল-দেমাগে ইসলামের ব্যাপারে যে হীনমন্যতা রয়েছে তা বের করে দেওয়ার যোগ্যতা থাকা প্রয়োজন এবং তাদের কাছে ইসলামের চিরন্তন পয়গাম, সর্বযুগের উপযোগী ও সব সময়ের মানুষের প্রয়োজন এবং মানুষের নাজাত ও সফলতা

এবং মানুষের সঠিক মূল্যবোধ জাগ্রত করার একমাত্র শাশ্বত পথ ও পয়গাম এ বিষয়টি সাব্যস্ত করার আত্মবিশ্বাস ও তা উপলব্ধি করার যোগ্যতা থাকা প্রয়োজন। এজন্য এমন দাওয়াতী ও তরবিয়তী প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা সময়ের দাবী, যুগের চাহিদা ও নদওয়াতুল ওলামার প্রতিষ্ঠাতাদের ইচ্ছা ও স্বপ্নের বাস্তবায়ন।

মোট কথা হলো, আল্লাহ্‌র দীন শাশ্বত ও চিরন্তন এ মর্মে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে ঃ ان الدين عند الله الاسلام

"ইসলামই হলো আল্লাহ্‌র কাছে মনোনীত ধর্ম, আর এ চূড়ান্ত ঘোষণা সর্ব যুগের জন্য। এটি বাস্তবসম্মত যে, আল্লাহ্‌'তায়ালার রাজি খুশি এবং পছন্দনীয় ও অপছন্দনীয় বিষয়াদি ও চিরন্তন আল্লাহ্‌'তায়ালার বিধি-বিধানসমূহ এবং এ বিষয়ের শিক্ষা-দীক্ষা ও তার দাবীও চিরন্তন, এসব গায়েবী নিয়ম-নীতিও চিরন্তন এ ছাড়াও হেদায়েতের রাস্তাও হলো চিরন্তন। আর দীন হলো এক শাশ্বত পয়গাম, কিন্তু সময় পরিবর্তনশীল; কারণ সময় যদি পরিবর্তনশীল না হতো তাকে যুগ বা সময় বলা হতো না, সময় কোন স্থীতিশীল বস্তু নয়, বরং যুগ পরিবর্তনশীল, যুগের দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তনশীল এবং তার চাহিদাও পরিবর্তনশীল তার ওপর প্রভাব সৃষ্টিকারী মূলমন্ত্রও পরিবর্তনশীল। এ ছাড়া যতো আন্দোলন আছে সেগুলোও পরিবর্তনশীল। বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন আন্দোলন আত্মপ্রকাশ করেছে এবং এসব আন্দোলন দীনের বিরুদ্ধে মক্ত অবস্থান গ্রহণ করে, দীন ধ্বংসের ষড়যন্ত্র প্লান-প্রোগ্রাম করে নতুন নতুন রাষ্ট্রের আত্মপ্রকাশ ঘটে এবং সে সব রাষ্ট্রের স্বার্থ ও চাহিদাসমূহের পরিবর্তন হতে থাকে। এর মাঝে রাজনৈতিক স্বার্থ যেমন থাকে, তেমনি সামরিক স্বার্থ ও সামাজিক স্বার্থও থাকে। আর এটাও সর্বজনস্বীকৃত বিষয়, যখন কোন রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠিত হয় তখন তার স্বাভাবিক চাহিদা হলো, সে রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার জন্য পরিবেশ সৃষ্টি করা হয় অর্থাৎ যাদেরকে শাসন করা হবে ঐ রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও তারা শাসকশ্রেণী এবং তাদের রাষ্ট্রকে তার সভ্যতা-সংস্কৃতিকে এমন কি তাদের ঘরোয়া পরিবেশকেও আইডিয়াল মডেল ও অনুকরণীয় বস্তু হিসেবে গ্রহণ করবে, এজন্য নতুন নতুন প্রোগ্রাম করা হবে এবং সব সময় করা হয়ে থাকে, বিশেষত এ যুগে এটাকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, ইসলামের বিরুদ্ধে সীমিত আকারে যে সব ষড়যন্ত্র ও পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল তা ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। ইতিহাস অধ্যয়ন করলে একটি বিষয় সুস্পষ্ট হয়, ইসলাম ও মুসলিম বিশ্বের বিরুদ্ধে দু'টি ব্যাপক গভীর ও চূড়ান্ত বিপদ এসেছিল। ফলে এ আশঙ্কা ছিল, ইসলাম বিশ্বব্যাপী পয়গাম এবং রাজনৈতিক শক্তি ও ধর্মীয় স্বাধীনতার ক্ষেত্রে অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়বে, বিশেষ জাতি-গোষ্ঠীর মাঝে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়বে এবং

এদের মাঝেই কার্যকর থাকবে। তবে বিশ্বব্যাপী তার অস্তিত্ব ও কার্যকারিতা নিঃশেষ হয়ে যাবে। প্রথম বিপজ্জনক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল ক্রুসেডদের আক্রমণের কারণে। এ আক্রমণ সংগঠিত হয়েছিল ৫ম শতাব্দী হিজরী মোতাবেক একাদশ খৃষ্টাব্দ। দ্বিতীয় ভয়ংকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল তাতারীদের আক্রমণের কারণে। এ আক্রমণ সংগঠিত হয়েছিল হিজরী সপ্তম শতাব্দী মোতাবেক তের'শ খৃষ্টাব্দে চেংগিস খান ও হালাকু খানের নেতৃত্বে।

ক্রুসেডরা বর্তমান সিরিয়ার ওপর আক্রমণ চালায়। অতঃপর তারা বায়তুল মুকাদ্দাসে ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করে। তাদের মস্তিষ্ক ও প্লান-প্রোগ্রাম মক্কাও মদীনার মত পবিত্র স্থান দখল করার পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাদের বিরুদ্ধে সালাহউদ্দিন আয়ূবীর মত মহাপুরুষকে দাঁড় করান। এখলাছ ও লিল্লাহিয়ত, জিহাদের আত্মোৎসর্গের প্রতি অধিক আগ্রহ, আত্মমর্যাদাবোধ ও ধর্মীয় অনুভূতি, পবিত্রতা ও তাকওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর তুলনা করা সম্ভবপর নয়। তিনি ক্রুসেডারদেরকে পরাজিত করে মুসলমানদেরকে তার পতাকাতলে সমবেত করতে সক্ষম হন। ফলে তৎকালীন যুগের ভয়ংকর ফেৎনা থেকে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহ্ মুক্তি লাভ করে।

এখানে যে বিষয়টি স্মরণ রাখা প্রয়োজন, তা হলো, যে সময় ক্রুসেডার ও ইউরোপ মুসলিম উম্মাহ্র ওপর চূড়ান্ত আঘাত করে তখন তারা সভ্যতা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বর্তমান যুগের মত এত উন্নতি-অগ্রগতি অর্জন করতে সক্ষম হয় নি। সাইন্স ও টেকনোলোজির এত উন্নতি ও বিস্তৃতি লাভ করেনি। তাদের সামনে দুনিয়াকে নতুন রূপে ঢেলে সাজানো ও চিন্তা-চেতনা সভ্যতা-সংস্কৃতির আগ্রাসনমূলকে চিত্র ছিল না যা পরবর্তীতে পশ্চিমা বিশ্বের দ্বি-বিজয়ী মনোভাব ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সামনে ফুটে উঠেছিল। অতঃপর তারা এসব বিষয়বস্তুকে তাদের প্রোগ্রামের সাথে সম্পৃক্ত করেছে। মুসলিম বিশ্বের ওপর ক্রুসেডারদের তৎকালীন আক্রমণ ছিল সামরিক শক্তির বহিঃপ্রকাশ এবং পবিত্র এলাকাসমূহকে দখল করার অপপ্রয়াস ও অসৎ হিম্মত মাত্র। তাই ঐ আক্রমণগুলো বর্তমানের ভয়াবহতার থেকে কম ভয়ংকর ছিল। কারণ কয়েক শতাব্দী ধরে ইউরোপ ও আমেরিকা জ্ঞান-বিজ্ঞান, সভ্যতা-সংস্কৃতির রাজনীতি ও অর্থনৈতিক অঙ্গনে যে কতৃত্বের প্রতিষ্ঠা করেছে এবং প্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলো ইউরোপ ও আমেরিকার গোলামে পরিণত হয়ে যাওয়া এবং তাদের সার্বিক বশ্যতা স্বীকার করার কারণে যে ভয়ংকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে তা মুসলিম উম্মাহ্র জন্য অত্যন্ত ভয়ংকর অধ্যায় বলে বিবেচিত হচ্ছে।

"কুর্ক-এর বাদশা রেজনাল্ড মক্কা ও মদীনার মত পবিত্র ভূমির ওপর আক্রমণ [illegible] ব্যক্ত করেছিল। কিন্তু তা বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হয় নি। কারণ সে

সময় লেনপোল-এর ভাষায় ঃ ইমাদুদ্দীন জঙ্গী সে বিপদ জয় করার জন্য ময়দানে আসার সংকল্প ব্যক্ত করেন। তবে তার স্বপ্ন বাস্তবায়ন করেন তদীয় পুত্র ন্যায়পরায়ণ বাদশা নূরুদ্দীন জঙ্গী। আর এ ক্ষেত্রে পূর্ণ সফলতা অর্জন করেন। নূরুদ্দীন জঙ্গীর সামরিক প্রধান সুলতান সালাহউদ্দিন আয়ূবী। তখন তিনি মিশরের রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তিনি বায়তুল মুকাদ্দাসকে ক্রুসেডারদের হাত থেকে মুক্ত করতে সক্ষম হন। তখন তাঁর ওপর জিহাদের আবেগ, ধর্মীয় অনুভূতি ও ইসলামী আত্মমর্যাদাবোধের ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ছিল। তিনি হিজরী পাঁচ শ' তিরাশী মোতাবেক এগার 'শ সাতাশি খ্রিস্টাবে হিত্তীনের যুদ্ধে বায়তুল মুকাদ্দাসের ওপর পূর্ণ বিজয় লাভ করেন এবং ক্রুসেডারদের হিম্মত ও সংকল্প ভেঙ্গে দিতে সক্ষম হন। হিত্তীনের যুদ্ধের পর বায়তুল মুকাদ্দাস মুসলমানদের হাতে ফিরে আসে এবং ক্রুসেডারদের প্লান ও প্রোগ্রাম ধ্বংস ও অকেজো হয়ে যায় এবং তাদের মনোবল ভেঙ্গে পড়ে। ফলে তারা আর মাঠে নামার দুঃসাহস করে নি। সুলতান সালাহউদ্দিন আয়ূবী আঠাশে সফর পাঁচ শত উননব্বই হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

তাতারীদের আক্রমণ যদিও একটি সামরিক অভিযান ছিল, কিন্তু অভিজ্ঞতার আলোকে বলতে হয়, কোন সফল আক্রমণ ও সামরিক বিজয়ের প্রভাব শুধুমাত্র সেনাবাহিনীর মাঝে সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং তাদের কর্মপন্থা, চিন্তা-চেতনা আকিদা-বিশ্বাস ও তাদের সামাজিক রীতিনীতির প্রভাব বিজিত এলাকাতেও পড়ে। কিন্তু তাতারীদের সামরিক সফলতার কারণে যে বিপদ দেখা দিয়েছিল তাহলো মুসলমানরা গোলামে পরিণত হবে, আর তাতারীরা বড় বড় লোমহর্ষক ঘটনা ঘটাবে। কখনো তারা দজলা নদীর পানিকে রক্তে রঙিন করেছিল। কারণ তারা মুসলমানদেরকে গণহারে শহীদ করেছিল। অতঃপর তাদেরকে দজলা নদীতে নিক্ষেপ করেছিল। ফলে মুসলমানদের রক্তাক্ত লাশের কারণে দজলা নদীর পানি রঙিন হয়ে গিয়েছিল, আবার কখনো দজলার পানিকে কালো করে ফেলেছিল। কারণ তখন বাগদাদে অসংখ্য বড় বড় গ্রন্থশালা ছিল তাতে সংরক্ষিত বই-পুস্তকগুলোকে দজলার পানিতে নিক্ষেপ করেছিল। ফলে দজলার পানি কালো হয়ে গিয়েছিল, মুসলিম শহীদদের মাথা কেটে সুউচ্চ মিনার নির্মাণ করা হতো, আর সেমিনার দূর-দূরান্ত হতে দৃষ্টিগোচর হতো। এক মাথার ওপর আরেক মাথা রাখা হতো, তবে একটি মাথার ওপর এ শুধু একটি রাখা হতো না; কারণ এভাবে রাখা সম্ভব নয়। তাই তারা অসংখ্য মাথা দিয়ে প্রথমে একটি স্তূপ তৈরি করত। অতঃপর; যেন স্তূপের ওপর আরেকটি স্তূপ রাখা হতো। এভাবে এক পর্যায়ে এত উঁচু করা হতো, যা অনেক দূর থেকে নজরে পড়ত। তাদের আক্রমণের এমন

ভয়ানক অবস্থা ছিল যে, তাদের ব্যাপারে ইতিহাসের পাতায় একটি সাধারণ উক্তি রয়ে গেছে ঃ لك ان التر انهزموا فلاتصدق

অর্থাৎ, সব কথায় তুমি মানতে পার, কিন্তু যদি বলা হয়, তাতারিরা কোন যুদ্ধে পরাজয় বরণ করেছে তা তুমি বিশ্বাস করো না।

কিন্তু আবার তাতারিদের আক্রমণের মাঝে একটি বিশেষ দিক ছিল। আর তা হলো তাদের কাছে কোন সভ্যতা (CULTURE)-সংস্কৃতি ছিল না, আর না কোন দাওয়াত ও পয়গাম ছিল এবং তাদের কাছে কোন সুষ্ঠ আক্বিদা বিশ্বাস ছিল না। তাই বলতে বাধ্য যে, তাদের আক্রমণ সফলতার মুখও যদি দেখত তবুও তা দীর্ঘ স্থায়িত হতো না। কিন্তু আল্লাহ্তায়ালা তাদের ব্যাপারে বিশেষ রহমত কুদরত ও নিয়মবহির্ভূত একটি ব্যবস্থা নেন। ফলে একজন আলেম ও বিজ্ঞ ধর্ম প্রচারক তাদের কাছে পৌছতে সক্ষম হন। অতঃপর তিনি তাদের কাছে ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতি ও ইসলামী বিধি-বিধান সম্পর্কে পরিচয় তুলে ধরেন। ফলে তাদের জীবনে, তাদের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতা-সংস্কৃতিতে, দাওয়াত ও পয়গামের মাঝে যে শূন্যতা ছিল ইসলাম সে শূন্যতা পূরণ করতে সক্ষম হয়। এটি একটি স্বাভাবিক ও সৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্য যে, এমন জয় ও সংগ্রামের মাঝে কোন শূন্যতা দীর্ঘদিন থাকে না। বিজ্ঞ লোক মাত্রই জানেন যে, আল্লাহ্ নিয়ম হলো, শূন্যতা পূর্ণ করে দেওয়া। তাদের কাছে আইন-শৃঙ্খলার শূন্যতা ছিল, সভ্যতা-সংস্কৃতির শূন্যতা ছিল আর ছিল শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞানের শূন্যতা ছিল। ফলে তাদের কাছে দুনিয়ার জন্য কোন পয়গাম ছিল এ শূন্যতাকে মুসলমানদের চিন্তাশীল ও দুধর্ষ ব্যক্তিরা কাজে লাগাতে সক্ষম হন। তারা তাতারীদেরকে একদিকে যেমন ইসলামের দা'ওয়াত দেন, অন্যদিকে তাদেরকে এ কথা বুঝতে সক্ষম হন যে, তাদের কাছে যে শূন্যতা রয়ে গেছে তা পূর্ণ করার ব্যবস্থাপনা আমাদের কাছে রয়েছে। সামাজিক নিয়ম-নীতি ও দুনিয়ার সর্বসাধারণের জন্য দা'ওয়াত ও পয়গাম রয়েছে। এক্ষেত্রে আহলে দিল, মুখলেছ ও আল্লাহওয়ালাদের বড় ভূমিকা রয়েছে। এ ব্যাপারে একটি ঘটনা বারবার বলে থাকি। ঘটনাটি অত্যন্ত কার্যকরী, তাই এখানে উল্লেখ করছি—

ঐতিহাসিক আরনাল্ড তার প্রিসিচং অফ ইসলাম (PREACHING OF ISLAM) নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেন, ইরান তুর্কিস্থানের দিকে তাতারিদের যে অংশে কৃতিত্ব নিয়েছিল সেখানে তাতারিদের শতভাগ মুসলমান হয়ে যাওয়ার পেছনে একটি ঘটনা ঘটেছিল। ঘটনাটি হলো ঃ ভবিষ্যত বাদশা তুঘলক তাইমুর একদিন শিকারে বের হয়েছিলো। আর আপনারাও জানেন, আমিও এমন ঘটনার সম্মুখীন হয়েছি, কারণ আমি বন্দুক চালানোর প্রশিক্ষণ নিয়েছি এবং শিকার

করেছি। শিকারীদের সফলতা ও ব্যর্থতার কিছু নিয়ম-নীতি আছে, যেমন শিকার করতে যাওয়ার পথে যদি কেউ বলে, চাকু আছে, তাহলে শিকার পাওয়ার সম্ভব নয়। কারণ তাই এমন মুহূর্তে চাকুরী কথা উল্লেখ করা অনুচিত। ঠিক তদ্রূপ তাতারিদের কাছে ইরান ও ইরানীদেরকে কুলক্ষণ বলে মনে করত। এ রকম কোন বিশেষ জাতিগোষ্ঠীর ব্যাপারে সর্বদা এরূপ ধারণা রাখা হয়ে থাকে। তাই 'তুঘলক তায়মুর ' শিকারে যাওয়ার পূর্বে সমস্ত ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করেছিল যেন কোন ইরানী তার সামনে না পড়ে। বিভিন্ন জাগাতে পাহারাদার নিযুক্ত করেছিলেন। সমুদ্র উপকূলগুলো ও শহরের প্রবেশদ্বারগুলোতে চৌকিদার নিযুক্ত করে রেখেছিলেন। যেন কোন ইরানী সামনে না পড়ে। কিন্তু আল্লাহ্ 'তায়ালার ইচ্ছা ছিল ভিন্ন। আল্লাহ্ 'তায়ালা তাতারীদের মত যুদ্ধরাজ শক্তিশালী ও অদম্য সাহসী জাতিকে ইসলামের মাধ্যমে মর্যাদা দান করে ইসলামের হিফাজতের জন্য তাদেরকে মঞ্জুর করেছিলেন, আর এটা ছিল আল্লাহ্ 'তায়ালার বিশেষ কুদরতী ব্যবস্থাপনা। শায়খ জামাল উদ্দীন ইরানের একজন বিশিষ্ট আহলে ছিল ব্যতীত দরদী বুজর্গ ছিলেন, তিনি কোন কাজে কোথাও রওয়ানা দিয়েছিলেন, কিন্তু যাওয়ার পথ একাই ছিল, যখন তিনি এ পথ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, ঘটনাক্রমে সেখানে কোন পাহারাদার ছিল না। একেই বলা হয় গায়েবী ব্যবস্থাপনা! ফলে তিনি সামনে চলতে লাগলেন বেশ কিছু দূর অতিক্রম করার পর একজন পাহারাদার তাঁকে দেখে তাঁকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে তুঘলক তাইমুরের সামনে উপস্থিত করল। তিনি তাঁকে দেখেই অগ্নিশর্মা হয়ে গেলেন এবং বুঝে ফেলেন যে, তাঁর শিকারের সকল ব্যবস্থাপনা ভেস্তে গেছে। এখন আর শিকার পাওয়া সম্ভব নয়। ফলে তিনি ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে বলে উঠলেন, তোমরা ইরানিরা উত্তম নাকি এই কুকুর উত্তম?

ঐতিহাসিক আরনল্ড পরবর্তী ঘটনাটি এভাবে বর্ণনা করেন, শেখ জামাল উদ্দীন ইরানী প্রশ্নের উত্তরে বলেন ঃ আল্লাহ্ তায়ালা তাঁকে ও তাঁর জাতি ইরানিদেরকে ইসলামের মত মহাসম্পদকে দান না করতেন তাহলে এ কুকুরই শ্রেষ্টতর বলে বিবেচিত হতো, কিন্তু যখন আল্লাহ্ 'তাআলা আমাদেরকে ইসলাম দান করেছেন তখন আমরাই শ্রেষ্ঠতম।

এ কথা শ্রবণ করে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ ইসলাম কি? শেখ জামাল উদ্দীন একজন আধ্যাত্মিক সাধক ও ধর্মীয় পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। ফলে তিনি তাঁর প্রশ্নের উত্তরে অত্যন্ত সংক্ষেপে ও মর্মস্পর্শী ভাষায় ইসলামের মৌলিক পরিচয় তুলে ধরেন। এতে তুঘলুক তাইমুর অত্যন্ত প্রভাবিত হন এবং তাঁর দিল ও দেমাগে এর প্রভাব পড়ে। ফলে তিনি বলেন ঃ যদি আমি এই সময় মুসলমান হওয়ার ঘোষণা দেই তাহলে তেমন ফায়দা হবে না। তবে যখন আমার মাথায়

রাজকীয় মুকুট পুরানো হবে এবং আমি রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হব তখন তুমি আমার সাথে সাক্ষাত করবে। আমি তখন ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেব।

এ ছিল ঐতিহাসিক আরনাল্ডএর বক্তব্য। কিন্তু তুর্কী ও ফার্সী ভাষায় রচিত মূল (ORIGINAL) গ্রন্থে এ ঘটনার যে বিবরণ আছে তা অধিক আকর্ষণীয় ও গুরুত্বের দাবীদার। সে সব মূল নথিপত্রের বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

তুঘলক তাইমুর শেখ জামালউদ্দীন ইরানীকে জিজ্ঞাসা করলেন আপনি উত্তম নাকি এ কুকুর শ্রেষ্ঠ? উত্তরে তিনি বলেন ঃ এখনো চূড়ান্ত কিছু বলার সময় হয়নি। তাইমুর বললেন ঃ এর মানে? কুকুর তো এখানের রয়েছে, আপনিও এখানে উপস্থিত! আপনি বলতে পারেন ঃ হয়তো কুকুর উত্তম অথবা আমি। উত্তরে শেখ জামাল উদ্দীন বলেন ঃ যদি আমি দুনিয়া থেকে কলেমা পড়ে বিদায় নিতে পারি, ঈমানের সাথে আমার মৃত্যু হয়, তাহলে আমি শ্রেষ্ঠ। আর যদি তা না হয় তাহলে কুকুরই শ্রেষ্ঠ। শাইখের এই উত্তর তাঁর দিল ও দেমাগে নাড়া দেয়। অতঃপর তিনি বলেন, যখন আপনি আমার রাজকীয় মুকুট পরিধানের খবর শুনবেন তখন আমার সাথে সাক্ষাত করবেন। শাইখ জামাল উদ্দীন (র) সেখান থেকে আসার পরদিন থেকে তারিখ গণনা করতে লাগলেন এবং অধীর আগ্রহে তা রাজমুকুট পরিধানের অপেক্ষা করতে লাগলেন, কিন্তু তাঁর আয়ু যখন শেষ হয়ে আসল তখন তিনি ছেলেকে ডেকে বললেন ঃ প্রিয় বৎস! সম্ভবত এ সৌভাগ্য তোমার জন্য নির্ধারিত হয়ে রয়েছে। তাই তুমি যখন তুঘলক তাইমুর-এর রাজমুকুট পরিধানের খবর শুনবে তখন তুমি তার সাথে সাক্ষাত করে আমার ঘটনা স্মরণ করিয়ে দেবে।

সুতরাং শেখ জামাল উদ্দিন (র)-এর পুত্র যখন তুঘলক তাইমুরের রাজমুকুট পরিধানের খবর শুনলেন, তখন তিনি ঘর থেকে বের হয়ে সোজা শাহী মহলের সামনে এসে উপস্থিত হলেন। অতঃপর সেখানে তিনি জায়নামায বিছিয়ে বসে রইলেন। কারণ এ আগন্তুককে কে বা ভেতরে ঢুকতে দেবে? এবং তথায় আজান দিয়ে নামাজ পড়তে লাগলেন। গভীর রাতের পূর্বে দেয়া আযানের শব্দ তো শাহী মহলে পৌছতে পারেনি! কিন্তু ফযরের আযান ধ্বনি শাহী মহলে পৌছে গেল। তুঘলক তাইমুর এ আওয়াজ শুনে বললেন ঃ এ অদ্ভুত আওয়াজ কোথা হতে আসছে? এ অসময়ে কে চিল্লাচিল্লি করে আমার ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে? তাকে বলা হলো, এক ব্যক্তি এসে ওঠাবসা করে আর এভাবে চিৎকার করে একথা শ্রবণ করে বাদশাহ হুকুম দিলেন, যাও, তাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে এসো! লোকেরা তাঁকে গ্রেপ্তার করে বাদশাহর সামনে উপস্থিত করল। তখন শায়খের পুত্র তাঁর সামনে নিজের পরিচয় তুলে ধরে বললেন, আমি ঐ শায়খের পুত্র যিনি আপনার

সাথে মিলিত হলে আপনি তাকে প্রশ্ন করেছিলেনঃ এ কুকুর উত্তম না কি আপনি উত্তম? উত্তরে তিনি বলেছিলেন, যদি আমার মৃত্যু ঈমানের সাথে হয় তাহলে আমি উত্তম আর যদি তা না হয় তাহলে এ কুকুর উত্তম। এখন আমি আপনার কাছে এ সংবাদ দিতে এসেছি যে, তাঁর মৃত্যু ঈমানের সাথে হয়েছে এবং কালেমা পড়তে পড়তে তিনি দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। এ খবর শ্রবণ করে তুঘলক তাইমুর কালেমায়ে শাহাদাত পড়েন এবং নিজে ইসলাম গ্রহণ করার ঘোষণা প্রদান করেন। অতঃপর প্রধান মন্ত্রীকে ডাকলেন। প্রধান মন্ত্রী বাদশাহ্র ইসলাম গ্রহণের কথা শ্রবণ করে বলেন, আমি তো অনেক আগেই মুসলমান হয়েছি! আমি যখন ইরাঁনে গিয়েছিলাম সেখানে ইসলাম কবুল করেছিলাম, প্রকাশ করতে সাহস করিনি। এরপর ইরাক অঞ্চলে অবস্থিত তাতারীদের সকল গোষ্ঠী মুসলমান হয়ে যায়। অতঃপর অন্যান্য গোত্রের মাঝেও ধীরে ধীরে ইসলামের প্রচার ও প্রসার ঘটে।

একজন বিজ্ঞ ইতিহাসবিদ বলেন, দু'টি জাতি শতকরা একশ ভাগ মুসলমান হয়ে যায়। একটি হলো আরব জাতিগোষ্ঠী আর অপরটি হলো তুর্কি জাতিগোষ্ঠী এরা সকলেই এক শত ভাগ মুসলমান হয়ে যায়। তাই প্রয়োজন হলো প্রতিটি যুগের এবং দায়ী ও যাদেরকে দাওয়াত দেওয়া হচ্ছে তাদের মানষিকতা উপলব্ধি করা। অতঃপর হেকমতের সাথে তাদেরকে দাওয়াত দেওয়া। এ বিষয়টির প্রতি পবিত্র কুরআনেও গুরত্বারোপ করা হয়েছে। সুতরাং ইরশাদ হচ্ছে ঃ

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ -

"আপনি আপনার রবের পথে জ্ঞানের কথা ও উত্তম নছীয়তের মাধ্যমে আহ্বান করুন, এবং তাদের সাথে সুন্দরভাবে আলোচনা করুন।"

[সূরা নাহল -১২৫]

কিন্তু বর্তমান যুগের সর্ববৃহৎ ফেতনা বড় চ্যালেঞ্জ ও ভয়ানক বিষয় হলো (এটা যে), সারা ইউরোপ খ্রীষ্টান জগত ও তাদের সাথে ইহুদীদের বিশেষ দল ইউরোপের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সম্মিলিত প্রচেষ্টা চালাচ্ছে যেন গোটা ইসলামী বিশ্বে ধর্মীয় অনুভূতি ও মূল্যবোধ শেষ হয়ে যায়। দীনের সাথে সম্পৃক্ততা নিয়ে অহংকার বোধ করার মানসিকতা শেষ হয়ে যায়। দীনের মূল উৎস ঈমান যেন শেষ হয়ে যায় এবং সে স্থানে হীনমন্যতা (INFERIORITY COMPLEX) সৃষ্টি হয়।

দারুল মুছান্নিফীনে অনুষ্ঠিত প্রাচ্যবাদ ও প্রাচ্যবিদ শীর্ষক যে সেমিনার (SEMINAR) অনুষ্ঠিত হয়েছিল, যেখানে আমি উল্লেখ করেছিলাম পশ্চিম বিশ্ব

তাদের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দ্বারা সঠিক বিষয়টি উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিল, কোন দেশকে সামগ্রিকভাবে পরাধীন করে রাখার জন্য শুধু সামরিক শক্তি, রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনা ও কন্ট্রোল এবং অত্যাধুনিক অস্ত্র-স্বস্ত্র ও যুদ্ধনীতি যথেষ্ট নয়, বরং এজন্য প্রয়োজন হলো সেখানকার আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত জনগোষ্ঠীকে (INTELECTUAL CLASS) রাষ্ট্রীয় শক্তির ব্যবস্থাপনায় মানসিকভাবে প্রভাবিত করে তোলা। এজন্য তারা প্রাচ্যবিদদেরকে (ORIENTALLIST) প্রস্তুত করেছে। কিন্তু এ বিষয়টি খুব কম সংখ্যক লোকেই উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছে। কারণ তারা শুধু গবেষণার প্রতি প্রবল আগ্রহের কারণে গবেষণামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে না। কেননা গবেষণার আগ্রহ সীমিত পরিসরে হয়ে থাকে, কিন্তু প্রাচ্যবিদের পেছনে রাজনৈতিক ও সাম্রাজ্যবাদী লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও দিকনির্দেশনা কাজ করে থাকে। আর এটাই হলো এ যুগের সবচেয়ে বড় বিপদ। তাই এ বিপদের উৎস ও তার অস্ত্রশস্ত্র ও এগুলোর ব্যবহারকারীদের সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান রাখা অত্যন্ত প্রয়োজন।

ইউরোপ ও আমেরিকাতে প্রাচ্যবিদদের এক বিরাট সৈন্যদল ছিল এবং তাদেরকে সব ধরনের সহযোগিতা করা হতো। ফলে তারা তাদের পূর্ণ মেধাকে এমন সব গ্রন্থ রচনা করার ক্ষেত্রে ব্যয় করেছে, যেগুলোতে স্পষ্টভাবে ইসলামের বিরুদ্ধে কোন আঘাত করা হয়নি। তাদের মেধা ও চিন্তা হলো ভাবনার বিষয় কারণ তারা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিল, যদি সরাসরি ইসলামের বিরুদ্ধে আক্রমণ করা হয় তাহলে একটি শক্তিশালী প্রতিপক্ষ তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যাবে। তাই তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল, চতুরতার সাথে তার মাঝে এমন সব যুক্তি ও প্রমাণ উপস্থাপন করা হবে, যেগুলো মানুষ পড়ার সাথে সাথে আল্লাহ্‌র কালাম পবিত্র কুরআন, হাদীস শরীফ, ইসলামী ফেকাহশাস্ত্র, তর্কশাস্ত্র, সর্বোপরি ইসলামী সভ্যতা, সংস্কৃতির প্রতি আস্থা উঠে যাবে এবং হীনমন্যতার শিকার হবে। যে ব্যক্তিই তাদের রচিত কিতাবসমূহ পড়বে, তার অনুভূতি এমন হবে যে, আমরা তো অত্যন্ত নিম্নমানের জীবন যাপন করছি। আমাদের উলামায়ে কেরাম, আমাদের পণ্ডিতগণ, আমাদের লেখক ও গবেষকগণ এসব ত্রুটিগুলোর প্রতি ভ্রূক্ষেপ করেন নি। তারা অনেক দেরীতে হাদীসের সংকলনের কাজ শুরু করেছিল। অনেক দেরিতে ইসলামী আইন-প্রণয়ন করেছিল। এ বিষয়গুলোই ঐ প্রাচ্যবিদরাই জনসমাজকে অবগত করেছে, অথচ এ সব কাজ দেরীতে হওয়ার পেছনেও আল্লাহ্‌র হিকমত ছিল, উদাহরণস্বরূপ, হাদীস সংকলনের কাজ যখন শুরু হয় তখন আল্লাহ্‌র সাহায্যের ব্যাপারটি স্পষ্টভাবে বুঝে আসে, বরং এটাকে একটি আসমানী মুজেযা বলা যেতে পারে। কারণ এ কাজের দায়িত্বভার বুখারা ও তুর্কিস্থানের এমন তীক্ষ্ণমেধার অধিকারী এবং এমন মুখস্থ শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিবৃন্দ

গ্রহণ করেছিলেন যাদের তুলনা অনেক দূর-দূরান্ত পর্যন্ত পাওয়া যায়নি এবং সুদীর্ঘ সময় পর্যন্ত ইতিহাসের পাতায় এমন মানুষের সন্ধান মেলে নি। একথার প্রমাণস্বরূপ একটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে। ইমাম বুখারী (র)-এর জীবনী গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে।

"ইমাম বুখারী যখন বাগদাদে আগমন করলেন তখন সেখানকার উলামায়ে কেরাম তাঁর পরীক্ষার এ পন্থা অবলম্বন করলেন, এক শত হাদীসের সনদ (বর্ণনাকারী) মতন (মূল বক্তব্য) উলট-পালট করে একটির সনদ অন্যটির মতন, অতঃপর একটির মতন অন্যটির সনদ এভাবে তাঁর সামনে উপস্থাপন করা হবে। এ কাজের জন্য দশজন ব্যক্তিকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল যেন একজন দশটি হাদীস তাঁর সামনে উপস্থাপন করার পর অন্যজন দশটি উপস্থাপন করে। সুতরাং তিনি যখন মজলিসে উপস্থিত হলেন তখন প্রথমজন দশটি হাদীস তাঁর সামনে উপস্থাপন করে তাঁর মতামত জানতে চাইলেন তখন তিনি উত্তরে বললেন ঃ এ সব হাদীস আমার জানা নেই। এ কথার মর্ম তো প্রশ্নকারীরা বুঝতে সক্ষম হয়েছিল, কিন্তু সর্বসাধারণ তার মর্ম না বুঝে হাসতে লাগল। এভাবে প্রত্যেকেই তাঁদের দশটি করে হাদীস উপস্থাপন করেন আর তিনি জানা নেই বলে উত্তর দিতে থাকেন। অতঃপর যখন সকলের উপস্থাপন শেষ হলো, তখন তিনি প্রত্যেককে লক্ষ্য করে বলেন, "আপনি যে দশটি হাদীস উপস্থাপন করেছিলেন তার মতন এমন ও সনদ এরূপ। এভাবে তিনি প্রত্যেকের সনদ ও মতন ঠিক করে দিলেন। আর যে মতনের যে সনদ ও যে সনদের যে মতন তা বর্ণনা করে দিলেন। তার এ দূরদর্শিতা, বিচক্ষণতা, উপস্থিত বুদ্ধি ও তীক্ষ্ণ শক্তি দেখে মানুষ নির্বাক হয়ে রইল।

এভাবে যখন ফিকাহ্শাস্ত্রের সংকলনের কাজ শুরু হলো তখন আল্লাহ্ তায়ালা চার মহান ইমাম ও তাঁদের উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ও অতুলনীয় ছাত্রবৃন্দ এবং তাঁদের স্থলাভিষিক্ত মুজতাহিদবৃন্দের আকৃতিতে আল্লাহ্ তায়ালা এমন একটি দল সৃষ্টি করে তাঁদের এ কাজের তৌফিক দিলেন, দুনিয়ার সংবিধান রচনাকারী ও আইনপ্রণেতা ও জাগতিক সমস্যা সমাধানকারীদের মাঝে তাঁদের নমুনা মেলা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার।

আবার যখন ইসলামী রাষ্ট্রসমূহে, বিশেষত তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের রাজধানী বাগদাদে গ্রীক দর্শনের আবির্ভাব ঘটল এবং তা জ্ঞানী ও চিন্তাশীল মানুষের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে লাগল। তাদের ওপর নিজের জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব ও সূক্ষ্মদর্শিতার শিকড় বিস্তার করতে লাগল এবং তার কারণে স্বল্প জ্ঞানীদের আকীদা বিশ্বাস নড়বড়ে হতে লাগল, তখন হযরত আবুল হাসান আশ-আরী ইমাম আবুল মানছুর মাতুরুদী, ইমাম গাজ্জালী ও ইমাম ইবনে তাইমিয়ার মত

মহান ব্যক্তিবর্গকে সৃষ্টি করলেন। তাঁরা এসে গ্রীক দর্শনের প্রভাব ও বলয় থেকে মুসলিম উম্মাহকে নাজাত দিলেন এবং গ্রীক দর্শনের দুর্বলতাগুলো মানুষের সামনে তুলে ধরলেন। আবার যখন বাতিল আকিদা-বিশ্বাস, জাহেলী রীতিনীতি, শিরক ও বিদ'আত ও ভ্রান্ত আচার-আচরণ মুসলিম উম্মাহর মাঝে প্রবেশ করল, তখন আল্লাহ্ তায়ালা প্রতিটি যুগে ও প্রতিটি দেশে ঐসব আকীদা-বিশ্বাস ও রীতিনীতি দূর করে সেখানে সঠিক আকিদা বিশ্বাস সমুন্নত, শরীয়তকে জিন্দাহ্ ও বিস্তার করার লক্ষ্যে আল্লাহ্ তায়ালা মুজাদ্দিদ ও মুখলিছ দাঈ মহামনীষীদেরকে প্রেরণ করলেন। তাঁরা প্রথম যুগের জাহেলী ধ্যান-ধারণা দাওয়াত ও পয়গাম ও দীনকে বিকৃত করার ষড়যন্ত্র ধূলিসাৎ করে দুনিয়াতে আবার দীনের সঠিক ধ্যান-ধারণার প্রচার ও প্রসার ঘটালেন।

প্রাচ্যবিদ ও তাদের গবেষণা প্রপাগাণ্ডা ও পরিশ্রম বিশ্বের সম্রাজ্যবাদ নীতির (WESTERN IMPERIALISM) জন্য অত্যন্ত সহায়ক হয়েছিল। এর একটি প্রমাণ হলো যখন পশ্চিমা সম্রাজ্যবাদীরা প্রাচ্যের ইসলামী দেশগুলো হতে চলে যেতে বাধ্য হলো অথবা যেখানে তাদের কর্মতৎপরতা অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ল সে সময় প্রাচ্যবাদীদের কর্মকাণ্ড দুর্বল হয়ে পড়ল। এটাকে স্বাভাবিক ঘটনা বা সাংবাদিকতার অধঃপতন বলা যায় না। রেডিও অথবা ঐসব গণমাধ্যম কে যার মাধ্যমে নিজেদের চিন্তা-চেতনা অন্যের কাঁধে চাপানো যায়। এগুলোর অধঃপতন বলা যায় না, বরং এসব গণমাধ্যমের প্রতিদিন অগ্রগতি এ বিস্তৃতি সাধিত হচ্ছে।

কিন্তু এর পরেও আমরা দেখতে পাই প্রাচ্যবিদদের কর্মতৎপরতা একেবারে কমে গেছে। বর্তমানে যদি কখনো তাদের কোন কিতাব ছেপে আসে তাহলে এ কিতাবের মাঝে পূর্বের মত শক্তি ও শক্ত দলিল-প্রমাণ থাকে না। কারণ প্রাচ্যবিদদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ছিল শুধু ইসলামী বিশ্বের জ্ঞানী-গুণী ও ধর্মীয় ব্যক্তিদের আকিদাবিশ্বাসকে দুর্বল ও নড়বড়ে করে দেওয়া। এদের অন্তরে স্বধর্ম ও ইতিহাস, সীরাতুন্নবী, কোরান, ইসলামী ফিকাহ্-তর্কশাস্ত্র ও ইসলামী সভ্যতা ও সাংস্কৃতির ব্যাপারে মানুষের আস্থাকে দুর্বল ও নড়বড়ে করে দেওয়া। বর্তমান যুগের বড় ফেতনা হলো, আমাদের নওজওয়ান ও আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত যুবক শ্রেণীর মাঝে হীনমন্যতা সৃষ্টি হচ্ছে। কারণ তারা যে সমস্ত বই-পুস্তক পড়াশোনা করে তার অধিকাংশ ফ্রান্স বা ইংরেজী ভাষায় রচিত। আমাদের উপমহাদেশে যদিও এর প্রচলন কম কিন্তু যেসব দেশ ফ্রান্সের অধীনে রয়েছে, যেমন আফ্রিকা-মহাদেশের পশ্চিম ও উত্তর এলাকাগুলো, মরক্কো আল-জিরিয়া, লিবিয়া ও ত্রিপালী এসব এলাকাতে ফ্রেঞ্চ-ভাষায় রচিত লিটারেচার ও সাহিত্য পড়ানো হয়, এছাড়া অন্যান্য দেশে ইংরেজী ভাষায় রচিত লিটেরাচার সাহিত্য পড়া না হয়, আর ঐসব বিষক্রিয়া এগুলোর ভেতরে রয়ে গেছে।

এ থেকেও বড় ভয়ানক চিন্তা ও পেরেশানীর বিষয় হলো বর্তমান আরব বিশ্ব আমেরিকা ও ইসরাইলের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছে এবং তাদের আক্রমণ অনেক অংশে সফল হয়েছে। কারণ সেখানের শিক্ষিত শ্রেণী যারা সাধারণত দেশের কর্মকর্তা হয়ে থাকে। হীনমন্যতার শিকার হয়েছে, তারা ইসলামের ভবিষ্যত নিয়ে হতাশায় ভুগছে। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে আল-জিরিয়া ও মিশর অগ্রগামী ভূমিকা পালন করছে, সেখানের নেতৃবৃন্দ ও সরকার দীন দাওয়াত ও দীনি আন্দোলনকে অত্যধিক ভয় করে। সেখানের মূল সংঘর্ষ এখন দীনি জাগরণমূলক আন্দোলন ও দাওয়াতের সাথে হয়ে থাকে, সেখানে দীনকে ভালবাসে,ইসলামকে পছন্দ করে— লোকদের সাথে সব সময় সরকারের সংঘাত লেগে থাকে, অথচ আলজিরিয়া, ত্রিপলী, মরক্কো ও মিশরের মত দেশগুলোতে স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্ব উলামায়ে কিরাম দিয়েছিলেন কিন্তু আজ এসব দেশে দীনের দাঈ ও ইসলামী ব্যক্তিবর্গ ইসলামী আন্দোলনের নেতাদেরকে বড় বিপদ বলে মনে করা হয়। মিশরে শাইখ হাসানুল বান্নাকে বিপদ মনে করা হয়েছিল। ফলে তাঁকে শহীদ করা হয়েছে, জামাল আবদুন নাছেরের সময় কালে সৈয়দ কুতুবকে শহীদ করা হয়েছে। এ ছাড়া অসংখ্য মুসলমানকে নির্বিচারে শহীদ করা হয়েছে, মিশর ও আল-জিরিয়ার সরকার নিজেদের জন্য ঐসব ব্যক্তিদের বড় ভয়ংকর মনে করে, যাদের মাঝে ধর্মীয় অনুভূতি আছে অথবা যাঁরা বলে শরীয়তেবিরোধী কাজ হচ্ছে, কিন্তু সরকার কি করছে? তারা মনে করে। তাদের জন্য ইসরাইল বা অন্য কোন অমুসলিম রাষ্ট্র শক্তি ভয়ের কারণ নয়, বরং বিপদ যদি আসে তাহলে ধর্মীয় ব্যক্তিদের পক্ষ থেকে আসবে, এ মানসিকতা মুসলিম উম্মাহার জন্য অত্যন্ত বিপজ্জনক। এটা এমন জায়গার জন্য দুঃখজনক অধ্যায় যেখানে জামে আজহারের মত মহান বিদ্যাপীঠ রয়েছে যেখানে আফ্রিকা ও অন্যান্য মুসলিম বিশ্বের হাজারো কলিজায় টুকরা লেখাপড়া করে। কারণ ইসলামী বিশ্বে জামে আজহারকে সর্ববৃহৎ দীনি ইলমী প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয় বলে মনে করা হয়।

এ যুগের সব থেকে বড় চ্যালেঞ্জ ও ভয়ংকর বাস্তবতা হলো আমাদের আরব দেশসমূহ— ইসলামী দাওয়াতকে সব থেকে বেশি ভয় পায়। ফলে সেখানে কোন শক্তিশালী ইসলামী-আন্দোলন গড়ে উঠতে পারে না। ফলে এসব দেশ বিমুগ্ধকারী জামায়াত ও দাঈদের থেকে বঞ্চিত রয়েছে।

ঐসব আরব দেশ, যেখান থেকে আমরা ঈমান ও কুরআনের মত দৌলত পেয়ে ধন্য হয়েছি, যেখান থেকে মানবতা তাদের অধিকার পেয়ে ধন্য হয়েছে, যারা আমাদের হেদায়াতের জন্য দীপ্তিমান সূর্যের মত উদিত হয়েছিল। সারা দুনিয়ার ওপর তাদের এটি বিরাট বড় অনুগ্রহ যে, কোন বড় থেকে বড়

কর্মতৎপর জাতি, উঁচু মর্যাদাসম্পন্ন সভ্যতা-সাংস্কৃতি, কোন ভাল থেকে ভাল শিক্ষা ব্যবস্থা আরবদের অনুগ্রহের সমতুল্য হতে পারে না। তাদের কারণেই আজ আমরা ঈমানদার মুসলমান হতে পেরেছি, দায়িত্বসচেতন মানুষ হতে সক্ষম হয়েছি, সেই আরবদের মাঝে আজ ইসলামের দাওয়াত শুধু যে কমে গেছে এমন নয় বরং সেখানে এ দাওয়াত হারিয়ে গেছে। ইখওয়ানুল মুসলিমের আন্দোলনের পর বর্তমান সেখানে দীনি দাওয়াত নিস্তব্ধ হয়ে গেছে। বলে মনে হয়। সেখানে ইখওয়ানুল মুসলিমীনের আন্দোলনের কারণে তাদের ওপর বিরাট জুলুম হয়েছিল ফলে ধর্মীয় ব্যক্তিবর্গ সে দেশ থেকে হিজরত করে অন্যত্রে চলে গেছেন, তার ফল এই হলো, মিশরে এমন একটি সময় অতিবাহিত হয়েছে যে, তাদের কল্পনাতে আসে নি মুসলমান দুনিয়াতে প্রভাব বিস্তার করতে পারে। সুতরাং যখন আমার কিতাব (মাযা খাসিরুল আলমুইন হিতাতিল মুসলিমীন) "মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কী হারালো?" কায়রো থেকে প্রকাশিত হলো, অতঃপর আমার মিশরের আগমন ঘটল, তখন একটি পত্রিকা এভাবে মন্তব্য করেছিল ঃ মুসলমানেরা কি দুনিয়াতে কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে, মুসলমানদের উত্থান-পতনে দুনিয়াতে কি কোন প্রভাব পড়তে পারে? কিতাবের এই কেমন নাম? তিনি এ নিয়ে বরং বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন, অথচ আমি আল্লামা ইকবালের কবিতা থেকে এই নাম নির্বাচিত করেছিলাম, আর এটা ইবলিসের ব্যাপারে বাস্তবরূপ তিনি নকল করেছিলেন ঃ

ہر نفس ڈرتا ہوں اس امّت کی بیداری سے میں

ہے حقیقت جس کے دیں کی احتساب کائنات ۔

"এই উম্মতের জাগ্রত হওয়াকে আমি সব সময় ভয় পায়, কারণ তাদের দীনের মূল পয়গাম হলো জগতের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করা।"

তাদের ধারণায় মুসলমানরা কোথায় এই পজিশনে আছে এবং তাদের সংখ্যাই বা কত যে তারা দুনিয়ায় ওপর প্রভাব বিস্তার করবে? মূলত এটাই হলো আরব বিশ্বের সর্ববৃহৎ রোগ ও বিপদ। কারণ তারা ইসলামের ভবিষ্যতে নিয়ে হতাশ হয়ে গেছে। কারণ তারা একথা বুঝতে সফল নয় যে, দুনিয়ার জন্য একমাত্র ইসলামই হলো মুক্তির পথ, ধর্মীয় ব্যাপারে, নীতি-নৈতিকতার ক্ষেত্রে দুনিয়ার উন্নতি অগ্রতির ক্ষেত্রে, পারস্পরিক লেনদেনের ক্ষেত্রে, রাজনীতির অঙ্গনে ইসলাম ছাড়া মুক্তির অন্য কোন পথ নেই। এটাই হলো বর্তমান সময়ে মান ও মূল্যের গুরুত্বের দিক থেকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ ও প্রভাবশালী বিষয়। সুতরাং আপনারা নিজেদেরকে এভাবে প্রস্তুত করুন যেন আপনারা আরবদেরকেও জাগ্রত

করতে সক্ষম হন। এজন্য প্রয়োজন হলো আপনাদের ভাষা ও সাহিত্যের এমন শক্তি-সৃজনশীলতা ও আকর্ষন শক্তি দেখে আরবরা বলতে বাধ্য হয়, এ লেখা ও বক্তৃতা কতই না সুন্দর! এ কারণে যখন নদওয়াতুল উলমার মজলিসে তাহকিকাতে ও নশরিয়াতে ইসলাম থেকে এমন লিটারেচার আরবদেশগুলোতে পৌঁছে তখন আরবরা অত্যন্ত আনন্দের সাথে তা নিজেরা পড়ে এবং অন্যদেরকে পড়ে শোনায়। আমি স্বচক্ষে দেখেছি, ড. মাওলানা আব্দুল্লাহ্ আব্বাস নদভী সাহেবের মক্কায় অবস্থিত বাসভবনে উস্তাদ আবদুল হাকীম আবেদীন সাহেব একটি পুস্তক পড়ছিলেন, ইতোমধ্যে আমি কোন প্রয়োজনে বাইরে গিয়েছিলাম, পরে এসে দেখি তিনি পড়ছেন এবং কাঁদতেছেন। তিনি ছিলেন ইমাম হাসান বান্না (রঁ)-এর ভগ্নিপতি, একজন বড় বক্তা ও শিক্ষিত মানুষ। তিনি আমাকে দেখে আমার নাম ধরে জিজ্ঞাসা করলেন, এটি কার লেখা আমি বললাম, এটি আমার ভাতিজা মুহাম্মদ হাসানী (র)-এর রচিত কিতাব।

الاسلام بين لا و نعم। – ইসলাম হাঁ ও না -র মাঝে।

তখন তিনি বললেন, তাঁকে আমার সালাম পৌঁছে দেবেন।

আপনারা যদি আরবদের মাঝে দীনি-দাওয়াত পৌঁছে দেওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেন তাহলে সেটা দুনিয়া ও আখেরাতের দিক থেকে এক বিরাট বড় খিদমত বলে বিবেচিত হবে। আল্লাহ্ আপনাদের এসবের আসবাবসরঞ্জামের ব্যবস্থা করে দিয়েছে, আপনারা একটি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বানিয়ে নিন যে, আমরা পূর্ণ দক্ষতা ও যোগ্যতা অর্জন করে আরবদেরকে শক্তভাবে দীনকে আঁকড়ে ধরার দাওয়াত দেব। আপনারা আমার কিতাব ঃ

١. الى الإسلام من جديد، ٢. أجاهلية بعدالإسلام أيهاالعرب ،٣. إلى الرأية الحمدية الاالعرب -

এ ধরনের কিতাবগুলো পড়বেন। কারণ এ কিতাবগুলো আরবদেরকে সতর্ক তাদেরকে জাগ্রত করে দেওয়ার জন্যই যথেষ্ট।

আপনার অবস্থা দেখে তারা বলতে বাধ্য হবে, একজন অনারব ভারতীয় আমাদের সামনে বক্তৃতা করে তার কাছে ইসলামের ব্যাপারে এত অগাধ আত্মবিশ্বাস রয়েছে যা আমাদের কাছে নেই! তাই আমি বলতে বাধ্য, আল্লাহ্ যদি আপনার মাধ্যমে তাদেরকে উপকৃত করে তাহলে আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের এ থেকে বড় কোন পথ হতে পারে না। কারণ আপনার মাধ্যমে এই উম্মতের মাঝে নতুনভাবে ইসলামের প্রতি আস্থা সৃষ্টি হয়েছে। অতঃপর তাদের মাধ্যমে এ নিয়ামত ও দৌলত অন্যের কাছে পৌঁছে যাবে। আমাদের মাদ্রাসার

ছাত্র-শিক্ষকদের এ মনোভাব অধিক হওয়ার প্রয়োজন, কারণ আমরা যে ভাষার মাধ্যমে দীনি শিক্ষা অর্জন করছি, দীনকে বোঝার চেষ্টা করছি এবং যাদের মাধ্যমে আমরা এই ইলম অর্জন করেছি এবং এখনো অর্জন করছি, তার দাবী হলো, তাদের কাছে আবার সেই ইলম ও দীন নিয়ে যাওয়া। তাদের মাঝে আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি করে দেওয়া এবং তাদেরকে আত্মসচেতন করে দেওয়া, কারণ তারই হলো উস্তাদ আর আমরা তাদের ছত্র, তারা পীর, আমরা মুরীদ, তারা হেদায়েতের রাহবর, আর আমরা তাদের অনুসারী, এই লক্ষ্য উদ্দেশ্য নিয়ে মায়াযদুদ দাওয়াহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এটা অত্যন্ত সুলক্ষণ ও মুবারকবাদ পাওয়ার উপযুক্ত। আল্লাহ্ তায়ালা আমাদের স্নেহধন্য ছাত্রবৃন্দ ও সহকর্মীদেরকে জাযায়ে খাইর দান করুন। (আমীন)।

আপনারা এ যুগে নিজের দেশে ও নিজের সমাজের শিক্ষিত মানুষকে, বিশেষভাবে সাধারণ মানুষদেরকে ব্যাপকভাবে সামনে রেখে এই বাস্তবতা উপলব্ধি করুন যে, এক সময় বা যুগ বদলে গেছে। কিন্তু দীন অপরিবর্তনশীল ও চিরন্তন এবং বর্তমানে তা সঠিক এ পূর্ণাঙ্গভাবে জীবিত রয়েছে। তাই শুধু এই দীনিই সব যুগে সঠিক পথ দেখাতে সক্ষম এবং আমরা এই দীনের মাধ্যমেই সফলতা অর্জন করতে পারি। আল্লাহ্ তায়ালার সাহায্যে-সহযোগিতা লাভে ধন্য হয়ে বিজয়ের সোনালী প্রান্তে পৌছতে সক্ষম হতে পারে।

এই কাজ আপনারা সব জায়গায় করতে পারেন, স্বস্থানে থেকেও করতে পারেন, এ শহরে থেকে এ করতে পারেন, বিশেষভাবে শিক্ষিত সমাজ যারা পাশ্চাত্য সভ্যতায় প্রভাবিত হয়েছিল, বরং বাস্তব জীবনে তা বাস্তবায়িত করেছিল, এখন তারা হিন্দু সভ্যতার প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে, বরং তাদের মাঝে হিন্দু দেবদেবী ও সভ্যতা-সংস্কৃতিকে গ্রহণ করার আশংকা দেখা দিয়েছে। তাই এই বিষয়টি আপনারা চিন্তা-ভাবনা করতে পারেন, সাথে সাথে আপনারা আরবী শিক্ষা অর্জনের সময় এ কথা চিন্তা করবেন না যে, আমরা আরব দেশে যাব এবং কোথাও সুযোগ পেয়ে গেলে চাকরী করব, অন্যথায় দেশে ইমাম মুয়াজ্জিন হয়ে দায়িত্ব পালন করব। এটা আপনাদের যথার্থ মূল্যায়ন নয় এবং নদওয়াতুল উলমার প্রতিষ্ঠাতা সৈয়দ মোহাম্মদ আলী মুঙ্গেরী (র.), মাওলানা জহুরুল ইসলাম ফতেহপুরী (র.), মাওলানা হাকীম সৈয়দ আবদুল হাই (র) ও যারা নদওয়াতুল উলমার প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে দেখেছিল এবং যারা নদওয়াতুল উলমাকে উন্নতির শীর্ষে পৌছিয়েছেন যেমন আল্লামা শিবলী নোমানী (র), মাওলানা সাইয়েদ সুলাইমান নদভী (র) এবং তাদের আল্লাহ্ওয়ালা ও আরিফ বিল্লাহ সহকর্মী ও সহযোগীবৃন্দের চেষ্টা-প্রচেষ্টা, ত্যাগ ও কোরবানী, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বাস্তবে প্রতিপালন নয়, বরং নিজের যথার্থ মূল্যায়ন এ তাদের কৃতজ্ঞতার বাস্তব রূপ

হলো, আপনি ইসলামের দাঈ ও প্রচারক হবেন, ইসলাম বিদেশী সভ্যতা সংস্কৃতি হতে মুসলমানদেরকে মুক্তি দেবেন। প্রাচ্যবিদ লেখকদের বই-পুস্তক পড়ে মুসলিম যুব সমাজ যে অস্থিরতার শিকার হয়েছে সেগুলো দূর করে তাদের মন-মস্তিষ্কে ইসলামের প্রতি আস্থা বসিয়ে দেবেন। সাথে সাথে আরবদেরকে লক্ষ্য করে বলবেন ঃ

بضاعتنا ردت الينا

আমাদের সম্পদ আমাদের কাছে ফিরে দেওয়া হয়েছে, বলতে বাধ্য করবেন।

আল্লাহ্ তায়ালা আপনাদের সকলকে তাওফিক দান করুন! আমিন!

وصلى الله تبارك وتعالى على خيرخلقه سيدنا ومولنا محمد واله اصحابه ـ

বর্তমান সভ্যতার অসফল কাহিনী

[১৯৫৫ ইং সনের ২৪ ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যায় বানারসের ভিক্টোরিয়া পার্কের একটি গণসমাবেশে ভাষণটি প্রদান করা হয়।]

উপাদানের সহজলভ্যতা

এই যুগটি নানা দিক থেকে অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। কাজ করার উপরকণ যেভাবে যতটুকু এ যুগে সহজলভ্য হয়ে গেছে, কখনো এতটুকু সহজলভ্য ইতোপূর্বে ছিল না। ইতিহাসের একজন ছাত্র আমি। আমি জানি, এ পরিমাণ উপায়-উপকরণ ইতোপূর্বে কখনো মানুষের সংগ্রহে আসেনি। উপায়-উপকরণের প্লাবন এ যুগের বৈশিষ্ট্য। অধিক থেকে অত্যধিক ও উত্তম থেকে অতি উত্তম উপায়-উপকরণ বর্তমানে বিদ্যমান। আমরা লখ্নৌ থেকে কয়েক ঘণ্টা সফর করেই এখানে এসে হাজির হয়েছি। এর চেয়েও দ্রুত গতিসম্পন্ন গাড়ির সাহায্যে এই সফর করা যেত। বিমানে উড়েও মানুষ এখানে আসতে পারে। আজ থেকে শুধু সত্তর-আশি বছর আগে লখ্নৌ থেকে যদি কেউ বানারস আসতে চাইত, তাহলে সে কি উপায় অবলম্বন করত, আপনি চিন্তা করুন। ভেবে দেখুন, এ পর্যন্ত পৌঁছতে তার কত সময় ব্যয় হতো!

এটা তো সফরের বিষয়। এক যুগ তো এমনও ছিল যে, মানুষ দূরে অবস্থানকারী বন্ধু-সহৃদয় ও আত্মীয়-স্বজনেরা খবরাখবর জানতে ইচ্ছে হলে প্রমাদ গুণত। কিন্তু আজ দূর-দূরান্তের দেশে বসবাসরত লোকের গলার স্বর আমরা ঘরে বসেই শুনতে পারি এবং এমনভাবে শুনতে পারি যেন সে মুখোমুখি বসে আমার সঙ্গে কথাবার্তা বলছে! বর্তমানে কয়েক দিনেই দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে চিঠি পৌঁছে যায়। টেলিগ্রাম তারও আগে পৌঁছে। এমন এক যুগ ছিল, সাধারণত যখন কেউ প্রবাসে যেত, তখন তার প্রত্যাবর্তনের বিষয়টি থাকত সন্দেহযুক্ত এবং বলে-কয়ে, ক্ষমা-মার্জনা আদায় করেই যেতে হতো। যদি প্রবাস থেকে কয়েক বছর পর অন্য কেউ ফিরে আসত এবং প্রবাসী ব্যক্তির খবরাখবর জানাত, তখন আত্মীয়-পরিজন শুকরিয়া আদায় করত। তা না হলে কোন খবরই পাওয়া যেত না। কিন্তু আজ যদি কেউ দূরতম কোন গন্তব্যেও সফরে বের হয়, যে কোন জায়গা থেকে নিজের খবরাখবর আত্মীয়-পরিজনকে জানাতে পারে এবং খুবই সহজে অত্যন্ত অল্প সময়ে ফিরে আসতে পারে।

আজ উপায়-উপকরণের প্রাচুর্য এমন, আপনি লন্ডনের আওয়াজ এখানে বসে বসে শুনতে পারবেন। নিউ ইয়র্কে কোন মানুষ আলোচনা করলে বা ভাষণ দিলে

আপনি এখানে বসে বসে তার আওয়াজ শুনতে পারবেন, তাকে দেখতে পারবেন। আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে এমন কথা বললে সেটা বুঝাও দুরূহ হয়ে যেতো। কিন্তু আজকে যদি কেউ এসব আবিষ্কারের ব্যাপারে সন্দেহ ব্যক্ত করে, তাহলে শিশুরাও তাকে বিদ্রূপ করবে। টেলিফোন, টেলিভিশন, ওয়্যারলেস, রেডিও ও যাবতীয় আবিষ্কৃত উপকরণের দিকে আপনি লক্ষ্য করে দেখুন, আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান আমাদেরকে কত কিছু উপহার দিয়েছে! আমাদের অন্তরে বার বার এই আক্ষেপ আর বেদনা জেগে ওঠে, আহা! যদি এই যুগে সৎ হওয়ার আগ্রহ, আল্লাহ্‌প্রেমী হওয়ার প্রেরণা, দয়ার্দ্রতা, মানবিক সহমর্মিতা ও পারস্পরিক মমতার বন্ধনও বজায় থাকত এবং এসব নব আবিষ্কৃত উপকরণের সঠিক ও সুষ্ঠু ব্যবহার ঘটত, তাহলে এই পৃথিবী জান্নাতের নমুনা হয়ে যেত। থেমে থেমে আমাদের হৃদয়ে একটি দুঃখ, একটি ব্যথা জেগে ওঠে, হায়! কাজের উপায়-উপকরণের তো এ বিশাল প্লাবন, কিন্তু এই উপায়-উপকরণের সাহায্যে কর্ম সম্পাদনকারীর এমন মহামারী!

এখন আপনার উপায়-উপকরণ খুঁজে ফেরার প্রয়োজন নেই। উপায়-উপকরণ নিজেই আপনাকে তালাশ করে চলেছে। এখন বাহন নিজেই মুসাফিরকে খুঁজে ফিরছে এবং প্রতিযোগিতা করছে। আজ রেলওয়ের পক্ষ থেকে টাইম-টেবিল প্রচার করা হচ্ছে। ভ্রমণে উৎসাহ যোগানোর জন্য প্রচার করা হচ্ছে স্বাস্থ্যকর স্থান ও ঐতিহাসিক শহরগুলোর ছবি। যেন ভ্রমণের প্রতি উৎসাহ সৃষ্টি হয়—সেজন্যই এসব করা হচ্ছে। বিমান কোম্পানীগুলো বিজ্ঞাপন ছাপিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। স্টেশনে গাড়ি থেকে নামতেই হোটেলওয়ালাদের সঙ্গে সাক্ষাত হয়ে যাচ্ছে। কখনো কখনো তারা ছায়ার মতো সঙ্গে লেগে থাকছে এবং তাদেরকে ছাড়ানোও কঠিন হয়ে যাচ্ছে। অথচ এমন এক সময় ছিল, মুসাফির পথে পথে ঘুরে সরাইখানা খুঁজত এবং সওয়ারী ও বাহনের সন্ধানে বের হওয়ার দরকার হয়ে পড়ত। আজ এই চিত্র সম্পূর্ণ বিপরীত।

লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও শুভ প্রেরণার বিলুপ্তি

যে পরিমাণ দ্রুততার সাথে উপায়-উপকরণ উন্নতি করেছে, আমাদের নৈতিকতা ও মনুষ্যত্ব কিন্তু সে পরিমাণ উন্নতি করেনি। একজন মানুষের এ অবস্থা দেখে দুঃখ হয়। আগের যুগের মানুষ ভাল ও কল্যাণ সাধন করতে চাইত, তাদের কাছে উপায়-উপকরণ ছিল না। কিন্তু এখন উপায়-উপকরণ বিদ্যমান, অথচ কল্যাণের প্রেরণা অন্তর থেকে চলে যাচ্ছে। এ অবস্থার একটি পরিষ্কার উদাহরণ আমি তুলে ধরছি। আগের যুগে একটি দরিদ্র পরিবারের লোক উপার্জনের জন্য প্রবাসে পাড়ি দিত। সে যা কিছু কামাই করত, বাড়িতে পাঠানো কঠিন হয়ে যেত।

হয় তার নিজেকেই বাড়ি ফিরে আসত হতো অথবা ভাগ্যগুণে ফিরতি পথের কোন বিশ্বস্ত লোককে পেতে হতো। সে সব সময় এ বিষয়ে চিন্তিত থাকত। তার হৃদয়ে জেগে উঠত নিজের পরিবারের লোকদের দুঃখ-দুর্দশা ও শিশুদের ক্ষুধার যন্ত্রণা ও কান্নাকাটির কথা। কিন্তু সে কিছুই করতে পারত না। না ছিল পোস্ট অফিস, না ছিল বহন বা যোগাযোগের সহজ ব্যবস্থা। কিন্তু এখন শহরে-শহরে, পাড়ায়-পাড়ায় পোস্ট অফিস চালু আছে। টাকা-পয়সা মানি অর্ডারের সাহায্যে পাঠানো যায়, তার করেও পাঠানো যায়। কিন্তু উপার্জনকারীর অন্তরে এখন টাকা পাঠানোর প্রেরণা, পরিবারের লোকদের দুর্দশা ও গাঁয়ের লোকদের দরিদ্রের অনুভূতিই নেই। সিনেমা, পার্ক, খেলা, তামাশা ও হোটেল-রেস্টুরেন্ট ঘুরে কিছু আর বাঁচেই না যে সে ঘরে পাঠাবে।

পোস্ট অফিসের কাজ হলো, যদি কেউ টাকা পাঠায়, তাহলে তা পৌঁছে দেওয়া। কিন্তু কেউ পাঠাতে না চাইলে পোস্ট অফিস কিছুই করতে পারবে না। পোস্ট অফিসের কাজ নৈতিকতার শিক্ষা দান ও কল্যাণের প্রতি উৎসাহ যোগানো নয়। আগের কালের প্রবাসী উপার্জনকারীরা নিজের পেট ভরতেও কষ্ট করত। সকল উপার্জন দরিদ্র পরিবারের লোকদের ও গাঁয়ের অভাবী মানুষদের জন্য পাঠিয়ে দিত। আজ টাকা পাঠানো ও সাহায্য করার সব উপায়-উপকরণ তো বিদ্যমান; কিন্তু মানুষের অভ্যন্তরে দরিদ্র ও গরীব মানুষকে সাহায্য করার প্রেরণা নেই। সাহায্যে করার চাহিদা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। আমাদের সংস্কৃতিতে এর কোন স্থান নেই। তবে এই উপায়-উপকরণ আর কী কাজে আসবে?

উপকরণের সহজলভ্যতা সুপ্রবৃত্তি লালন করে না

উপায়-উপকরণ আবেগ, সুপ্রবৃত্তি ও সদিচ্ছাকে লালন করে। আজ মানি অর্ডার রয়েছে, তার রয়েছে, সহজ যোগাযোগের সুযোগ রয়েছে, বিত্তের প্রাচুর্য রয়েছে। কিন্তু এ ব্যাধির চিকিৎসা কী, গরীবদের সাহায্যের মনোভাব ও স্বভাবের মধ্যে মানব সেবার চাহিদাই নেই? পৃথিবীর কোন্ প্রতিষ্ঠান এই চাহিদা সৃষ্টি করতে পারবে? এমন অবস্থায় উপায়-উপকরণ কী সাহায্য করতে পারে?

আমি এরই দ্বিতীয় আরেকটি উদাহরণ দিচ্ছি। আপনারা প্রাচীন বই-পুস্তক উল্টিয়ে দেখুন। দেখতে পাবেন, আল্লাহ্র অনেক বড় বড় নেক বান্দা এই আশা বুকে নিয়েই দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছেন, আল্লাহ্ যদি তাঁকে হজ্জ করার সৌভাগ্য দান করতেন! তাঁরা তীব্র ভালোবাসা ও আগ্রহের কারণে হাজারো কবিতা আবৃত্তি করেছেন এবং বহু নিবন্ধ লিখেছেন। কিন্তু তাঁদের এই আশা পূরণ হয়নি। কেননা তাঁদের কাছে এ পরিমাণ টাকাও ছিল না এবং সফরের এমন সহজ ব্যবস্থাও ছিল না। মনে করুন, টানও রয়েছে, কিন্তু হজ্জের আগ্রহ ও চাহিদাই অন্তরে নেই,

তাহলে বলুন, এই উপায়-উপকরণ কি করতে পারে? আগের যুগে মানুষ কাশি, গয়া ও মথুরা যাত্রার জন্য হাজার মাইল পায়ে হেঁটেই চলে যেত এবং সফরের দুর্ভোগ বরণ করে নিত। মনে করুন, এখন সফরের সব সহজ ব্যবস্থা রয়েছে, দ্রুত গতিসম্পন্ন বাহন রয়েছে, কিন্তু এসব স্থানে যাওয়ার আগ্রহ ও আবেগ ফুরিয়ে গেছে। তাহলে এই উপায়-উপকরণ কি করতে পারবে?

উপকরণের পূর্বে ব্যবহারকারী দরকার

আম্বিয়াগণ এ বিষয়টি বুঝতেন, উপায়-উপকরণের পূর্বে উপকরণ ব্যবহাকারীর প্রয়োজন অধিক। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদেরকে ঈমানী প্রজ্ঞা ও নবুওয়াতের নূর দান করে সুষ্ঠু ব্যবহাকারী সৃষ্টি করেছেন। বাহন ও সওয়ারী সৃষ্টির আগে বাহন দ্বারা উপকার ও সুবিধা ভোগকারী ও সৎ উদ্দেশে সফরকারী সৃষ্টি করেছেন। অর্থ উপার্জনের পূর্বে সঠিক পাত্রে অর্থ ব্যয়কারী ও সঠিক পন্থায় অর্থ ব্যবহাকারী সৃষ্টি করেছেন। উপকরণ সৃষ্টি করার আগে নিজস্ব শক্তি ও আল্লাহ্প্রদত্ত নেয়ামতের ব্যবহার শিখিয়েছেন। তাঁরা মানুষের মাঝে সুপ্রবৃত্তির জন্ম দিয়েছেন। সুপ্রবৃত্তি সৃষ্টির এমনিতেই জন্ম হয় না, একীন ও আকীদার মাধ্যমে তার জন্ম হয়। একীন সুপ্রবৃত্তি সৃষ্টি করে। সুপ্রবৃত্তি আমলের আগ্রহ সৃষ্টি করে। অবশেষে উপকরণ দ্বারা আমল সংঘটিত ও বাস্তবায়িত হয়। উপায়-উপকরণ ও মানবীয় প্রচেষ্টার ফলাফল সব সময় মানুষের ইচ্ছার অনুগত থাকে। সৎ প্রবৃত্তি এই জীবনের সবচেয়ে বড় শক্তি ও সম্পদ। কিন্তু পৃথিবীর বড় বড় দার্শনিক, নেতা ও বিজ্ঞানী এই সূক্ষ্ম তত্ত্ব অনুধাবনে অপরাগ ছিলেন। এটা শুধু আল্লাহ্র পথ প্রদর্শন এবং আম্বিয়াগণের সূক্ষ্মদর্শিতা ছিল, তাঁরা প্রথমে সৎ প্রবৃত্তি সৃষ্টি করেছেন। মানুষকে সৎ, অপরের প্রতি সহমর্মী ও কল্যাণপ্রেমী বানিয়েছেন। উপকরণ ছিল তাঁদের পায়েব নিচে এবং তাঁদের সুপ্রবৃত্তির পিছে পিছে। তাঁদের মস্তিষ্ক সঠিক পথ-প্রদর্শন থেকে সরে যেতো না। তাঁরা মানুষের হৃদয় বানাতেন, মানুষের মানসিকতা গড়তেন। আল্লাহ্র রাসূলগণ পৃথিবীকে বিজ্ঞান উপহার দেননি, মানুষ উপহার দিয়েছেন। আর মানুষই হচ্ছে এই পৃথিবীর মূল প্রতিপাদ্য।

আম্বিয়া কেরামগণ মানুষ গড়েছেন

আম্বিয়াগণ এমন মানুষ নির্মাণ করেছেন, যাঁরা নিজেদের রিপু ও প্রবৃত্তির ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখতেন। তাঁরা উপকরণের পরিবর্তে প্রবৃত্তিকে বিশুদ্ধকরণের মধ্য দিয়ে মানবতার সেবা করতেন। তাঁদের বিশুদ্ধকৃত মানুষের মধ্য থেকে কেউ কেউ এমন ছিলেন, দুনিয়ার সর্বোচ্চ আয়েশ-বিলাসিতার সাজ-সরঞ্জাম ও উপকরণ যাঁদের আয়ত্তে ছিল। কিন্তু তাঁরা তা করেন নি। তাঁরা রাজকীয় জীবন যাপনের ক্ষমতা রাখতেন। কিন্তু তাঁরা দুনিয়া ত্যাগ ও অল্পে তুষ্টির জীবন কাটিয়েছেন।

হযরত ওমর (রা)-এর আয়ত্তে এমন সব উপকরণ ছিল, রোমের সম্রাটরা যেসব উপকরণের সাহায্যে আয়েশ ও বিলাসিতার যিন্দেগী যাপন করেছেন। তাঁর কব্জায় ঐসব উপকরণও ছিল, যেগুলোর সাহায্যে ইরানের শাহানশাহ্ বিলাসিতার এমন চূড়ান্ত নিদর্শন স্থাপন করেছে। পৃথিবীর অল্প সংখ্যক বাদশাহ যা করতে পেরেছে। হযরত ওমর (রা)-এর পায়ের নিচে ছিল গোটা রোমান সাম্রাজ্য, ছিল সমগ্র ইরান। মিসর ও ইরাকের মতো আসবাব-উপকরণসমৃদ্ধ ও স্বর্ণ প্রসবিনী রাষ্ট্রগুলোও ছিল তাঁর কব্জায়। ভারতের নিকটবর্তী অঞ্চল তাঁর নিয়ন্ত্রণে চলে এসেছিল। এমন একজন ব্যক্তি বিলাসিতা করতে চাইলে তাঁর কি কোন ঘাটতি হতো?

কিন্তু তিনি এই বিশাল রাজত্ব ও এই ব্যাপক উপকরণের সাহায্যে কোন ব্যক্তিগত সুবিধা গ্রহণ করেন নি। তাঁর সাদামাটা জীবনের অবস্থা এমন ছিল যে, দুর্ভিক্ষের সময় তিনি ঘি ব্যবহার করাও ত্যাগ করেছিলেন এবং তেল খেতে খেতে তাঁর লাল-শুভ্র বর্ণের ত্বক শ্যামবর্ণ হয়ে গিয়েছিল। তিনি নিজের ওপর এমনই সংযম আরোপ করেছিলেন যে, লোকজন বলাবলি করছিল, যদি এই দুর্ভিক্ষ দ্রুত শেষ না হয়, তাহলে ওমর (রা)-কে আর জীবিত দেখা যাবে না।

তাঁরই অনুরূপ নামের অধিকারী আরেকজন, ওমর ইবনে আবদুল আযীয (র); তাঁর চেয়েও বড় রাজত্বের অধিকারী ছিলেন। তাঁর অবস্থা এমন ছিল, শীতকালে রাষ্ট্রীয় অর্থে মুসলিম জনসাধারণের জন্য যে পানি গরম করা হতো, তিনি নিজের বেলায় সে পানি নিয়ে গোসল করা অনুচিত মনে করতেন।

এক রাতে তিনি রাষ্ট্রীয় কাজ করছিলেন। এক ব্যক্তি বসে তাঁকে তাঁর অবস্থা জিজ্ঞাসা করে তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগত আলাপচারিতা শুরু করল। তিনি বাতি নিভিয়ে দিলেন, সে বাতিতে রাষ্ট্রীয় কোষাগারের তেল খরচ হচ্ছিল, যেন রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক নেই এমন আলাপচারিতায় রাষ্ট্রের তেল ব্যয়িত না হয়। যদি তিনি বিলাসিতা করতে উৎসাহী হতেন, তাহলে গোটা পৃথিবীর বিলাসী মানুষ তাঁর কাছে পরাজিত হতো। কেননা তিনি সব ধরনের উপায়-উপকরণের মালিক ছিলেন এবং সমকালীন সভ্য জগতের সবচেয়ে বড় রাজত্বের শাসক ছিলেন। এটা ছিল রাসূলুল্লাহ্ (সা) শিক্ষা যার ফলে এত সব উপায়-উকপরণ সত্ত্বেও তাঁদের নির্মোহ সাদামাটা জীবনে কোন রদ-বদল ঘটেনি।

ইউরোপের অসহায়ত্ব ও লক্ষ্যশূন্যতা

বর্তমানে ইউরোপের সবচেয়ে বড় দুবর্লতা ও অসহায়ত্ব এটাই যে, তার কাছে উপায়-উপকরণের বিস্তৃত ভাণ্ডার বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও সে সৎ প্রবৃত্তি ও সৎ প্রেরণা থেকে শূন্য হয়ে আছে। সে একদিকে উপায়-উপকরণে করূণসদৃশ, অপরদিকে পুণ্যময় লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের ব্যাপারে নিতান্ত দরিদ্র ও মিসকীন। সে জগতের রহস্য

উন্মোচন করেছে এবং প্রাকৃতিক শক্তিকে নিজের দাস বানিয়েছে। সে সমুদ্র ও শূন্যে কর্তৃত্ব অর্জন করেছে। কিন্তু সে নিজের নফস ও প্রবৃত্তির ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি। সে এই জগতের নানা গ্রন্থি উন্মোচন করেছে, কিন্তু নিজের জীবনের প্রাথমিক পাঠই অনুধাবন করতে পারেনি। সে বিক্ষিপ্ত অংশ ও প্রাকৃতিক শক্তিসমূহের মধ্যে শৃঙ্খলা ও সমন্বয় প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং এই জড় জগতের মাঝে বিপ্লব সাধন করেছে, কিন্তু নিজের জীবনের বিক্ষিপ্ততা দূর করতে পারেনি। কবির ভাষায়–

সূর্যের আলোকে বন্দী করেছে
জীবনের অমানিশাকে পারেনি ভোর করতে
নক্ষত্রের কক্ষপথ অনুসন্ধানী
আপন চিন্তার জগতে তার শেষ কতে পারেনি সফর।

আহ! ইউরোপের কাছে এই ব্যাপক উপকরণ না থেকে যদি শুভ প্রেরণা ও মানবতার সেবার যথার্থ অনুভূতি থাকত!

উপকরণ ধ্বংসের কারণ কেন?

মস্তিষ্কের বক্রতা ও নিয়তের অসততা এসব উপায়-উপকরণকে মানবতার জন্য বিপজ্জনক বানিয়ে দিয়েছে। এক ব্যক্তি যার অন্তর দয়াশূন্য ও অত্যাচারী, যদি তার হাতে ধারালো ছুরি থাকে, তবে সে অধিক ক্ষতি করবে। পক্ষান্তরে ভোঁতা ছুরি থাকলে ক্ষতি কম করবে। সভ্যতা উন্নতি করেছে, কিন্তু মানুষের চরিত্র উন্নতি করেনি। যার ফল হলো এই যে, আধুনিক উপকরণ মানুষের জন্য পীড়াদায়ক হয়ে গেছে। দ্রুতগামী বাহনগুলো এখন জুলুমের গতিকে দ্রুত করে দিয়েছে এবং অত্যাচারীকে চোখের পলকে এক দেশ থেকে অন্য দেশে পৌঁছার সুবিধা করে দিয়েছে। আগের যুগে অত্যাচারীরা গরুর গাড়িতে চড়ে যেত এবং জুলুম করত। তাদের পৌঁছতে যে পরিমাণ বিলম্ব হতো, জুলুম সংঘটিত হতেও সে পরিমাণ বিলম্ব হতো। ফলে দুর্বল লোকদের জন্য আরো কিছুদিন শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ এবং আরামের সাথে জীবন যাপনের সুযোগ ঘটত। যুগ তো এগিয়ে গেছে। নতুন যুগের অত্যাচারী দ্রুত থেকে দ্রুতগামী বাহনে চড়ে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে সহজভাবেই পৌঁছে যাচ্ছে। এভাবে দুর্বল জাতি-গোষ্ঠীর ওপর আগ্রাসন চালাচ্ছে এবং মুহূর্তের মধ্যেই তাদেরকে নিঃশেষ ও বিলুপ্তির ঘাটে নামিয়ে দিচ্ছে।

নতুন সভ্যতার ব্যর্থতা

ইউরোপ ও আমেরিকার বড় বড় চিন্তাশীল ব্যক্তিরা এখন একথা স্বীকার করতে শুরু করেছেন যে, নতুন সভ্যতা উপায়-উপকরণ দিয়েছে, কিন্তু লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য দিতে পারেনি। উদ্দেশ্যহীন উপকরণ অচল। এশিয়ার অধিবাসী হিসাবে আমরা

ইউরোপকে বলতে পারি, তোমাদের উপকরণ, তোমাদের অগ্রগতি, তোমাদের আবিষ্কার অসম্পূর্ণ, ব্যর্থ। শত উপকরণ একটি মাত্র উদ্দেশ্যকেও জাগাতে পারে না। তোমাদের সভ্যতা, তোমাদের জীবন-দর্শন, তোমাদের অগ্রগতি শুভ উদ্দেশ্য ও সুকুমারবৃত্তি জন্মানোর ব্যাপারে ব্যর্থ। তোমরা এখন ভালো থেকে ভালো কাজের উপকরণ সৃষ্টি করতে পার বৈকি, ভালো কাজের প্রেরণা সৃষ্টি করতে পার না। প্রেরণার সম্পর্ক অন্তরের সাথে। তোমাদের উপকরণ ও আবিষ্কারের সে পর্যন্ত দৌড়ই নেই। আর যতক্ষণ পর্যন্ত ভালো কাজের প্রেরণা সৃষ্টি না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো সরঞ্জামগত সুবিধা কিছুই করতে পারবে না।

ভালো কাজের প্রেরণা ও তার তীব্র তাগাদা সৃষ্টি করা ছিল পয়গাম্বরগণের কাজ। আজও পর্যন্ত তাঁদের শিক্ষাই এই প্রেরণা সৃষ্টির একমাত্র পথ। তাঁরা অনেক উঁচু মাপের প্রেরণা সৃষ্টি করে দেখিয়েছেন। লক্ষ মানুষের হৃদয়ে নেক কাজের চাহিদা, খেদমতের জযবা, অবিচার ও অকল্যাণের প্রতি ঘৃণা জন্মিয়ে দিয়েছেন। তাঁরা তাঁদের সীমিত উপকরণ দিয়ে সেই কাজ করে দেখিয়েছেন, ব্যাপক ও বিস্তৃত উপকরণ দিয়েও যে কাজ আজ আর সংঘটিত হচ্ছে না।

ধর্মের কাজ

এ যুগের অনেক ভাই-ই মনে করে থাকেন, ধর্মের কাছে কোন পয়গাম নেই এবং ধর্ম এ যুগের কোন সেবা করতে পারবে না। কিন্তু আমি এর প্রতিবাদ করছি এবং চ্যালেঞ্জ করছি যে, ধর্ম আজও ইউরোপকে পথ দেখাতে পারে। সঠিক ও শক্তিশালী তো ধর্মই যা কল্যাণের প্রেরণা ও নেক কাজের আগ্রহ সৃষ্টি করে। আর এটাই তো যিন্দেগীর চাবিকাঠি! আজ পৃথিবী ভীষণ বিক্ষিপ্ততায় নিমজ্জিত। ইউরোপের কাছে উপকরণ রয়েছে, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নেই। যদি উপকরণ ও উদ্দেশ্যের সমন্বয় ঘটে যেত, তাহলে পৃথিবীর চিত্রই পাল্টে যেত।

উপকরণের আধিক্য থেকে দাসত্ব

আজ এই সভ্যতা এ পরিমাণ উপকরণ সৃষ্টি করেছে যে, তা প্রয়োগ করার ক্ষেত্র নেই। উপকরণ এখন নিজের জন্য বাজার খুঁজে ফিরছে। এই তালাশ ও অনুসন্ধান বহু জাতিকে দাস বানাতে এবং স্বাধীন রাষ্ট্রগুলোকে নিজের ব্যবসার বাজার বানাতে উদ্বুদ্ধ করছে। কখনো কখনো তার জন্য যুদ্ধের প্রয়োজন পড়ে যাচ্ছে যেন এসব নতুন নতুন অস্ত্রের ঠিকানা হয়ে যায়। বিশ্বযুদ্ধের ভিত্তিই দাঁড় করিয়েছিল স্বার্থপর অস্ত্রনির্মাতা ও অস্ত্রের কারখানা-মালিকরা যারা নিজেদের পণ্যের ক্ষেত্র লক্ষ্য করছিল যুদ্ধের মধ্যেই।

এশিয়ার কর্তব্য

এশিয়ার রাষ্টগুলোর কর্তব্য ছিল যে, তারা ইউরোপের পণ্যের বাজার হওয়া ও ইউরোপীয় উপকরণ ও পণ্যের মোড়ক উন্মোচনের পরিবর্তে এই নাযুক সময়ে

ইউরোপের সাহায্য করবে, তাদের মাঝে নৈতিকতার প্রেরণা সৃষ্টির চেষ্টা করবে। কেননা এশীয়দের কাছে ধর্মের শক্তি রয়েছে এবং বহু শতাব্দী পূর্ব থেকে ইউরোপ এই সম্পদ থেকে বঞ্চিত হয়ে আছে। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় হলো, এশিয়ার রাষ্ট্রগুলো নিজেরাই এখন এসব নৈতিক প্রেরণা ও মানবিক গুণাবলীর ক্ষেত্রে দেউলিয়া হতে চলেছে। এরা নিজেরাই এখন ইউরোপের ব্যাধির শিকারে পরিণত হচ্ছে। এসব রাষ্ট্রে আত্মবিস্মৃতি ও স্বার্থপরতার অভিশাপ ছড়িয়ে পড়ছে এবং সম্পদ বানানোর একটি উন্মাদনার সওয়ার হয়ে গেছে। এসব রাষ্ট্রের সমাজগুলোতে এখন পচন ধরে গেছে। এগুলো এসব রাষ্ট্রের জন্য বড়ই ভয়ংকর! সবচেয়ে বড় দুশ্চিন্তার বিষয় হলো, রাষ্ট্রের কোন প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন এই বিপদকে অনুভব করতে পারছে না এবং চরিত্রের সংশোধন, ঈমান-একীনের দাওয়াত ও চরিত্র নির্মাণের কাজ আঞ্জাম দিচ্ছে না, অথচ এই কাজ সকল কাজের ওপর অগ্রগণ্য ছিল এবং প্রতিটি গঠনমূলক কাজের পূর্ণতা এরই ওপর সীমাবদ্ধ।

সময়ের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ

এই কথাগুলো তো সারা বছরের জন্য যথেষ্ট! এই আশাবাদ নিয়েই আমি কথাগুলো বলছি, হয়তো কোন একজন জাগ্রত মস্তিষ্ক, জীবন্ত হৃদয় ও সুস্থ চিন্তার অধিকারী মানুষ আমার কথাগুলো মেনে নেবেন। মুখে বলা ও বাস্তবে করার কাজ তো এটাই যে, পয়গাম্বরগণের পথ অবলম্বন করুন! আল্লাহ্র অস্তিত্বের একীন ও মৃত্যু-পরবর্তী জীবনের একীন সৃষ্টি করুন! জীবন যাপনে আল্লাহ্র আনুগত্য অবলম্বন করুন! যাদেরকে আল্লাহ্ প্রজ্ঞা দিয়েছেন, সম্পদ দিয়েছেন, উপকরণ দিয়েছেন, তারা দুনিয়ার পুণ্যময় জীবন যাপনের চেষ্টা করুন! প্রজ্ঞা ও চরিত্রের মধ্যে সামঞ্জস্য ও ভারসাম্যের প্রতিষ্ঠা করুন! প্রজ্ঞা আর বচন হবে ঋষিদের, কাজ আর চরিত্র হবে রাক্ষসের—এ কেমন ইনসানিয়াত? এ কোন্ মানবতা?

যতক্ষণ পর্যন্ত উপকরণ ও উদ্দেশ্যের মাঝে সমন্বয়, ইল্ম ও চরিত্রের মাঝে সামঞ্জস্য না ঘটবে, এই পৃথিবী এভাবেই ধ্বংস হতে থাকবে। উপকরণ আপনি ইউরোপ (বর্তমান আমেরিকাকেও এর সাথে যুক্ত করুন।—অনুবাদক) থেকে পেতে পারেন। আমি তা গ্রহণ করতে মানা করছি না। কিন্তু লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, কল্যাণমূলক প্রেরণা ও সুস্থ চাহিদা আপনি একজন পয়গাম্বর থেকেই পেতে পারেন। আপনার জন্য তাঁর কাছ থেকে উপকার গ্রহণের সুযোগ সব সময় বিদ্যমান। তাঁর কাছ থেকে একীনের সম্পদ ও কল্যাণের প্রেরণা নিয়ে আপনি নিজের যিন্দেগীও গড়তে পারেন এবং ইউরোপকেও বাঁচাতে পারেন এই ধ্বংস থেকে, যা তার মাথার ওপর তার মধ্যস্থতায় গোটা দুনিয়ার মাথার ওপর এই মুহূর্তে ঝুলে আছে।

জীবন গঠনের ব্যক্তির গুরুত্ব

[১৯৫৫ ইং সনের ২১ শে ফেব্রুয়ারীতে বর্তমান ভারতের জৌনপুর টাউন হলে ভাষণটি প্রদান করা হয়। সেখানে মুসলিম জনসাধারণের পাশাপাশি হিন্দু ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বী শিক্ষিত মানুষেরা ছিলেন শ্রোতা হিসেবে উপস্থিত।]

গন্তব্যহীন যাত্রা

সবাই জানেন, আমাদের সমাজ ও বর্তমান পদ্ধতিতে অবশ্যই কিছু না কিছু ত্রুটি কিংবা অসম্পূর্ণতা রয়েছে যার ফলে জীবনের অবকাঠামো যথার্থভাবে বসছে না এবং তার কোন আশাব্যঞ্জক ফলাফলও প্রকাশিত হচ্ছে না। একটি ত্রুটি দূর করলে অতিরিক্ত চারটি ত্রুটির জন্ম হচ্ছে। আজকের পৃথিবীর উন্নত ও বড় রাষ্ট্রগুলোও এই ত্রুটির অনুযোগকারী। তারাও অনুভব করতে শুরু করেছে, ভিত্তিমূলে কোন ত্রুটি রয়ে গেছে।

কিন্তু তাদের নিজেদের অভ্যন্তরীণ সমস্যাগুলো থেকেই তারা নিষ্কৃতি পাচ্ছে না। আমরা সেসব সমস্যা ও তার থেকে নিষ্কৃতির প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করছি না; তথাপি বলতে বাধ্য হচ্ছি, সেসব সমস্যা ও বিষয়ের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, মানবতা ও মনুষ্যত্বের বিবেচনা। কারণ আমাদের প্রধান পরিচিতি ও অবস্থান মানুষ হিসাবেই। এজন্য সমস্যাগুলোর অবস্থান পরবর্তী পর্যায়ে। যাদের হাতে বন্দী হয়ে আছে জীবনের বাগডোর, তারা জীবনের গাড়ি এতই দ্রুত চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, এক মিনিটের জন্যও তা থামিয়ে ত্রুটি অনুসন্ধান করতে তারা প্রস্তুত নয়। তারা দেখতে চাচ্ছে না, এই ত্রুটির ফলে এই গাড়ির যাত্রী কিংবা আগামী প্রজন্মের জন্য কী ধরনের সমূহ বিপদ সৃষ্টি হতে যাচ্ছে, বরং তাদের একমাত্র ভাবনা হলো, সে গাড়ির চালক যেন তারাই হতে পারে। তাদের সকলেই ভিন্ন ভিন্নভাবে পৃথিবীকে শুধু এই আশ্বাস বাণী-ই উৎকোচ হিসাবে প্রদান করছে, গাড়ির হ্যান্ডেল যদি তার হাতে থাকে, তাহলে সে দ্রুত থেকে দ্রুততর গতিতে গাড়িটি চালিয়ে নিয়ে যাবে।

আমেরিকা, রাশিয়াসহ সকল শক্তিধর রাষ্ট্রগুলোর প্রতিটিরই দাবী ও প্রতিশ্রুতি হলো, যদি পৃথিবী নামক গাড়িটির চালক সে হতে পারে, তাহলে সে তা অন্যের চেয়ে আরো দ্রুত গতিতে চালিয়ে নিয়ে যাবে। কিন্তু তাদের কেউ এই চলার লক্ষ্য ও গন্তব্য সম্পর্কে আলোচনা করছে না।

সংঘবদ্ধতার প্রতি আকর্ষণ

সংগঠন হচ্ছে। সাম্প্রতিককালে সংঘবদ্ধতার প্রতি গুরুত্বটা দেওয়া হচ্ছে অধিক। সব কর্মই করা হচ্ছে সংঘবদ্ধ ও সার্বজনীন ধাঁচে। সংঘবদ্ধতা ও সমষ্টিগত একটি আকর্ষণীয় ও প্রগতিশীল প্রেরণা। কিন্তু ব্যক্তি, তার যোগ্যতা সকল কাজ ও সংগঠনের ভিত্তি। কোন যুগেই এর গুরুত্ব অস্বীকার করা সম্ভব নয়। এ যুগের বিপজ্জনক ভুলটি হচ্ছে এই যে, ব্যক্তির গুরুত্ব, তার চরিত্র ও যোগ্যতার প্রতি বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপও করা হচ্ছে না। প্রাসাদ নির্মিত হয়ে গেছে আর সকলে মিলে সেটাই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে। কিন্তু যে ইটের সাহায্যে প্রাসাদটি তৈরি হলো, সেদিকে তাকাচ্ছে না কেউ। যদি কেউ প্রশ্ন ছুঁড়ে বলে ঃ প্রাসাদের ইটগুলো কেমন? তাহলে উত্তর দেওয়া হচ্ছে, "ইটগুলো ত্রুটিযুক্ত বা দুর্বল যেমনই হোক না কেন, প্রাসাদটি কিন্তু হয়েছে খুব মজবুত ও উন্নত।"

আমাদের বুঝে আসে না, শ' খানেক ত্রুটিযুক্ত জিনিস মিলে একটি সুস্থ ও সুন্দর সমষ্টি কিভাবে তৈরি হতে পারে? অধিক সংখ্যক ত্রুটি যখন একটি অপরটির সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়, তখন কি অলৌকিকভাবে সেখান থেকে উত্তম কিছুর প্রকাশ ঘটে? শত শত অপরাধী ও অত্যাচারী এক সঙ্গে মিলে গেলে কি ন্যায়পরায়ণ কোন গোষ্ঠী কিংবা একটি ন্যায়-নীতিভিত্তিক প্রতিষ্ঠানের জন্ম হতে পারে? আমাদের তো এ রকমই জানা আছে, ফলাফল সব সময় সূচনার অনুগামী হয় এবং সমষ্টি হয় তার প্রতিটি এককের বৈশিষ্ট্যের প্রতিনিধি ও পরিচায়ক।

আপনি বিশুদ্ধ দাঁড়িপাল্লা অনুসন্ধান করছেন। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত না তার পাথরটি বিশুদ্ধ হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত দাঁড়িপাল্লা থাকবে অশুদ্ধ ও ত্রুটিযুক্ত। তবে এটা কেমনতর যুক্তি ও দর্শন যে, ব্যক্তি গঠন বর্জন করে একটি উত্তম সমষ্টি ও দলের প্রত্যাশা চলতে পারে?

অন্যায় উদাসীনতা

আজ স্কুল-কলেজ, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, নিরীক্ষাগার ও বিনোদনকেন্দ্রগুলোতে মানব জীবনের সকল বাস্তব ও কাল্পনিক প্রয়োজন পূরণের আয়োজন করা হচ্ছে। কিন্তু সেই মানুষগুলোকে মানুষরূপে তৈরি করার আয়োজন নিয়ে কোন চিন্তা-ভাবনা করা হচ্ছে না। তাহলে এসব প্রস্তুতি কি সেই সব মানুষের জন্য, যারা সাপ-বিচ্ছু হয়ে জীবন অতিবাহিত করবে, যাদের জীবনে থাকবে না অহমিকা ও বিলাসিতা ছাড়া আর কিছুই? এ যুগের মানুষ অত্যাচার ও অপরাধ সংগঠিতভাবে করে চলেছে এবং এক্ষেত্রে তারা এগিয়ে গেছে হিংস্র জন্তুর চেয়েও বহু দূর। সাপ-বিচ্ছু, বনের বাঘ-সিংহ কি কখনো মানুষের ওপর সংঘবদ্ধ ও সংগঠিত আক্রমণ চালিয়েছে?

কিন্তু মানুষ তার মতো মানুষকেই বিনাশ করার জন্য সংগঠন প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত করেছে, তৈরি করেছে সমগ্র পৃথিবী ধ্বংস করার পরিকল্পনা। বর্তমানে ব্যক্তির প্রশিক্ষণ, তার চরিত্র গঠন এবং তার মাঝে মানবতার গুণাবলী ও নৈতিকতা জন্মানোর পরিবর্তে এগুলোর প্রতিই উল্টো দেখানো হচ্ছে অন্যায় উদাসীনতা। এ কাজকে মনে করা হচ্ছে সর্বাধিক গুরুত্বহীন। মেশিন বানানোর কত কারখানা আছে! আছে কাগজ ও কাপড় তৈরির মিল। কিন্তু প্রকৃত মানুষ বানানোর জন্য কি কোন একটি প্রতিষ্ঠান ও প্রশিক্ষণাগার আছে? আপনি বলবেন, এই সব বিদ্যাপীঠ, কলেজ ও ইউনিভার্সিটি এগুলো? কিন্তু বেয়াদবী মাফ করবেন! সেখানে মানবতার পুনর্গঠন ও ব্যক্তির পরিপূর্ণতার প্রতি কতটা মনোযোগ দেওয়া হয়? ইউরোপ ও আমেরিকা কত বিশাল ব্যয় ও আয়োজন করে এটম বোমা তৈরি করল। যদি এর পরিবর্তে একজন পরিপূর্ণ মানুষ তৈরি করা যেত, তাহলে কত উপকার হতো পৃথিবীর! কিন্তু এদিকে কারো মাথা যায় না।

আমাদের উদাসীনতার জের

আমাদের এতদ্ঞ্চলে উপমহাদেশে বহু কালজয়ী ব্যক্তিত্বের জন্ম হয়েছে অতীতে। কিন্তু শতাব্দীকাল যাবৎ এ বিষয়টি উপেক্ষিতই থেকে যাচ্ছে। আমাদের বলতেই হচ্ছে, মুসলমানরাও তাদের শাসনামলে এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনে অবহেলা করেছেন। এদের শাসন যদি খোলাফায়ে রাশেদীনের প্রতিচ্ছবি হতো এবং তারা যদি এতদ্ঞ্চলের শাসক ও পরিচালক হওয়ার চেয়েও অধিক হতেন এদেশের নৈতিকতার শিক্ষক ও পৃষ্ঠপোষক, তাহলে আজ দেশের নৈতিক অবস্থা এমন হতো না এবং তাদেরকেও এদেশের শাসন পরিচালনা থেকে অব্যাহতি দেওয়া হতো না। এরপর ইংরেজ এসেছে। ইংরেজ শাসনটা ছিল স্পঞ্জের মতো যার কাজ হলো গঙ্গার পাড় থেকে সম্পদ চুষে চুষে টেমসের পাড়ে নিয়ে ভেড়ানো। তাদের যুগের এতদ্ঞ্চলের নৈতিক পতন যে কোত্থেকে কোথায় গিয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। আজ আমরা স্বাধীনতাপ্রাপ্ত। আমাদের উচিত ছিল, সকলে মিলে প্রথম পর্যায়ে এই মৌলিক বিষয়টির প্রতি মনোযোগ দেওয়া। ভেবে দেখা উচিত, এদেশ কি একদিন স্বাধীন ছিল না? এরপর আবার কেন তা স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত হয়েছিল? নিজেদের নৈতিক অধঃপতনের ফলেই তো! কিন্তু আফসোস! সড়ক আর বাতির প্রতি যতটুকু মনোযোগ দেওয়া হয়, ততটুকু মনোযোগও এই মৌলিক বিষয়টির প্রতি নেই।

প্রতিটি সংস্কারধর্মী কাজের ভিত্তি

'আশ্রয় দান' ও 'ভূদান' আন্দোলনের যথেষ্ট মূল্যায়ন আমরা করে থাকি। কিন্তু আমরা এই বিষয়টি গোপন করতে পারি না যে, এর পূর্বেও করার মতো কাজটি

ছিল নৈতিক সংশোধন ও বিশুদ্ধ অনুভূতির জাগরণ। ইতিহাস পাঠে জানা যায়, পূর্বযুগে ভূ-সম্পত্তি বাধ্যবাধকতার ভিত্তিতে বণ্টন করা হতো। কোন কোন কাল এমনও গেছে, পানি আর বাতাসের মতো জমিকেও মানুষ একটি অতি প্রয়োজনীয় বস্তু এবং মানুষের ঢালাও হক বিবেচনা করত, কিন্তু পরবর্তীতে প্রয়োজন যাদের আছে, মানবীয় লালসা তাদের বঞ্চিত করেছে আর অপ্রয়োজনীয় ব্যক্তিদের বানিয়েছে এগুলোর মালিক। যদি নৈতিকতার অনুভূতি ও মনুষ্যত্বের মর্যাদার জন্য না হয়, তাহলে এ আশংকা থেকেই যাবে যে, বণ্টনকৃত জমি আবারো পুনঃদখল হয়ে যাবে এবং অভাবী মানুষকে উচ্ছেদ করা হবে জমি থেকে।

এজন্যই যতক্ষণ পর্যন্ত কথিত অনুভূতির জাগরণ না ঘটবে এবং বিবেক ও অন্তর জাগ্রত না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত এসব প্রচেষ্টার ফলাফল ও সমূহ প্রতিশ্রুতির ওপর নির্ভর করা যায় না। আজ নৈতিক অধঃপতন ঘটেছে শেষ সীমা পর্যন্ত। ঘুষ, চোরাকারবারি, প্রতারণা, অবিশ্বস্ততারও এখানে কোন অভাব নেই, বরং লোকজনের অভিযোগ হলো, এগুলো কিছুটা বেড়ে গেছে। বিত্তবান হওয়ার খায়েশ উন্মাদনায় রূপান্তরিত হয়েছে। কেউ নিজের দায়িত্ব অনুভব করছে না। মানসিক অবস্থাটা হচ্ছে এই, একজনের ভালো কর্মের আড়ালে মন্দ করতে চাচ্ছে অন্যজন। যখন সকলের অবস্থাই এ রকম হয়ে যাবে, তখন সেই ভালো কাজটি কোত্থেকে আসবে যার আড়ালে মন্দটা লুকিয়ে রাখা যাবে?

আমার এক মিসরীয় বন্ধু তাঁর ভাষণে একটা চমৎকার উদাহরণ পেশ করেছেন। তিনি বলেছেন, একবার এক বাদশাহ ঘোষণা করলেন, "দুধ ভর্তি একটি পুকুর চাই। রাত্রে সকলেই এক লোটা করে দুধ পুকুরের মতো করে খনন করা এই বিশাল শূন্য গর্তে এনে ফেলবে। সকালে প্রত্যেকের মূল্য পরিশোধ করে দেব।" কিন্তু তখন প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্নভাবে চিন্তা করল, "আমি যদি সবার ফাঁকে এক লোটা পানি ঢেলে দিই তাহলে কে জানবে? সবাইতো দুধই ঢালবে।"

ঘটনাক্রমে একই ভাবনা সবাই ভাবল এবং অন্যের ভালো কাজ ও বিশ্বস্ততার আড়ালে নিজের মন্দটাকে চালিয়ে দিতে চাইল। সকাল হলে বাদশাহ দেখলেন, সম্পূর্ণ পুকুরটাই পানিতে ভর্তি হয়ে আছে। দুধের নাম-গন্ধও নেই সেখানে। কোন জনবসতির যখন অবস্থাটা এ রকম হয়ে যায়, তখন কেউ সে জনপদকে হেফাযত করতে পারে না।

মনে রাখবেন, এতদঞ্চলের ধ্বংসের জন্য বাইরে দুনিয়ার প্রতি কোন ভয় পোষণ করার প্রয়োজন নেই। এদেশের সবচেয়ে প্রধান আশংকার কারণটি হলো, নৈতিক পতন, অপরাধীসুলভ মানসিকতা, সম্পদপূজা ও ভ্রাতৃহনন। প্রাচীন গ্রীক ও রোমান সভ্যতা কি শত্রুরা ধ্বংস করেছে? না, বরং সেই নৈতিক ব্যাধিগুলোই

তাদের গ্রাস করেছে যা ছিল দুরারোগ্য। তাছাড়া বর্তমানে যে কোন একটি দেশের নৈতিক পতন সমস্ত পৃথিবীর জন্যই আশংকার কারণ। পৃথিবী তখনই সুখী ও নিরাপদ হতে পারে যখন প্রতিটি দেশ সুখী ও নিরাপদ হয়ে যায়।

আম্বিয়াগণের কীর্তি

আম্বিয়াগণের কীর্তি তো এটাই, তাঁরা সৎ মানুষ গঠন করেছেন। আল্লাহ্‌ভীরু, মানবপ্রেমিক, সমব্যথী, ন্যায়পরায়ণ, সত্যবাদী, সত্যপন্থী, নিপীড়িতের সাহায্যকারী ছিলেন তাঁদের গড়া মানুষ। পৃথিবীর অন্য কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান কিংবা প্রশিক্ষণাগার এমন সৎ লোক জন্ম দিতে পারেনি, গঠন করতে পারেনি। নিজের আবিষ্কার-উদ্ভাবনের ওপর আছে পৃথিবীর অহংকার, বিজ্ঞানবাদীদের গর্ববোধ আছে তাদের অবদানের ওপর। কিন্তু আমরা ভেবে দেখছি না আম্বিয়াগণের চেয়ে অধিক মানবতার সেবা আর কেউ কি করেছে? তাঁদের চেয়ে অধিক মূল্যবান বস্তু আর কেউ কি পৃথিবীকে দান করেছে?

তাঁরাই তো পৃথিবীকে বাগিচা বানিয়েছেন। তাঁদের কারণেই পৃথিবীর সব কিছু কর্মমুখর ও ফলপ্রসূ হয়ে উঠেছে এবং সকল সম্পদ চিনে নিয়েছে তার ঠিকানা।

আজও পৃথিবীতে ভাল কর্মের যে প্রবণতা, যে সততা, ন্যায় ও মানবতার প্রেম পাওয়া যায়, তা এই আম্বিয়াগণেরই প্রচেষ্টা ও ত্যাগের ফল। বিরাজমান এই পৃথিবীটাও শুধু আবিষ্কার আর সভ্যতার উন্নয়নের কাঁধে ভর করে চলতে পারে না। উপরন্তু আজকের পৃথিবীটাও শুধু সেই সততা, বিশ্বস্ততা, ন্যায়পরায়ণতা ও ভালোবাসার ওপর প্রতিষ্ঠিত আছে যার জন্ম দিয়ে গেছেন আম্বিয়াগণ।

আম্বিয়াগণ এই সৎ মানুষ কিভাবে জন্ম দিয়েছেন? এ কথা কম বিস্ময়কর নয়। তাঁরা মানুষের হৃদয়ে এমন একটি নতুন বিশ্বাস জন্ম দিয়েছেন, যে বিশ্বাস থেকে দীর্ঘকাল বঞ্চিত থাকার ফলে পৃথিবীর সকল ব্যবস্থাপনা ভেঙে পড়েছিল এবং মানুষ ও মানুষের সমাজ হিংস্র পশু আর রক্তলিপ্সু জন্তুতে পরিণত হয়েছিল। সে বিশ্বাসটি ছিল, ইনি সত্যবাদী মানুষ, আল্লাহ্‌র হক পয়গামের বাহক এবং মানবতার সঠিক পথপ্রদর্শক। এ বিশ্বাস মানুষের কায়া সম্পূর্ণ পাল্টে দিয়েছে এবং তাকে উন্নীত করেছে একটি লাগামহীন জন্তুর স্তর থেকে একজন দায়িত্ববান মানুষে।

ইতিহাসের অভিজ্ঞতা

হাজারো বছরের অভিজ্ঞতা হলো, মানুষ গড়ার জন্যে ব্যক্তি গঠনের এই প্রক্রিয়ার চেয়ে বড় শক্তি আর কিছুই নেই। আজ পৃথিবীর সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য এটাই, বিভিন্ন দল আছে, গোষ্ঠী, সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান আছে; কিন্তু সৎ ও যোগ্য ব্যক্তি নেই। পৃথিবীর বাজারে এটারই অভাব সর্বাধিক। ভয়াবহ বিষয়টি হলো,

এক্ষেত্রে প্রস্তুতি গ্রহণের কোন ভাবনাও নেই। সত্যি করে জিজ্ঞেস করলে বলতে হবে, এ বিষয়ে প্রস্তুতির প্রচেষ্টাও যে একটা হচ্ছে, তাতেও যথার্থ পথটি বেছে নেওয়া হচ্ছে না। এর পথ শুধু একটিই এবং তা হলো, আবারো বিশ্বাস জন্মানো। মানুষকে আগে মানুষ বানানো ছাড়া অপরাধ বন্ধ হতে পারে না। ত্রুটি দূর হতে পারে না। আপনি একটি চোরাপথ বন্ধ করবেন তো দশটি চোরা পথ খুলে যাবে। আক্ষেপ হলো, এই মৌলিক কাজের প্রতি যাদের মনোযোগ দানের প্রয়োজন, যাদের মনোযোগে প্রভাব পড়ে, অন্য সমস্যা ও ব্যস্ততা থেকে তাদের নিষ্কৃতি নেই। তারা যদি এদিকে মনোযোগ দিতেন তাহলে এর ফলে সমগ্র জীবনাচারেই তার প্রভাব ছড়িয়ে পড়ত এবং যেসব সমস্যা থেকে নিষ্কৃতির জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রচেষ্টা চালানোর পরও আশাব্যঞ্জক কোন ফলাফল দেখা যাচ্ছে না, সে সব সহস্র সমস্যা থেকেও সকলের উত্তরণ ঘটত এবং নিষ্কৃতি মিলত।

আমাদের প্রচেষ্টা

আমরা যখন দেখলাম এই বিশাল দেশে কেউ এ বিষয়ে ঘোষকের ভূমিকা পালন করছেন না, কেউ বানাচ্ছেন না এটাকে নিজের জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, তখন আমরা কয়েকজন নিঃস্ব সঙ্গী এ আহ্বানের জন্য নিজেদের ঘর ছেড়ে এসেছি। আমরা আপনাদের শহরে এসেছি। আপনারা আমাদেরকে গ্রহণ করেছেন এবং আগ্রহ ও ধৈর্যের সাথে আমাদের কথা শুনেছেন। এজন্য আমরা কৃতজ্ঞ। আমাদের দারুণ উৎসাহ জেগেছে। আমরা এ ময়দানে নেমেছি, মানবতার এই বিস্তৃত বসতিতে অবশ্যই কিছু জীবন্ত প্রাণের সন্ধানে মিলবে। পৃথিবীর সকল কাজ এ ধরনের মানুষের অস্তিত্বের বিশ্বাস ও প্রাণ সঞ্জীবতার দিকে লক্ষ্য করেই করা হয়েছে।

এত বড় সম্মেলনে আমাদের প্রত্যাশা নিশ্চয়ই অনেক। অনেক অন্তরই আমাদের কথাগুলো গ্রহণ করে থাকবে। আমরা এ প্রত্যাশাও করি, যে হৃদয় আজ আমাদের কথা গ্রহণ করেছে, সে নিজেকে সেই কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তিরূপে গড়ে তোলার চেষ্টা করবে। আজকের পৃথিবীতে সে ব্যক্তির প্রয়োজন, যে ধরনের ব্যক্তির অভাবে জীবন পারছে না তার ছক মতো চলতে।

গ্রন্থকার

মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (র) সেই যে ত্রিশের দশকে তাঁর পূর্বপুরুষ বালাকোটের শহীদ আমীরু'ল-মু'মিনীন হযরত সাইয়েদ আহমদ বেরলভী (র)-এর অনুপম চরিত গ্রন্থ "সীরাত সাইয়েদ আহমদ শহীদ" লিখে তারুণ্যদীপ্ত বয়সেই উর্দু সাহিত্যের আসরে নিজের একটি উল্লেখযোগ্য আসন করে নিলেন। তারপর বিগত প্রায় পৌনে এক শতাব্দী ধরে তাঁর কলম অবিশ্রান্তভাবে লিখে গেছে মুসলিম ইতিহাসের গৌরবদীপ্ত অধ্যায়গুলোর ইতিবৃত্ত। পাঁচ খণ্ডে রচিত 'তারিখে দাওয়াত ও আযীমত'-এর বঙ্গানুবাদ 'সংগ্রামী সাধকদের ইতিহাস' তাঁর এমনি একটি অমূল্য গ্রন্থ। সীরাত থেকে ইতিহাস, ইতিহাস থেকে দর্শন ও সাহিত্য পর্যন্ত সর্বত্রই তাঁর অবাধ গতি। তাঁর "মা-যা খাসিরা'ল-আলামু বিনহিতাতি'ল-মুসলিমীন" Islam and the World-এর বঙ্গানুবাদ 'মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কী হারালো?' একখানি চিন্তাসমৃদ্ধ অনবদ্য আরবী গ্রন্থ যার অনুবাদ পৃথিবীর অনেক ভাষায় হয়েছে। 'নবীয়ে রহমত' ছাড়াও তাঁর রচিত "আল-মুরতাযা" শীর্ষক হযরত আলী (রা)-এর জীবনী গ্রন্থখানি আরবী, উর্দু ও ইংরেজী ভাষায় প্রভূত সুনাম অর্জন করেছে। সমসাময়িক বিশ্বে তাঁর চাইতে অধিকতর খ্যাতিমান ও বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী অন্য কোনও আলেম জন্মেছেন কি না এবং থাকলেও তাঁর মত এত অধিক স্বীকৃতি লাভ করেছেন কিনা সন্দেহ রয়েছে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের প্রায় সকল জনপদে যেমন তিনি আমন্ত্রিত হয়ে সে সব দেশ সফর করেছেন, তেমনি নোবেল পুরস্কারতুল্য মুসলিম বিশ্বের সব চাইতে মূল্যবান 'বাদশা ফয়সাল' পুরস্কারে তিনি ভূষিত হয়েছেন। তিনি একাধারে রাবেতায়ে আলমে ইসলামী-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, লখনৌর বিখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দারুল উলূম নদওয়াতুল-উলামা-এর রেকটর, ভারতীয় মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ প্লাটফরম মুসলিম পার্সোন্যাল ল' বোর্ডের সভাপতির পদ অলংকৃত করেছিলেন। তাঁর অস্তিত্ব কেবল ভারতীয় মুসলমানদের জন্যই নয়, গোটা বিশ্বের মুসলমানদের জন্যই এক বিরাট নেয়ামত। তাঁর বেশ ক'টি বই ইতোমধ্যেই বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। একাধিকবার তিনি বাংলাদেশ সফরও করেছেন। তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ এ পর্যন্ত ৭ খণ্ডে প্রকাশিত। 'কারওয়ানে যিন্দেগী' শুধু তাঁর আত্মজীবনীমূলক নয়, এটা সমসাময়িক বিশ্বের অনেক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা ও ব্যক্তিত্ব এক অপূর্ব আলেখ্যও বটে। তাঁর রচনায় আল্লামা শিবলীর অনবদ্যতা, আল্লামা সাইয়েদ সুলায়মান নদভীর সূক্ষ্মদর্শিতা, মাওলানা মানাযির আহসান গিলানীর সতর্কতা, মাওলানা আশরাফ আলীর থানবীর তাকওয়া, সর্বোপরি তাঁর পূর্বপুরুষ সাইয়েদ আহমদ বেরলভী (র)-এর দরদ প্রতিফলিত হয়েছে। শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা যাকারিয়া (র), মাওলানা মনযূর নোমানী (র) ও রঈসুত-তাবলীগ মাওলানা ইউসুফ (র)-এর অনেক মূল্যবান গ্রন্থে তাঁর লিখিত সারগর্ভ ভূমিকাগুলো পড়বার মতো। আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে তিনি মাওলানা আহমদ আলী লাহোরী (র) ও মাওলানা আবদুল কাদির রায়পুরী (র)-এর খলীফা। বিগত হিজরী ১৪২০ সনের ২২ রমযান জুম'আর পূর্বে সূরা ইয়াসীন তেলাওয়াতরত অবস্থায় গ্রন্থকার ইনতিকাল করেন। রায়বেরেলীর পারিবারিক কবরস্থানে রওযায়ে শাহ আলামুল্লাহয় তাঁকে দাফন করা হয়।

মুহাম্মদ ব্রাদার্স, ঢাকা